বুভুক্ষা

বুভুক্ষা

শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

আত্মশক্তি লাইব্রেরী
১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীবরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
আত্মশক্তি লাইব্রেরী
১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

দাম আড়াই টাকা

মুদ্রাকর
শ্রীশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
বাণী প্রেস
৩৩-এ মদন মিত্র লেন, কলিকাতা

কল্লোল-এর বন্ধুদের
দিলাম

'বুভুক্ষা' নরওয়ের প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ক্নুট হামসুনের 'হাঙ্গার' নামক বইয়ের বাঙলা তর্জ্জমা।

১৯২০ সালে ইনি নোবেল পুরস্কার পান, তার পূর্ব্বে ইনি এ-দেশে একরকম অপরিচিতই ছিলেন। নোবেল পুরস্কারের পাশ-পোর্ট নিয়ে ইনি এ-দেশে পরিচিত হলেন বটে কিন্তু সেই পরিচয় বর্ত্তমানে বান্ধবতায় পরিণত হয়েচে।

তখন থেকেই বইখানার অনুবাদে হাত দিই এবং সুযোগও ঘটে যায়। বন্ধুবর শ্রীশৈলেশনাথ বিশী ১৩৩০ সালে 'জনসেবক' নামে একখানা মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। কথা ছিল, 'জনসেবক'-এ প্রধানত বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের অনুবাদই প্রকাশিত হবে। কিন্তু অনুবাদ-সাহিত্যের কদর এ-দেশে এখনো হয় নি বলে চার পাঁচ মাস বাদেই জনসেবক তার কাগজ-লীলা সম্বরণ করে। কাজেই আমার অনুবাদও ওইখানে এসেই থেমে যায়, ভবিষ্যতে যে কোন দিন আবার সে অনুবাদে হাত দিব তার কোন সম্ভাবনাই সেদিনে ছিল না। দীর্ঘ ছয় সাত বৎসর বাদ বর্ত্তমান গ্রন্থের প্রকাশক শ্রীবরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের আগ্রহে নানা বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করে 'বুভুক্ষা' আজ জন-সমাজে বার হল। অনুবাদে যে সকল বন্ধুর সাহায্য পেয়েচি আজকের দিনে তাঁদের নামোল্লেখ না করে পারচি নে। প্রথমেই স্বর্গীয় কবি দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী ও তাঁর পুত্র শ্রীমান্ দ্বিপেন্দ্রনারায়ণ বাগচীর নাম করচি। তারপর আমার পরমাত্মীয় শ্রীমাখনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও অতি-আধুনিক লেখক-দলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও ঔপন্যাসিক বন্ধুবর শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ ও উপদেশ দিয়ে অনুবাদের কাজে অনেক সাহায্য করেছেন। এঁদের সকলকার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। পরিশেষে যে মনীষির পুস্তকখানা অনুবাদ করলাম, সেই ঔপন্যাসিক-শ্রেষ্ঠ ক্নুট হামস্থনকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করচি। তিনি দয়া করে অর্থ-মূল্য না নিয়ে আমাকে তর্জ্জমা করবার অধিকার না দিলে এ কার্য্য কখনই আমার দ্বারা সম্ভব হত না। অনুবাদে অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি রয়ে গেল, ভবিষ্যতে যদি ছাপার প্রয়োজন হয় তখন তা সংশোন করব। ইতি—

৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫ শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

১৮৮৮ সাল। 'কোপেনহেগেন পলিটিক্যান' পত্রের বৃহৎ অফিসের দ্বারে জীর্ণবাস পরিহিত এক যুবক দাঁড়িয়ে। যুবক হয় ত জন্ম থেকেই পথচারী। সর্ব্বাঙ্গে তার পান্থজীবনের ইতিহাস ফুটে উঠেচে—ছেঁড়া জামায়, শুষ্ক মুখে, তাম্র বর্ণে, ক্ষুধিত দৃষ্টিতে,—

যুবক বার কয়েক ইতস্তত করে অবশেষে অফিসের সিঁড়ি দিয়ে উঠে সোজা সম্পাদকের ঘরে গিয়ে উপস্থিত!

সম্পাদক—এড ওয়ার্ড ব্র্যাণ্ডেস্, ডেন্মার্কের খবরের কাগজ-জগতের নেতা।

সম্পাদক আপন মনে কাজ করছিলেন—

যুবক ছেঁড়া জামার ভিতর থেকে বার করল—একখানি পাণ্ডুলিপি! অসীম সাহসে পাণ্ডুলিপিখানি টেবিলের উপর আগাইয়া দিল।

মুখ না তুলেই পাণ্ডুলিপির আকার দেখে সম্পাদক তা ফিরিয়ে দিলেন। ফিরাতে গিয়ে মুখ তুলতেই দেখলেন—শ্রান্ত যৌবনের একটি রেখা-মূর্ত্তি সম্মুখে দাঁড়িয়ে, একেবারে টাট্কা ছবি, কালির আঁচড়গুলোও এখনো পরিষ্কার করা হয় নি।

সম্পাদক পাণ্ডুলিপি ফিরিয়ে নিলেন—পড়ে দেখবেন বলে।

পথে তখন সন্ধ্যা নেমে আসচে; শীতের সন্ধ্যা, কুয়াসায় গভীর।

যুবক পথ চলছিল—

কুয়াসার মধ্য দিয়ে সে ঘুরে বেড়াতে শুরু করল। কী যেন সে হারিয়ে ফেলেচে!

রাত্রি যখন গভীর হয়ে এল, সে ধীরে ধীরে একটা বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল। একবার চারদিকে চেয়ে দেখে নিল। ঘরে ঘরে আলো নিবে গেছে দেখে সে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচে গেল। হামাগুঁড়ি দিয়ে ঘরে গিয়ে উঠল! অথচ তারই ঘর, তবে ঘরের ভাড়া সে দিতে পারে নি!

একটা শীর্ণ মোমবাতির বুকে একটুখানি আলো জ্বলে উঠল। সেই আলোয় যুবক দেখল—একটি ডাকের চিঠি, লেফাপা। লেফাপা ছিঁড়তেই একখানি দশ ক্রোনারের নোট পড়ে গেল! দাতার নাম খুঁজতে

গিয়ে যুবক দেখতে পেল—এড্ওয়ার্ড ব্র্যাণ্ডেস্ !

সম্পাদক ব্র্যাণ্ডেস পাণ্ডুলিপিখানা বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে পড়তে বসলেন। পাতা কয়েক পড়তে না-পড়তেই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এ যে নবসূর্য্যোদয় !

গল্পের নায়ক যেখানে ঘরভাড়ার টাকা দিতে না পেরে রাত্রির অন্ধকারে হামা-গুঁড়ি দিয়ে চোরের মত নিজেরই ঘরে ঢুক্‌চে—সেইখানে আসতেই তাঁর মনে হল, হয় ত ঠিক এমনি করেই এ যুবকও আজ রাত্তিরে তার নিজের ঘরে ফিরবে। তৎক্ষণাৎ যুবকের ঠিকানায় তিনি একখানি দশ-ক্রোনার নোট পাঠিয়ে দিলেন !

সেই রাত্রেই সেই পাণ্ডুলিপি হাতে করে ব্র্যাণ্ডেস্ বিখ্যাত সমালোচক ও প্রকাশক এ'ক্সেল লুণ্ডেগার্‌ডের বাড়ীতে উপস্থিত হলেন। পাণ্ডুলিপি হাতে দিয়ে বললেন, 'এ শুধু প্রতিভার দান নয়,—মানবাত্মার মর্ম্মন্তুদ কাহিনী ! ডস্‌ট্‌য়েভ্‌স্কীর বংশধর।'

বিস্মিত সমালোচক বললেন, 'তাই নাকি? কি নাম বইটার?'

'বুভুক্ষা!'

'লেখক?'

'ক্নুট হ্যামসুন।'

লুণ্ডেগার্ডের সাথে সেদিন সমগ্র জগতও একটি নতুন নাম শুনতে পেল। এবং শুনে চিরদিনের মত স্মরণ করে রাখল

বুভুক্ষা

তখন ক্রিশ্চিয়ানা শহরে ঘুরে বেড়াচ্চি অনাহারে মৃত প্রায় হয়ে। এ শহরটি এমনি অদ্ভুত যে, সেখানে গেলে তার প্রবাসের কোন না-কোন স্মৃতি চিরস্থায়ী হয়ে থাকবেই।

*　　*　　*

সেদিন চিল-কোঠার বিছানায় পড়েছিলাম। নীচের ঘড়িতে ছ'টা বেজে গেল। চারিদিক রোদে ভ'রে গেছে। সিঁড়িতে লোকের আনাগোনা শুরু হয়েচে। দরজার পাশের দেওয়ালটার যেখানটায় পুরোনো খবরের কাগজে মোড়া ছিল সে দিকে নজর পড়ল। তাতে বাতি-ঘরের বিজ্ঞাপন স্পষ্ট দেখতে পেলাম, তারই এক পাশে এক রুটিওয়ালার খুব জমকালো বিজ্ঞাপনও ছিল। চোখ মেলতে না-মেলতে অভ্যাসের বশে ভাবতে লাগলাম, আজকের দিনে কি আমার আনন্দ করবার কিছু মানে আছে? কিছুদিন থেকেই টাকাকড়ির টানাটানি বড় বেড়ে

গেছে। জিনিষপত্তর যা-কিছু ছিল সবই একটির পর একটি 'খুড়ো'র ঘরে রেখে আসচি। শরীরটা যেমন কাহিল হয়ে পড়েচে, মেজাজও তেমনি তিরীক্ষি হচ্চে। কিছুদিন চব্বিশ ঘণ্টা বিছানায় পড়ে থাকতাম; মাঝে মাঝে ভাগ্য যখন সুপ্রসন্ন হত, খবরের কাগজে গল্প লিখে কিছু কিছু পাওয়া যেত।

ঘরের ভিতর আলো আসতে লাগল, দরজার পাশের বিজ্ঞাপনগুলি তখন আরো স্পষ্টতর পড়া যায়, এমন কি ডান পাশে হাল-ফ্যাশানের জামাকাপড়ের বিজ্ঞাপনের সরু সরু হরফগুলিও চোখ এড়াল না। কতক্ষণ সেই দিকেই চেয়েছিলাম। নীচের ঘড়িতে আটটা বেজে গেল—আর বিছনায় পড়ে থাকা সম্ভব হল না; জামাকাপড় প'রে জানালা খুলে বাইরে তাকাতেই খোলা মাঠটা চোখে পড়ল। তারই একটু দূরে আগুনে-পোড়া এক কামারশালার ভস্মাবশেষ দেখতে পেলাম। মজুরেরা তখনো সেখানে জিনিষপত্তর গুছোতে ব্যস্ত ছিল। জানলার গরাদে ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে বাইরের খোলা ময়দানের দিকে তাকালাম। আকাশ দিব্য পরিষ্কার। শরতের স্নিগ্ধ মূর্ত্তি—যখন প্রকৃতি চোখের ওপর নানা রঙের বিচিত্র খেলা খেলে যায়!

রাস্তার গোলমাল ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল, আমি আর তখন নিজেকে ঘরের মধ্যে বেঁধে রাখতে পারলাম না। আমার

আসবাবপত্তরহীন ঘরের কাঠের মেঝেতে পা ফেলতেই ভয় হত, এই বুঝি ভেঙে পড়ল। তাকে বাসগৃহ না বলে অন্ধকার কবর বল্‌লেই চলে। দোরের আগল ত নেইই, এমন কি শীতের কাঁপুনি থেকে বাঁচবার জন্যে হাত-পা গরম করবার চুলোটাও নেই। রাত্তিরে মোজা প'রেই শুয়ে থাকতাম, তাতে শীত না কাটলেও ভিজে মোজা শুকিয়ে যেত! ঘরে আরাম আয়াসের জন্যে একটি মাত্র জিনিষ ছিল—একখানা দোলা-চ্যায়ার। সন্ধ্যে বেলা সেখানে বসে কত কথাই না ভাবি। যখন জোরে বাতাস বইত আর নীচের দরজা খোলা থাকত, তখন মনে হত বায়ু-তরঙ্গের সাথে যেন কত অভিশপ্ত আত্মার তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ভেসে আসচে। মাঝে মাঝে বাতাসের ঝাপ্‌টায় দরজায় মোড়া কাগজগুলি টুকরো টুকরো হয়ে উড়ে যেত। বাতাসের শোঁ শোঁ কান্নার সঙ্গে কত অদ্ভুত শব্দই না শোনা যেত।

বিছানার এক কোণে একটা খাবারের পুঁটুলি ছিল, খুলতেই দেখা গেল তার মধ্যে কিছুই নেই। তখন ফের ফিরে গিয়ে জানালার সুমুখে দাঁড়ালাম।

মনে হল, চাকরীর খোঁজ করে ভাগ্যে কিছু জুটবে কিনা ভগবানই জানেন। যেখানেই যাই সেখানেই বিরাট ব্যর্থতা, দারুণ নৈরাশ্য; কখনো বা অকথ্য অপমান। নিত্য নতুন আশা ভঙ্গ হওয়ায় যেটুকু সাহস ছিল তাও আর ধরে রাখতে

পারি নি। অবশেষে নিতান্ত নিরুপায় হয়ে এক মহাজনের আদায় তহশিলের চাকরীর দরখাস্ত করেছিলাম; দরখাস্ত সময়ে পৌঁছয় নি, তা-ছাড়া জামিনের পঞ্চাশটা টাকার সংস্থানও করতে না পারায় সেখানেও নিরাশ হতে হল। মাঝে মাঝে দু'একটা কাজ যে না জুটত তাও নয়। একবার দমকলের খালাসির চাকরীর জন্যে দরখাস্ত করি। অফিসের দরজায় আমরা প্রায় পঞ্চাশজন উমেদার বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালাম, যেন আমাদের বাহুতে বল বুকে সাহসের কিছুমাত্র অভাব নেই। একজন ইন্সপেক্টর এসে আমাদিগকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করতে লাগল। আমাদের হাত-পা নেড়ে চেড়ে দেখে কাউকে বা দু একটি প্রশ্ন করলে। আমার দিকে একবার শ্যেন দৃষ্টিতে চেয়ে আমার দৃষ্টিহীনতার জন্যে মাথা নেড়ে আমার আবেদন অগ্রাহ্য করে দিলে। তখন আর একবার চশমা খুলে দরখাস্ত পেশ করলাম। ভ্রূ কুঁচ্‌কিয়ে চোখে স্ঁচের মত ধারালো দৃষ্টি হেনে দাঁড়ালাম কিন্তু লোকটা এবারেও আমায় চিনে ফেল্‌লে। হেসে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। এমন জামাকাপড় আর ছিল না যাতে ক'রে কোন ভদ্রসমাজে চাকরীর চেষ্টায় বার হওয়া যায়। কাজেই অবস্থা দাঁড়াল আরো করুণ।

বুভুক্ষা

কেমন ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে আমার আর্থিক অবস্থা দিন দিনই সঙীন হয়ে পড়ছিল। এমন কি অবশেষে ঘরের সব জিনিষই একটির পর একটি করে বাঁধা পড়ে গেল; চুল আঁচড়বার চিরুণীখানাও। একটু পড়াশুনা ক'রে যে মনটাকে বিষয়ান্তরে টেনে নিয়ে যাব তারও উপায় ছিল না, কেননা বইগুলিও সব বেঁচে দিয়ে খেয়ে বসে আছি। ফলে আমার দেহ-মন ক্রমেই নিস্তেজ অবসন্ন হয়ে পড়তে লাগল, গোটা গ্রীষ্মকালটা গীর্জার ময়দানে বা কোন পার্কে বসে বসে খবরের কাগজের জন্য প্রবন্ধ লিখতাম। নানা বিষয়ের রাশি রাশি রচনা মজুত হতে লাগল। এ সব লেখায় অদ্ভুত খেয়াল ও উদ্ভট কল্পনার খেলাই ছিল বেশী। আমার উত্তপ্ত মস্তিষ্ক থেকে এর চাইতে ভাল লেখা বার হত না। হতাশ হয়ে এমন সব অদ্ভুত বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছি যার মাথামুণ্ড কিছুই বোঝা যেত না। বলা বাহুল্য এ সব লেখা কখনো মনোনীতও হয় নি। তবু অনর্গল লিখে যেতে লাগলাম, কিছুতেই হতাশ হই নি। মনে হত, একদিন না-একদিন আমার লেখার কদর হবেই। মাঝে মাঝে গোটা দুপুর মাথা ঘামিয়ে যে লেখা তৈরী করতাম, তাতে দু'চারটে টাকাও যে রোজগার না হত এমন কথাও বলা চলে না।

জানলা থেকে সরে এসে হাত মুখ ধুয়ে হাঁটুর উপরে পা'জামায় যে ময়লা জমেছিল, খানিকটা জল হাতে নিয়ে তা

ধুয়ে মুছে ফেলবার ব্যর্থ চেষ্টা করলাম। তারপর কাগজ-পেন্সিল পকেটে গুজে সিড়ি বেয়ে নিঃশব্দে নীচে নেমে পড়লাম। ভয়—পাছে বাড়ীউলি বেটী টের পায়! ঘর-ভাড়ার অনেক টাকা তার পাওনা—শোধবার কোন উপায় নেই।

ন'টা বেজে গেছে। রাস্তায় গাড়ীঘোড়া, লোকজনের বড্ডো ভিড়। এই বিপুল জনকোলাহলের মধ্যে পড়ে আমারও মনের অবসাদ কেটে গেল। ভোরবেলা হাওয়া খাওয়ার মতলবে আমি রাস্তায় বার হই নি, আমার ফুস্ ফুস্ স্বভাবতই সবল, সুতরাং নির্ম্মল হাওয়ার তেমন দরকারও ছিল না। দেহে আমার অসুরের বল, বুনো হাতীকেও হেলায় হটাতে পারি। এক অনির্বচনীয় আনন্দ আমায় বিহ্বল করে ফেললে। রাস্তার লোকগুলির গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগলাম। দেয়ালের গায়ে বড় বড় অক্ষরের বিভিন্ন রকমের প্লাকার্ডগুলিও আমার চোখ এড়াল না। এমন কি চলন্ত ট্রাম থেকে দু'একটি চঞ্চল চাউনিও চোখে পড়তে লাগল। পথে যা-কিছু দেখতে পেলাম তা-ই আমার মনের উপর দাগ কেটে গেল।

এমন সুন্দর দিনে ফুর্ত্তিটা আরো জমাট বাধত যদি পেটে এক মুঠো কিছু পড়ত। প্রভাতের প্রসন্ন মুর্ত্তিতে আমি মনে প্রাণে খুব খুশী হলাম। আমার পেটে তখন যদিও দারুণ ক্ষুধা, তবু কোন্ এক অজানা কারণে আপনা থেকে গুন্ গুন্ করে গান গাইতে আরম্ভ করে দিলাম।

বুভুক্ষা

এক মাংসের দোকানে দাঁড়িয়ে একটা বুড়ী মাংস দরদস্তুর করছিল। তার পাশ দিয়ে যেতেই সে একবার আমার দিকে তাকালে। দেখতে পেলাম তার মুখের সুমুখের দিকে কেবল একটি মাত্র দাঁত আছে। কিছুদিন থেকেই আমার মেজাজটা এমনি ধারা বিগড়ে গেছলো যে, তার এই বিকট মূর্ত্তি দেখে আমার মনটা এক দারুণ বিতৃষ্ণায় ভরে গেল। ক্ষুধাতৃষ্ণাও চলে গেল, সারা গা বমি বমি করতে লাগলো। বাজারে পৌঁচে ফোয়ারা থেকে আঁজল-ভরা জল পান করে ক্ষুধা-তৃষ্ণা তখনকার মত দূর করা গেল। গীর্জার ঘড়িতে তখন দশটা বেজে গেছে।

স্বপ্নাবিষ্টের মত পথ চলেচি, যেন আমার ভাববার কিছুই নেই। রাস্তার মোড়ে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে সুমুখের গলিটায় বিনা প্রয়োজনে ঢুকে পড়লাম। সারাটা প্রভাত নিরুদ্দেশ হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ালাম। চারিদিকেই নর-নারী সুখে দুঃখে ঘরকন্না করচে, এতেই যেন আমি পরম তৃপ্তি পাচ্চি। ঊর্দ্ধে নির্ম্মল আলোকোজ্জ্বল নীলাকাশ, তাই আমার মনে অ াধারের ছায়াও পথ পেলে না। আমার আগে আগে একটা বুড়ো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে যাচ্ছিল। তার এক হাতে একটা পুটুলি। পথ চলতেই যেন তার দেহের সমস্ত শক্তি

প্রয়োগ করতে হয়েচে। তাড়াতাড়ি চলতে গিয়ে সে যে হাঁপাচ্ছিল তা স্পষ্ট দেখতে পেলাম। মনে হল যদি কেউ তার পুটুলিটা বয়ে নিতে রাজী হয় ত তার কষ্টের অনেকটা লাঘব হয়। কিন্তু তাই বলে আমি নিজেও তার কষ্টের লাঘব করতে এগুলাম না। বড় রাস্তায় পড়তেই একজন চেনা লোক আমায় দেখে নমস্কার করলে বটে কিন্তু কিছু না বলেই তাড়াতাড়ি চলে গেল। তার যে এত কি তাড়া ছিল বুঝতে পারলাম না। তার কাছ থেকে টাকাপয়সা চাইবার অভিপ্রায় অবশ্য মোটেই ছিল না, বরং ক'সপ্তাহ আগে তার কাছ থেকে যে একখানা গরম কম্বল ধার নিই, তাই ফিরিয়ে দেওয়ার মতলবে ছিলাম। তবু কেন সে এমন ভাবে পাশ কাটিয়ে গেল ?

দাঁড়াও না, একবার অবস্থাটার একটা সুরাহা করে নিই, তারপর আর কারুর কাছে একটি পয়সাও ধার করব না, এমন কি একখানা কম্বলও না। হয় ত আজই আমি যে প্রবন্ধ লিখব বলে মনে মনে এঁচে নিয়েচি তার জন্যে অন্তত দশটি টাকা পাবই।... ...

প্রবন্ধের কথা মনে হতেই আমার লিখবার ঝোঁক চাপল। মগজের ভিতর যে ভাবটা তখন গিজ গিজ করছিল তা বেরিয়ে না এলে যেন স্বস্তি ছিল না। পার্কের মধ্যে একটা নির্জ্জন জায়গা বেছে নিয়ে এখ্খুনি লেখা শুরু করব আর শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত উঠব না।

বুভুক্ষা

কিন্তু সেই খোঁড়া বুড়োটা তখনো আমার আগে আগে যাচ্ছিল। এই দুর্ব্বল হতভাগা লোকটাকে আমার চোখের সুমুখে চলতে দেখে মনটা বিস্বাদে ভরে গেল! ওর যেন পথের আর শেষ নেই, আমি যেখানে যাব, ওও হয় ত সেখেনেই যাবে। সারাটা পথ হয় ত ওরই পদচিহ্ন অনুসরণ করতে হবে। প্রতি রাস্তার মোড়ে গিয়েই ও এক একবার থামে, যেন আমি কোন্ দিকে যাই ওও তাই লক্ষ্য করচে। আমি পেছনে যাচ্চি দেখে ওও আবার পুটুলিটা তুলে হন্ হন্ করে এগিয়ে যায়। এই ক্লান্তক্লিষ্ট লোকটাকে যতই অনুসরণ করি ততই ওর ওপর আমার একটা দারুণ বিরক্তি আসে।

বাইরের সৌন্দর্য্য, গাড়ীঘোড়া, লোকজনের আনাগোনায় মনটা যতটুকু প্রসন্ন হয়েছিল, কুৎসিত এই লোকটার সঙ্গে হেঁটে সেটুকু ক্রমেই কমে আসছিল। ও যেন একটা প্রকাণ্ড অজগড়ের মত সারাটা পথ জুড়ে হামাগুড়ি দিয়ে চলচে।

এই ভাবে আমরা যখন একটা পাহাড়ের উপর উপস্থিত হয়েচি, তখন লোকটার হাত এড়াবার জন্যে আমি অন্য পথ ধরবার সংকল্প করলাম। একটা দোকানের সুমুখে গিয়ে দাঁড়িয়ে খোলা জানলার দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল, লোকটা এই অবসরে অনেকটা পথ এগিয়ে যাবে; কিন্তু মিনিট কয়েক পরে এগিয়ে গিয়ে দেখি লোকটাও এতক্ষণ দাঁড়িয়েই ছিল,

আমায় দেখতে পেয়ে ওও আবার চলতে লাগল। আমি আর দ্বিধা না করে খুব জোরে জোরে পা ফেলে ওকে ধরে ফেলে ওর পিঠ চাপড়ে দিলাম। ও হঠাৎ চম্‌কে উঠে থেমে গিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে বললে, 'চারটে পয়সা দিবেন ?'

আমি পকেট হাতড়ে বল্‌লাম, পয়সা ?—'পয়সা আজকাল এত সস্তা নয়। পয়সা নিয়ে কি করবে ?'

—'মশাই, দু দিন কিছুই খেতে পাই নি, সঙ্গে একটা আধলাও নেই। কাজকর্ম্মও কিছু জুটচে না।'

—'কি কাজ জান ?'

—'এই মেরামতের কাজ ?'

—'কি মেরামত ?'

—'জুতো। তৈরী করতেও পারি।'

—'ও ! আচ্ছা। তুমি এখানে দাঁড়াও, আমি এখ্‌খুনি ঘুরে আসচি। তোমায় কিছু দেব।'

সোজাসুজি পা ফেলে এগিয়ে চল্‌লাম। কাছেই একটা পোদ্দারের বন্ধকী-দোকান আছে জানা ছিল কিন্তু এর আগে তার সাথে আমার কোনরকম কারবারই ছিল না।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠবার সময় তাড়াতাড়ি গা থেকে ওয়েষ্ট কোটটা খুলে ফেলে সেটি কাঁধে ঝুলিয়ে ঘরে ঢুকে পড়লাম।

পোদ্দার জামাটার দিকে একবার চেয়েই বললে, 'চোদ্দ আনা।'

বুভুক্ষা

আমি বল্‌লাম, বেশ 'বেশ তাই দাও! সময়টা ভারী খারাপ যাচ্চে, নইলে এ জামাটা বাঁধা দেবার কোনই কারণ ছিল না।'

চোদ্দ আনার পয়সা ও রসিদটা পকেটে ফেলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম। মনে ভাবলাম, জামাটা গেল বটে, এ বেলা ত পেট ভরে খাওয়া চলবে! তারপর সন্ধ্যের মধ্যেই লেখাটা যদি ঠিক ঠিক শেষ করতে পারি তা হলে আর চাই কি! ভবিষ্যৎটা তখন আমার চোখের সুমুখে ভারী উজ্জ্বল হয়েই দেখা দিল। লোকটা তখনো আমার প্রতীক্ষায় অদূরে ফুটপাথের উপর লাইট-পোস্‌ট্‌ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমুচ্ছিল। তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে তার কাছে গিয়ে বল্‌লাম, 'এই যে, নাও!'

লোকটা হাত বাড়িয়ে আধুলিটে নিয়ে আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

ও কি দেখছিল?—আমার ছেঁড়া পা-জামাটা?—ওর ওরকম বেহায়াপনায় আমি মনে মনে ভারী পীড়িত হয়ে উঠলাম। ও কি আমাকেও ওরই মত হতদারিদ্র মনে করেচে? আমি যে খবরের কাগজে লিখে টাকা পাই। তা ছাড়া আমার ভবিষ্যতের ভাবনা কি? লোকটার নির্লজ্জতার জন্যে মনে মনে রেগে তাকে দুটো ঘুষি দিয়ে বিদায় করবার ইচ্ছা ছিল। তাকে বল্‌লাম, 'হ্যাঁ করে আমার দিকে চেয়ে কি দেখচ?'

বুভুক্ষা

ও বিহ্বলের মত চেয়ে রইল। ওর মাথায় যেন কি গোল পাকিয়ে গেল। ও কি মনে করে আধুলিটা আমায় ফিরিয়ে দিতে উদ্যত হতেই আমি ফুটপথের উপর পা ঠুকে বল্‌লাম, 'ও আমি আর চাই নে। খুশী হয়েই তোমায় দিচ্চি। তুমি এখন যাও।'

ও আস্তে আস্তে চলে গেল।

আমার তখন মনে হল, নিশ্চয়ই আমি কোন না-কোন দিন পয়সা ক'আনা ওর কাছে ধারতাম। এখন ওর সমস্ত অপরাধ ভুলে গিয়ে ওর প্রতি একটা অজানা কৃতজ্ঞতার ভাব জেগে উঠল। ভগবান তুমিই ধন্য!

ও লক্ষ্মীছাড়া লোকটা আমার সামনে থেকে সরে যাওয়ায় ভারী একটা স্বস্তি বোধ করলাম। একটা পরম তৃপ্তির সঙ্গে আবার আমি পথ চলতে লাগলাম। খানিকটে এগিয়ে যেতেই একটা খাবারের দোকানের সামনে থমকে দাঁড়ালাম। দেখলাম দোকানে কত রকমেরই না খাবার সাজানো রয়েচে। ভাবলাম, কিছু খাবার কেনা যাক।

দোকানে ঢুকেই রুটি-মাখন চেয়ে ছ'আনা পয়সা টেবিলে ছুঁড়ে দিলাম। পয়সা ক'আনা কুড়িয়ে নিয়ে দোকানী আমার

দিকে না চেয়ে ব্যঙ্গের স্বরে প্রশ্ন করলে, ‘সব পয়সারই রুটি-মাখন ?’ কিছু না ভেবেই জবাব দিলাম, ‘হাঁ, সব পয়সারই।’

হাত বাড়িয়ে খাবারগুলি নিয়ে দোকানীকে ধন্যবাদ জানিয়ে সোজা পার্কের দিকে এগিয়ে চল্‌লাম।

পার্কের এককোণে একখানা বেঞ্চির উপর বসে পড়েই খিদের জ্বালায় তাড়াতাড়ি অত রুটি মাখন সব নিঃশেষে খেয়ে ফেল্‌লাম। বাঁচা গেল ! অনেক দিন এমন পেট ভরে খেতে পাই নি। আস্তে আস্তে একটা তৃপ্তি এসে আমায় অবসন্ন করে ফেল্‌লে। অনেকক্ষণ ধরে কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হয়ে চুপ করতে পেয়ে যেমন শান্তি আসে, ঠিক তেমনি শান্তি ! পরম উৎসাহে আমার অন্তর দুলে উঠল। মনে হল, সামান্য যা-তা সহজ কোন প্রবন্ধ লিখে মনের প্রসন্নতা আসবে না। ও রকম সোজা প্রবন্ধ একটা গণ্ড মূর্খেও লিখতে পারে। আমার তখন বেশ বড় বিষয়ে প্রবন্ধ লিখবার শক্তি এসে গেছে। এই উৎসাহে উদ্বুদ্ধ হয়ে ঠিক করলাম, দার্শনিকাচার্য্যের চুলচেরা তর্কের গর্ব্ব খর্ব্ব করে দিতেই হবে। কাগজ-পত্র পকেটেই ছিল, বার করে লিখতে যাচ্ছি, দেখলাম পেন্সিলটি নেই। মনে পড়ল, বন্ধকী-দোকানে সেই ওয়েষ্ট-কোটটার পকেটেই ত সেটা রয়েচে।

আজ কি আমায় সকল রকমে ব্যর্থ করবার জন্যেই চারদিক থেকে ষড়যন্ত্র চলেচে ! বেঞ্চি ছেড়ে বারকয়েক এদিক-ওদিক

পাইচারি করে বেড়ালাম। চারিদিক তখনো নিস্তব্ধ নীরব। যতদূর চোখ যায়, জনপ্রাণীও নেই। দূরে দুটি স্ত্রীলোক ছেলেদের একটা ঠেলাগাড়ী টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছিল। মেজাজটা ভারী বিগড়ে গেল। বেঞ্চিটার সামনে পাগলের মত ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। সমস্ত ব্যাপারটাই আমার মধ্যে একটা বিদ্রোহ এনে দিল। সামান্য একটা পেন্সিলের অভাবে আমার সমস্ত আশা উদ্যম পণ্ড হবে? ভেবে দেখলাম, ফিরে গিয়ে পোদ্দারের দোকান থেকে পেন্সিলটা চেয়ে নিয়ে আসতে বেশী সময় লাগবে না। তারপর এখানে লোকজনের আনাগোনার আগেই অনেক ভাল ভাল জিনিষ লিখে ফেলতে পারব। তাতে আর কারুর বিশেষ উপকার না হলেও তরুণদের অনেক কাজে আসবে হয় ত। পরমুহূর্ত্তেই মনে হল, না, ক্যাণ্টের দার্শনিকতার উপর ঝাল ঝেরে কি হবে? তা না করলেও ত চলতে পারে। স্থান কাল সম্বন্ধে অনায়াসেই ত একটি ভাল লেখা হতে পারে। বৃদ্ধ দার্শনিক রেনঁা কি বলে, তার জবাব দিয়ে কি লাভ?

যে-করেই হোক, লেখাটা আমায় শেষ করতেই হবে। কেননা ঘরভাড়া এখনো দেওয়া হয় নি। সকালে সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় বাড়ীউলির সেই জিজ্ঞাসুদৃষ্টি চোখের উপর ভেসে উঠল। সেই কারণে সারাটা দিন মনটা ভারী হয়ে রয়েচে। তার ও চাউনিটে যখনই আমার মনে পড়েচে, অমনি একটা বেদনা এসে

আমাকে বিঁধ্‌চে। এ দুঃখের শেষ আজ করতেই হবে। এই মনে করে পেন্সিলটার জন্যে আমি পার্ক থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

খানিকটা এগিয়ে যেতেই পথে দুটি মহিলার সঙ্গে আমার দেখা হল। তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে যেতে একজনকার হাতের সঙ্গে আমার হাতটা জোরে ঠেকে গেল। পিছন ফিরে একবার চেয়ে দেখলাম। মহিলাটির বয়স খুব বেশী নয় কিন্তু মুখ চোখ একেবারে বিষণ্ন মলিন। কিন্তু তার চোখে চোখ পড়তেই তার গাল দুটি লাল হয়ে উঠল। অপরূপ সুন্দর দেখাল ওকে। মেয়েটির গালদুটি কেন রাঙিয়ে গেল কে জানে! হয় ত আর কারুর কোন কথা শুনতে পেয়েচে, নয় ত নিজেরই কোন গোপন চিন্তা তার মনের মধ্যে জেগে উঠেচে, না আমার স্পর্শেই সে অমন করে উঠল! ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাসে তার বুক কেঁপে ফুলে ফুলে উঠতেই জোর করে ও তার হাতের পুটুলিটা চেপে ধরল। ওর কি হয়েচে?

আমি থম্‌কে দাঁড়িয়ে ওকে আগে যাবার সুযোগ করে দিলাম। মুহূর্ত্তকাল একপাও এগুতে পারলাম না। সমস্ত ব্যাপারটাই আমার চোখে কেমন অদ্ভুত বলে মনে হল। নানা কারণে মেজাজটাও ভাল ছিল না। কত আশা ছিল, লেখাটা শেষ করতে পারলেই আমার অভাবও খানিকটা দূর করতে পারব, কিন্তু কোথা থেকে এই পেন্সিল-বিভ্রাট এসে আমার

সবকিছু মাটি করে দিলে! তাইতেই আমার নিজেরই উপর ভারী একটা ক্ষোভ এসে গেছল; তার উপর সুদীর্ঘ ষাট ঘণ্টা উপুসে কাটিয়ে একসঙ্গে অতটা রুটি-মাখন খেয়ে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। সহসা একটা উদ্ভট খেয়াল এসে আমায় পেয়ে বসল; স্থির করলাম, মেয়েটির পিছু নিয়ে ওকে নানা রকমে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে হবে। এই মনে করে আমি ওর পিছু নিলাম। পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গিয়ে ওর চোখের দিকে তাকাতেই একটা অদ্ভুত নাম শুনতে পেলুম। ও যখন আমার কাছে এসে পড়ল তখন আমি বলে উঠলাম, 'আপনার বইখানা যে পড়ে গেল!'

বলতে গিয়ে বুকটা আমার কেঁপে উঠল।

'আমার বই?' ব'লে ও ওর সঙ্গিনীর মুখের দিকে চাইল, তারপর আবার দুজনে এগিয়ে চলল।

আমার যেন খুন চেপে গেল! আবার তাদের পিছু নিলাম। আমার তখন বেশ জ্ঞান ছিল, আমি এক উন্মাদ খেলায় মেতে উঠেচি শুধু প্রবৃত্তির তাড়নায়, খেয়ালের বশে। ভাগ্যবিপর্যায়ে এমনি দশাই হয়! উন্মাদ প্রবৃত্তিকে দমন করবার আমার এতটুকু শক্তি ছিল না। ওদের পিছু পিছু গিয়ে থক্থক্ করে বিকট আওয়াজ করেই ওদের পিছনে ফেলে এগিয়ে গেলাম। যেতে যেতে মনে হল, মেয়েটি যেন তখনো আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। কি জানি কেন লজ্জায় আমার মাথাটা

নুয়ে পড়ল ; মনে হল, আমি যেন কোন্ এক অজানা অচেনা দূর দেশে চলেচি, তখন আমার চেতনা অর্দ্ধেক লোপ পেয়ে গেছে !

খানিক পথ চলে ওরা একটা বইয়ের দোকানে ঢুকে পড়ল। ওদের আগেই গিয়ে সেই দোকানের জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমার পাশ দিয়ে ওরা যখন যায়, আমি একটু ঝুঁকে পড়ে ওকে বল্লাম, 'আপনার বইটে যে পথের মাঝে পড়ে রইল !'

'কি বই ? না !'—ভয়ে ভয়ে মেয়েটি এই কথা বলে ওর সঙ্গিনীকে শুধোলে, 'কি বইয়ের কথা বলচে বলতে পার ?—' বলেই ও থেমে গেল।

তার বিহ্বলতা দেখে আমি খুশীতে আত্মহারা হয়ে গেলাম। ওর চাউনিতে সংশয় দোলায়িত ব্যাকুলতা আমার বড় ভাল লাগল। আমার সংক্ষিপ্ত অনুরাগের সুর তার মর্ম্ম স্পর্শ করল না। ওর সঙ্গে কোন বই, এমন কি বইয়ের একখানা পাতাও ছিল না। তবু ও ওর পকেট একবার হাত্ড়ে দেখল, বার বার নিজের হাত তুখানির দিকে চেয়ে দেখল, একবার পিছন ফিরে রাস্তায়ও তাকিয়ে দেখল ; কোন্ বইয়ের কথা আমি বলচি তা আবিষ্কার করবার জন্যে ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে কূলকিনারা মিল্ল না। ক্ষণে ক্ষণে ওর মুখের রঙ বদলাতে লাগল, এত জোরে জোরে ওর নিশ্বাস পড়ছিল যে, শোনা যাচ্ছিল—এমন কি ওর গাউনের বোতামগুলিও যেন ভয়ে আমার দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে !

সঙ্গিনী ওর হাত ধরে বল্লে, 'ও নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। মাতাল, দেখছিস্ না মাতাল লোকটা!'

এ অবস্থাটা আমার নিজের কাছেই ভারী অদ্ভুত লাগছিল। কিন্তু কি করব? আমার ভিতরকার এক অদৃশ্য শক্তি আমায় চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। আমার কি দোষ! তা সত্ত্বেও বাইরের কোন বস্তুই আমার চোখ এড়িয়ে যেতে পারে না। একটা মেটে কুকুর রাস্তার এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। দূরে একটা ঝি দোতলার এক জানলার সার্সি পরিষ্কার করছে—সব দেখতে পাচ্চি। আমার মাথা খুব পরিষ্কার, জ্ঞান টন্‌টনে। উজ্বল দীপালোকে যেমন সব কিছু স্পষ্ট দেখা যায় তেমনি সব কিছু সুস্পষ্ট ভাবে আমার নজরে আসচে। মেয়ে দুটির মাথার টুপির নীল পালক, গলায় সাদা রেশমী ফিতে দেখেই বেশ বুঝতে পেলুম যে তারা উভয়েই সিস্‌টর।

ওরা একটা বাজনাওয়ালার দোকানে ঢুকে কি বলাবলি করল। আমি দাঁড়ালাম। ওরা দুজনেই বার হয়ে এসে রাস্তা ধরে চলতে লাগল, আমার সুমুখ দিয়ে গিয়ে মোর ফিরে আর একটা রাস্তা ধরল। আমিও সারাক্ষণ যতটা কাছাকাছি সম্ভব ওদের পিছনে পিছনেই চলতে লাগলাম। ওরা একবার পিছন ফিরে আধা-ভীতু আধা-জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইল, ওদের সে চাউনিতে রাগ বা বিরক্তির কোন লক্ষণই আমি দেখতে পেলাম না।

বুভুক্ষা

আমার এই অনুচিত আচরণে ওদের অসীম সহিষ্ণুতার পরিচয় পেয়ে আমি নিজেই অত্যন্ত লজ্জিত হলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথা নুয়ে পড়ল। আমি আর ওদের বিরক্ত করব না। যতক্ষণ না ওরা কোন নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেয় ততক্ষণ কেবল নিছক কৃতজ্ঞতার খাতিরে ওদের দিকে নজর রাখব। একখানা চারতালা বাড়ীতে গিয়ে ওরা প্রবেশ করল। বাড়ীর সদর দরজায় বাড়ীর নম্বর লেখা রয়েচে—দুই। ওরা ঢুকতে গিয়ে আর একবার পিছন ফিরে তাকাল। কাছেই একটা লাইট-পোস্‌ট্ ছিল, তাতে ঠেস দিয়ে ওদের পদশব্দ শুনতে লাগলাম। খানিক পরেই পদশব্দ মিলিয়ে গেল। দোতালা পর্য্যন্ত শব্দ পেলাম। লাইট-পোস্‌টের কাছ থেকে এগিয়ে গিয়ে একবার উপরের দিকে মুখ তুলে বাড়ীটা দেখে নিলাম। তারপর একটা ভারী মজার কাণ্ড হল কিন্তু। উপরের একটা জানলার পর্দা একবার নড়ে উঠল, পাশের জানালাটা খুলে গেল এবং ফাঁক দিয়ে একটি মাথা দেখা গেল, এক জোড়া উজ্জ্বল দৃষ্টি আমার দিকেই নিবদ্ধ দেখতে পেলাম। বিড়বিড় করে সেই নামটা—ন্যাজালি—অনুচ্চস্বরে আওড়াতেই আমার সারাটা শরীর লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল।

কই, ও ত সাহায্যের জন্য কাউকে ডাকলে না, ফুলের একটা টবও ত উপর থেকে আমার মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারতে পারত,

তাও ত করল না, তা-ছাড়া উপরে উঠে কাউকে পাঠিয়ে আমায় তাড়িয়ে দিতেও ত পারত, কিন্তু ও ত এর কিছুই করল না। আমরা উভয়ে প্রায় মিনিট কাল পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলাম, কেউ একটু নড়লাম না পর্য্যন্ত। রাস্তা থেকে সেই জানলায় নিঃশব্দে কি কথা বলাবলি হয়ে গেল। সে জানলা থেকে সরে যেতেই আমার শিরা-উপশিরা সব যেন বেদনায় টন্‌টন্ করে উঠল। যাবার সময় মাথাটাও নেড়ে গেল। মনে হল যেন ও আমারে অভিবাদন জানাল। একটা না-জানা পুলকে আমার সারা দেহমন অনুরণিত হতে লাগল। আবার পথ চল্‌লাম।

পিছন ফিরে আর একবার তাকাতেও সাহস হল না। সে আবার জানলার কাছে এসে দাঁড়িয়েচে কি না তাও জানতে পারলাম না। এ বিষয়ে যতই ভাবতে লাগলাম ততই সবকিছু আমার মাথার মধ্যে এমনি পাকিয়ে গেল যে, স্থির হতে পারলাম না। কেবলই আমার মনে হচ্ছিল, হয় ত মেয়েটি এখনো জানলার সুমুখে দাঁড়িয়ে আমার পথচলা দেখচে। পিছন থেকে কেউ দেখচে মনে হতেও মনে কম অস্বস্তি হয় না। আমার যেন কোন্ দিকেই লক্ষ্য নেই, এটা প্রমাণ করবার জন্যেই আমি পা-দুটোকে বাঁকিয়ে হাত দুটো দোলাতে দোলাতে নানা ভঙ্গী করে পথ চলতে লাগলাম। কিন্তু কিছুতেই ভয় দূর হচ্ছিল না,

কেবলই মনে হচ্ছিল, কে যেন পিছনে তাকিয়ে আছে, আর তাই বুকটা এক অনিশ্চিত আশঙ্কায় দুরু দুরু করছিল। খানিকটা যেতেই পাশ ফিরে আর একটা রাস্তা ধরে এগিয়ে গিয়েই বন্ধকী-দোকানে হাজির হলাম।

পেন্সিলটা পেতে অবশ্য একটুও অসুবিধা হল না। জামাটা এনে লোকটা আমায় দিয়ে বল্লে যে, পকেটগুলি ভাল করে খুঁজে পেতে দেখে নাও। পেন্সিলের টুকরোটার সঙ্গে খানকয়েক বন্ধকী-রসিদও পাওয়া গেল। দোকানীর এই শিষ্টতার জন্যে তাকে ধন্যবাদ দিয়ে চলে এলাম। তাকে আমার পরিচয়টা না দিয়ে চলে আসতে মন উঠছিল না। একটা অছিলা করে দরজা থেকে ফের ফিরে গিয়ে কাউণ্টারের সামনে দাঁড়ালাম, যেন কিছু ভুল হয়ে গেছে। মনে হল তাকে ব্যাপারটা সম্বন্ধে কিছু বলে যাওয়া দরকার। লোকটির মনোযোগ আকর্ষণ করবার জন্যে একটা শব্দ করলাম। তারপর পেন্সিলটা দেখিয়ে তাকে বললাম, এর যদি কোন বিশেষত্ব না থাকত তা হলে সামান্য একটুক্রো পেন্সিলের জন্যে আমি এতদূর কখনো আসতাম না। এর সম্বন্ধে একটা বিশেষ কারণ আছে, এটা যতই তুচ্ছ হোক না, এই পেন্সিলটাই আমায় একদিন জগতের কাছে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল।' আর কিছু বল্লাম না, লোকটাও ততক্ষণে কাউণ্টারের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

সে জবাব দিল, 'তাই নাকি!' বলে আমার দিকে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

আমি সোজা বলে গেলাম, 'এই পেন্সিলটা দিয়েই আমি তিন ভাগে আমার দার্শনিক মতামত লিখেছি।' কাজেই এটা যে আমার কাছে এতটা দামী এবং সেই টুকরোটা ফিরে পেতে আমার আগ্রহ হওয়াটা যে খুব স্বাভাবিক তা জেনে নিশ্চয়ই সে অবাক না হয়ে যাবে না। পেন্সিলটার দাম এখন যত সামান্যই হোক না, আমি যে কিছুতেই এটাকে হাতছাড়া করতে পারি নে। কেননা, আমার কাছে একটা জীবনের যে দাম, এ পেন্সিলটা তার চাইতে কম দামী নয়। সে যাই হোক, লোকটির সৌজন্যে আমি অত্যন্ত প্রীত হলাম, জীবনে তার কথা কখনো ভুলতে পারব না। হ্যাঁ সত্যি, সত্যি তার কথা চিরকাল আমার মনে থাকবে। প্রতিজ্ঞা প্রতিজ্ঞাই, আর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করাই আমার স্বভাব। আর লোকটিও নাকি নেহাৎ ভাল লোক। আমি তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এমনি ভাবখানা দেখিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম যে, আমি যে দরের লোক, তাতে ইচ্ছে করলেই, যে-কোন লোককে যখন তখনই একটা বড় কাজ জুটিয়ে দিতে পারি, নিদেন দমকলের অফিসে ত নিশ্চয়ই পারি। চলে আসতেই লোকটি দুবার সম্ভ্রমের সঙ্গে মাথা নীচু করে আমায় অভিবাদন জানালে, আমি

মুখ ফিরিয়ে আবার তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

সিঁড়িতে এক মহিলাকে একটি ব্যাগ হাতে নিয়ে উপরে উঠতে দেখলাম। আমায় পথ ছেড়ে দেবার জন্যে সে সসঙ্কোচে একপাশে দাঁড়িয়ে দেয়ালের দিকে মুখ ক'রে চেয়ে রইল। তাকে কিছু দিবার জন্য খেয়ালের মাথায় পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম, কিন্তু কিছুই না পেয়ে লজ্জায় মাথা নীচু করে চলে এলাম। একটা শব্দ হল, বুঝলাম সে অফিসের দরজায় ধাক্কা দিচ্চে। তার কিছু পরে টাকার ঝনঝনানিও কানে এল।

সূর্য্য তখন দক্ষিণে হেলেচে, প্রায় বারটা বেজে গেছে। রাস্তায় এখানে সেখানে লোকজনের আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে, গোটা শহরটাই জেগে উঠেচে যেন, সৌখীন লোকেরা তখন সাজগোজ করতেই ব্যস্ত। রাস্তায় কত রকমেরই না লোকের আসাযাওয়া আরম্ভ হয়েচে—কেউ হাস্‌চে, কেউ গল্প-গুজব করচে। অতি সন্তর্পণে এগিয়ে চললাম, দু' একজন চেনা লোকের সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল, তারা মোড়ে দাঁড়িয়ে লোকজনের চলাচল দেখ্‌ছিল। আমি পাশ কেটে একটা নূতন রাস্তা ধরে এগিয়ে চললাম। চলতে চলতে চিন্তার জালে জড়িয়ে গেলাম।

বুভুক্ষা

মনে হল, এই যে লোকগুলা রাস্তায় চলেচে, এরা কী সুখী! আপনার আনন্দেই এরা একান্ত বিভোর! একজনের মুখ দেখেও ত এটা মনে হয় না যে, এদের কারুর মনে এতটুকু দুঃখ আছে, কেও বোঝাও বয়ে যাচ্ছে না, হয় ত কারুর মনে এতটুকু দুশ্চিন্তার মেঘও জমে নি, হয় ত এদের কারুর প্রাণে এতটুকুও গোপন ব্যথাও নেই, এরা সত্যিই সুখী। আর আমি? এদেরই সাথে চলেচি, আমার বয়সই বা আর কত, এদেরই মত যুবক আমি অথচ সুখের ছায়া আমার মধ্যে খুঁজলেও মিলবে না।

পথ চলতে চলতে এই সব কথাই খালি আমার মনে হচ্ছিল। মনে হল, এ একটা বিরাট অবিচার। কি দুঃসহ দুঃখেই না আমার দিনগুলি কাটচে। কোনদিন যে জীবনে কিছুমাত্র সুখের স্বাদ পেয়েচি, তা ত কই মনেও হয় না, বরং যেখানে গেছি সব দিক থেকেই তাড়া খেয়েচি, কেউ এতটুকু সহানুভূতি দেখায় নি। নিরিবিলিতে কোথাও বসে যে একটু চিন্তা করব, তারও জো নেই। রাস্তায় বেরুলেই একটা না একটা ঘটনায় আমার মনের সমস্ত স্থৈর্য্য একেবারে নষ্ট হয়ে যায়, আর কিছু করবারই শক্তি থাকে না। রাস্তায় একটা কুকুরের গায়ের উপরই গিয়ে পড়ি, কি কোন লোকের কোটের বুক পকেটের গোলাপ ফুলটাই দেখি, আর আমার মানসিক চাঞ্চল্য অতি সামান্য কারণেই বেড়ে যায়।

বুভুক্ষা

আচ্ছা, কিসে থেকে আমার এই দুর্দ্দশা? ভগবান কি আমার উপর বিরূপ হয়েছেন? কিন্তু কেবল মাত্র আমার উপরই কেন এ শাস্তির ব্যবস্থা? কই, দুনিয়ায় ত আরো কত লোক আছে, তাদের কারুর উপর ত তাঁর এ অবিচার দেখতে পাওয়া যায় না? এ সম্বন্ধে যতই ভাবি, কোন কূলকিনারাই পাই না। দুনিয়ায় এত লোক থাকতে বিধাতা তাঁর খেয়াল মেটাতে আমাকেই কেন পছন্দ করেছেন তা ত কিছুতেই বুঝতে পারচি নে। বিশ্বের আর সবাইকে বাদ দিয়ে আমার উপরই যে কেন এ জুলুম, তা কে জানে? আচ্ছা, বইয়ের দোকানী পাশা বা জাহাজ কোম্পানীর বড়সাহেব হেনেচেনকেও ত পছন্দ করতে পারতেন? কই তাদের ত দিন দিনই ভুঁড়ি ফুলচে!

পথ চলতে চলতে যতই এই বিষয়টা তন্ন তন্ন করে ভাবতে লাগলাম, ততই তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া দুঃসাধ্য হয়ে উঠল। দুনিয়াশুদ্ধ সকলকার পাপের শাস্তি একমাত্র আমার ঘাড়ে চাপানোর বিরুদ্ধে বড় বড় যুক্তিও মিলে গেল। এটা স্রষ্টার খামখেয়ালীর একটা চরম দৃষ্টান্ত। সামনেই বসবার একটা আসন পেয়ে ব'সে পড়লাম কিন্তু তবু প্রশ্নটা আমায় ছাড়ল না, একেবারে পেয়ে বসল, আর কোন কথাই ভাবতে পারলাম না। সেই যে মে মাস থেকে আমার ভাগ্য-বিপর্য্যয় শুরু হল, সেই দিনকার কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে।

তখন থেকেই দিন দিন আমার দুর্ব্বলতা বেড়ে যাচ্চে। ফলে কোথাও যেতে স্বভাবতই আমার ক্লান্তি আসে। এক ঝাঁক ছোট ছোট পোকা যেন কোন রকমে আমার দেহের মধ্যে ঢুকে আমায় ফাঁপা করে ফেলেচে।

তবে কি সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর আমায় লোপ করতে চাইছেন? .. জায়গা ছেড়ে উঠে পাইচারী করতে লাগলাম।

এই সময় আমার সকল সত্তা একেবারে চরম নির্ব্বেদ ভোগ করছিল। বাহু দুটো দারুণ ব্যথায় টন্ টন্ করছিল, নাড়া চাড়াও যেন করতে পারছিলাম না, কোন রকমে রেখেও এতটুকু স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। দীর্ঘকাল উপুসে থেকে পেট ভরে খেয়ে অবধি ভারী অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল,—খাওয়াটা সত্যিই বেশী হয়েচে, কোন দিকে না চেয়ে সামনে পিছনে পাইচারী করতে লাগলাম। লোকজন সুমুখ দিয়ে যাওয়া-আসা করচে, অস্পষ্ট ভাবে তা নজরে আসচে। কখন্ যে দুটো লোক এসে আসনটা জুড়ে বসেচে তা টেরও পাই নি। তারা চুরুট ধরিয়ে জোরে জোরে কথাবার্ত্তা জুড়ে দিতেই নজর পড়ল, আমার বেশ রাগ হল এবং তাদের কিছু বলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু কি মনে করে আত্মসম্বরণ করলাম। এবং পার্কের অপর দিকে চলে গিয়ে আর একটা আসন খালি পেলাম। তাতেই বসে পড়লাম।

বুভুক্ষা

ভগবানের চিন্তাটা আমার মনকে একেবারে জুড়ে বসল। যখনই কিছু করতে যাই, তখনই দেখি তিনি এসে তাতে বাদ সাধেন। আমি ত আর বেশী কিছু চাই নে, কোন রকমে দু'বেলা দু'মুঠো খেয়ে বেঁচে থাকতে চাই, তাও কি পাব না?

দীর্ঘকাল যখনই অনাহারে কেটেচে, তখনই দেখেচি মাথায় যেন আর কিছুই নেই, মাথাটা যেন খুলি-সার, তার মধ্যে মস্তিষ্ক নামক পদার্থের এতটুকু সঙ্গতি নেই। মাথাটা এত হালকা হয়ে পড়েছিল যে, কাঁধের উপর তার অস্তিত্বই বোধ হচ্ছিল না। কোন দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেই চোখ দুটো বিস্তারিত হয়ে দূরে নিবদ্ধ হয় সেটা জানা ছিল।

বসে বসে এই সব ভাবচি। আমার উপর এহেন অবিচারের দরুণ উত্তরোত্তর আমার মেজাজ বিধাতার বিরুদ্ধে বিরূপ হয়ে উঠল। এমনি ধারা শাস্তি দিয়েই যদি আমাকে তাঁর দিকে টানছেন বলে মনে করে থাকেন ত নিশ্চয়ই বলতে পারি যে, তিনি কিঞ্চিৎ ভুল বুঝেছেন। একরকম চেঁচিয়েই আকাশের দিকে চেয়ে স্পর্দ্ধা ভরে কথাগুলি আওড়ালাম, ছেলেবেলার শিক্ষার খানিক আবছায়া মনে হল। সেই সুর করে স্তব পাঠ করা—এখনো যেন কানে লেগে রয়েচে। অবজ্ঞা ভরে চেয়ে রইলাম। খেতে যে পাই নে সেটাই আমার দুঃখের কারণ নয়, কিন্তু

বুভুক্ষা

এই দেহটাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে আহারের সন্ধানেই বা কোথায় যাই ? লোকে বলে, ভগবান সর্ব্বজীবের জন্যই আহার জুগিয়ে থাকেন, তবে আমার জন্যও নিশ্চয়ই জুগিয়ে রেখেছেন। তাঁরই স্নেহস্পর্শ যেন আমি অহরহ অনুভব করচি। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্ !

দূর থেকে গানের সুর ভেসে আসছিল। দুটো বেজে গেছে। লিখবার জন্যে কাগজ পেন্সিল নিয়ে বসে গেলাম। পকেটে হাত দিয়ে খুঁজে পেলাম কামানর টিকেটের খাতাখানা। * গুণে দেখলাম, আরো ছয়দিন কামানো চলবে। আপনা থেকেই আমার মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ল, তবু যাহোক, আরো হপ্তা দুই কামানো চলবে। এ কথা ভাবতেই একটু আরাম বোধ করলাম এই মনে করে যে, এখনো আমার সম্পত্তির মধ্যে এই নগণ্য সম্পদের অস্তিত্ব রয়েচে। খাতাখানা তখন আমার কাছে পরম বিত্ত, তাই তাকে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে পকেটে রেখে দিলাম।

কিন্তু লিখতে পারলাম না। লাইন কয়েক লিখতে না লিখতেই চিন্তার ধারা বিভিন্ন খাদে চারিয়ে গেল এবং শত চেষ্টাতেও তাকে আর নিয়ন্ত্রিত করতে পারলাম না।

* নরওয়েতে খুব কম লোকেই নিজে নিজে কামায়। নাপিতেরা সস্তায় এক মাসের জন্যে টিকেট-বই বিক্রী করে।

বুভুক্ষা

সকল জিনিষই আমায় একেবারে পেয়ে বসল এবং ক্রমে আমার মন চারদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল, সব কিছুই যেন নতুন করে মনের মধ্যে রেখাপাত করলে। মশা মাছিও কম বিরক্ত করলে না, যতই তাদের তাড়াতে চাই, তারা ততই জেঁকে এসে আমায় বিরক্ত করতে শুরু করলে। তাদের হাত থেকে যেন নিষ্কৃতির আর কোনই উপায় নেই। অনেকক্ষণ ধরে এরা আমায় বিরক্ত করলে। কখন যে পা মেলে তাদের খেলা দেখতে আরম্ভ করে দিয়েছিলাম, জানতেও পারি নি। হঠাৎ একসঙ্গে পার্কের 'ব্যাণ্ড' বেজে উঠল। চিন্তার ধারা নতুন খাদে ধেয়ে চলল।

লেখাটা শেষ করতে না পারায় নিরাশ হয়ে কাগজ-পেন্সিল পকেটে রেখে দিয়ে কাত হয়ে শুয়ে পড়লাম। মাথাটা আমার তখন এত পরিষ্কার যে, সামান্যতম চিন্তার সূত্রও যেন অনায়াসে অনুসরণ করতে পারি। হঠাৎ আমার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল আমারই পায়ের দিকে। শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার পাও যে কাঁপচে তা লক্ষ্য করলাম। একবার উঠে পায়ের দিকে ভালো করে চেয়ে দেখলাম—একটা ঝিম ঝিমানি এসে আমার দেহমনকে এক অপূর্ব্ব অবসাদে আচ্ছন্ন করে দিচে—এ রকমটা আর কখনো অনুভব করি নি। আপনা আপনিই চোখ জলে ভরে এল। এ কি দুর্ব্বলতা? আপনার

মনে প্রশ্ন করে হাত মুঠো ক'রে আপনার মনে আরবার আওড়ালাম—দুর্ব্বলতা! এই ছেলেমানুষী মনোভাবের জন্যে পরক্ষণেই নিজেকে উপহাস না করে পারলাম না। চোখের জল রুদ্ধ করবার জন্যে চোখ বুজলাম।

পায়ের জুতো জোড়া যেন কখনো দেখি নি—এমনি ভাবে তাদের গড়ন, বিশিষ্টতা ইত্যাদি খুটে খুটে দেখতে লাগলাম। পা নেড়ে নেড়ে তাদের সেই শোচনীয় পরিণাম লক্ষ্য করলাম, বর্ত্তমান অবস্থা থেকে সে যে কোন্ রঙের ছিল, কোন্ আদি-কালে তাদের বুরুস দিয়ে কালি লাগিয়ে পরিষ্কার করা হয়েছিল, তা যেন নিতান্তই এখন বৈজ্ঞানিকের গবেষণার বিষয়। আমার প্রকৃতিটাও যেন কতকটা এই জুতা জোড়ারই মত হয়ে গেছে, জুতা জোড়াই যেন আমার মনের উপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেচে, আমার মধ্যে যেন একটা উপদেবতার ভর্ হয়েচে।

অনেকক্ষণ এই সব ছেলেমানুষী মনোভাব নিয়ে আপনার মনে বসে বসে খেলা করলাম। অজ্ঞাতে কখন্ এক ক্ষীণকায় বৃদ্ধ এসে বেঞ্চিখানার আরপাশে বসেই আপনার মনে গুন্ গুন্ করে একটা গানের কলি অস্পষ্ট ভাবে গাইতে লাগল।

তার এই অত্যদ্ভুত কণ্ঠস্বরে আঁতকে উঠলাম। জুতার ভাবনা জুতাই ভাবুক। আমার এই যে চিত্ত-বিক্ষোভ তা গেল দু'তিন বছর থেকেই আস্তে আস্তে আমায় পেয়ে বসচে। মন

থেকে সে ক্ষোভ ঝেড়ে ফেলে পাশের বৃদ্ধটিকে লক্ষ্য করতে লাগলাম।

আচ্ছা, এ লোকটির উপস্থিতি কি আমার মনে এতটুকুও রেখাপাত করেচে?—না ত, কিছু মাত্রও না। দেখলাম তার হাতে একখানা পুরোনো খবরের কাগজ, বিজ্ঞাপনগুলি আমার নজরে আসছিল, কৌতূহলও হল, নজর ফিরাতে পারলাম না। যেন কেবলই মনে হচ্ছিল, খবরের কাগজখানা নেহাতই অভিনব। কৌতূহল বেড়েই চলল, সামনে পিছনে ঝুঁকে পড়ে কাগজখানা দেখছিলাম। আমার যেন কেন কেবলই মনে হচ্ছিল, এ খবরের কাগজখানায় একটা প্রচণ্ড ষড়যন্ত্রের কাহিনী ছাপা রয়েচে।

লোকটা নীরবে চেয়ে ছিল। আচ্ছা, সকলের খবরের কাগজেই ত দেখতে পাই কাগজের নামটা খুব বড় বড় অক্ষরে মুখপাতেই লেখা থাকে, এটায় ত কৈ নাম দেখচি নে? নিশ্চয়ই এর পিছনে একটা শয়তানি মতলব উঁকি মারচে। মনে হচ্ছিল, সে যেন দুনিয়ার কোন সম্পদের বিনিময়েই কাগজখানা হাতছাড়া করতে রাজী নয়, আবার পকেটে রাখতেও যেন সাহসে কুলোচ্ছিল না। বাজী রেখে বলতে পারি, ও কাগজখানার মধ্যে নিশ্চয়ই একটা কিছু আছেই। যতই কাগজখানার মধ্যে কি আছে তা জানবার সম্ভাবনা দুর্লভ মনে

হচ্ছিল, ততই আমার মনে কৌতূহল বিক্ষোভিত হয়ে উঠছিল। লোকটার সঙ্গে আলাপ করবার সূত্র বার করবার জন্যে তাকে একটা কিছু দিতে পকেট হাতড়াতে লাগলাম। কামানর টিকেট বইখানাই হাতে উঠল কিন্তু তা ফের্ পকেটেই রেখে দিলাম। হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল যে, ও রকম ভাবে কিছু একটা দিতে চাওয়া নেহাতই ধৃষ্টতা হবে. তাই সহসা খালি বুক পকেটে চাপড় দিয়ে বললাম, 'একটা সিগারেট খাবে ?'

'ধন্যবাদ ! আমি সিগারেট খাই নে।'

লোকটি প্রায় অন্ধ। চোখ বাঁচাতে গিয়ে ধূমপান ছাড়তে হয়েচে। ওর দৃষ্টিশক্তি কি অনেক দিন থেকেই খারাপ ? তাই যদি হয় ত ও ত কিছুই পড়তে পারে না, খবরের কাগজও নয়। দুঃখের বিষয় সন্দেহ নেই। ও আমার দিকে তাকাল ; ওর সেই দুর্ব্বল চোখ দুটিতে ক্ষীণ অসহায় দৃষ্টি ভারী অস্বস্তি বোধ করলাম।

ও বল্লে, 'তুমি এখানে নতুন এসেচ ?'

'হাঁ।'

ও কি ওর হাতের কাগজখানার নামও পড়তে পারে না ?

তা হবে। সেই জন্যই ওর শোনার শক্তি অপেক্ষাকৃত প্রবল। আর সেই কারণেই আমি যে নবাগত সেটা ও শুনতে পেল।

ও বল্‌লে, 'আমি তোমায় শুধোতে চাইছিলাম, তুমি কোথায় থাক ?'

হঠাৎ মাথায় একটা মিথ্যা কথা জোগাল, আপনা থেকেই নির্ব্বিকার ভাবে মিথ্যা বলে গেলাম, '২ নং সন্ত ওলেভ প্লেশ-এ থাকি।'

তাই নাকি ? ও যেন সন্ত ওলেভ প্লেশ-এর প্রতি ধূলিকণার সঙ্গে পর্য্যন্ত পরিচিত। সেখানে একটা ফোয়ারা, গোটা কয়েক লাইট-পোস্‌ট্‌, কয়েকটা গাছ আছে ; ওর সব মনে আছে।

'কয় নম্বরের বাড়ীতে থাক ?' ও আমায় জিজ্ঞাসা করল।

লোকটার হাত এড়াবার জন্যে উঠে পড়লাম। খবরের কাগজটাই আমার মেজাজ খারাপ করে দিয়েচে। তাই মন থেকে তা ঝেড়ে ফেলতে সংকল্প করলাম। ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'পড়তেই যখন পার না, তখন কাগজটা দিয়ে কি করবে ?'

আমার কথায় কান না দিয়ে লোকটা বল্‌লে, 'দু'নম্বরে থাক বল্‌ছিলে না ? একদিন ছিল যখন দু'নম্বরের প্রত্যেকটি লোককে আমি জানতাম। তোমার বাড়ীওয়ালার নাম কি ?'

ওর হাত এড়াবার জন্যে তৎক্ষণাৎ যা-তা একটা নাম বানিয়ে বলে লোকটার মুখ বন্ধ করে দিলাম। কিন্তু নাম শুনে ও বলে উঠল, 'তাই নাকি ?'

আমি অবাক হয়ে ওর দিকে তাকালাম। লোকটা আমার কাল্পনিক নামটা এমন সুরে আওড়ালে যে, নামটা যেন তার নেহাতই জানা।

ইতিমধ্যে লোকটা হাত থেকে কাগজের বাণ্ডিলটা বেঞ্চির উপর রাখল, আমার কৌতুহল আবার চেগে উঠল। লক্ষ্য করে দেখলাম, কাগজের মধ্যে এখানে সেখানে দুচারটা মোম বাতির দাগ রয়েচে।

ও জিজ্ঞাসা করলে, 'আচ্ছা, তোমার বাড়ীওয়ালা নাবিকের কাজ করে না ?' তার কথার সুরে কোন রকম চাপা বিদ্রূপের কোন আভাসই পেলাম না। ও আবার বল্‌লে, 'আমার যেন মনে হচ্ছে, সে সে-কাজই করত বটে।'

'নাবিক ?—মাপ করতে হচ্চে। তুমি যার কথা বলচ, সে ভাই হয় ত। ইনি অন্য কাজ করেন।'

মনে হল, হয় ত এই খানেই শেষ হবে, কিন্তু যা-কিছু বলচি তাতেই দেখচি ওর যথেষ্ট অনুরাগ। মনে হল, ও নাম না বলে আর কোন একটা অদ্ভুত গোছের নাম বল্‌লে হয় ত ওর কোনই সন্দেহ জাগত না।

ও বল্‌লে, 'শুনেচি তিনি একজন কৃতী লোক !'

জবাব দিলাম, 'নিশ্চয় ! বেশ করিতকর্ম্মা লোক। ব্যবসা বাণিজ্য বেশ বোঝেন, অনেক কিছুরই কারবার করেন।

চীন দেশ থেকে জাম, রুশিয়া থেকে পাখীর পালক, তা ছাড়া চামড়া, ভূষি, লিখবার কালি—আরো কত কি!—'

লোকটা উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, 'তাই নাকি!' ব্যাপারটা ভারী মজার হয়ে দাঁড়াল। আমি একটার পর একটা মিথ্যা কথা বানিয়ে বানিয়ে বলে যেতে লাগলাম। আবার রসে পড়লাম, তখন আর খবরের কাগজের কথা আমার মনেও ছিল না। লোকটার অতিমাত্র সরলতা আমায় বোকা বানিয়ে দিল। একটার পর একটা মিথ্যা বলে বলে লোকটাকে স্তম্ভিত করে দিচ্ছিলাম। ও আমার প্রত্যেকটা কথাই বিশ্বাস করছিল, এবং তার জন্যে ওকে কিছুমাত্র বেগ পেতে হয় নি। আমি কিন্তু এতে ক'রে একটু নিরাশ না হয়েও থাকতে পারলাম না। আমার ধারণা ছিল, লোকটা আমার বানানো কাহিনী শুনে একেবারে 'থ' হয়ে যাবে কিন্তু আসলে সে সব কথাই মেনে নিল।

খুঁজেপেতে আরো গুটিকয়েক মিথ্যা মগজ থেকে আন্‌কোরা বার করলাম। লোকটাকে বল্‌লাম, 'আমার বাড়ীওলা ন'বছর পার্শিয়ায় মন্ত্রীগিরি করেছেন। মন্ত্রী কাকে বলে তা হয় ত তোমার ধারণাই নেই। ছোটখাটো রাজা বা বাদশাহ্‌ বল্‌লেই চলে। বাড়ীওলা একাই রাজ্যের সব কাজ করেছেন। তাঁর মেয়ে ল্যাজ্বালি স্বর্গের অপ্সরী, একেবারে রাজকন্যার

মত। তার তিন শ' দাসী আছে। সে কৌচের উপর বসে থাকে। তার চাইতে সুন্দরী আমি আর দেখি নি।'

বৃদ্ধ জবাব দিল, 'তাই নাকি? সত্যি সে অত সুন্দরী?' বলেই ও মাটির দিকে অর্থহীন চেয়ে রইল।

'সুন্দরী? সাংঘাতিক সুন্দরী, ভয়ানক সুন্দরী, চোখ দুটি উজ্জ্বল ডাগর, গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, বাহু দুটি সুডৌল। তাঁর দৃষ্টিই যেন চুম্বন। সে যখন হেসে আমার দিকে তাকিয়ে ডাকে তখন আমার মধ্যে একটা ওলটপালট হয়ে যায়। আমি যেন মোহাচ্ছন্ন হয়ে থাকি। সে অপ্সরী, পরী, রাজকন্যা।'

লোকটা কিন্তু কিছুমাত্র দিশেহারা হল না। কেবল বল্লে, 'তাই নাকি?'—বলেই আবার চুপ করে গেল। ওর এই নীরবতা আমার ভাল লাগছিল না। নিজের কণ্ঠস্বরেই আমি উত্তেজিত হয়ে উঠছিলাম। গম্ভীর ভাবে কথা বলতে লাগলাম, খবরের কাগজ বা তার মধ্যে যে ষড়যন্ত্রের কাহিনী রয়েচে সে কথা একদম ভুলে গেলাম। কাগজের বোস্তানিটা তখনো আমার আর লোকটার মাঝখানে রয়েচে। বোস্তানির মধ্যে কি আছে জানবার এতটুকু আগ্রহও আর আমার নেই। লোকটাকে ভোগা দিতে গিয়ে যে কাহিনী গড়ে তুলছিলাম, তাতেই একেবারে ডুবে গেলাম। দেহের সমস্ত রক্তস্রোত মাথার মধ্যে চড়াও হল। আমি খামকাই অট্টহাসি হেসে উঠলাম।

বুভুক্ষা

লোকটা যেন তখনই চলে যাবে মনে হল। উঠে দাঁড়িয়ে আড়ামোড়া ভেঙ্গে বল্‌লে, 'আচ্ছা, তোমার বাড়ীওয়ালা কি জমিদার ?'

ওর বেহায়াপনা আমায় উত্যক্ত করে তুল্‌লে। নামটা একবারও ভুল হল না। আমার মেজাজ বিগড়ে গেল। লোকটার উপর বিতৃষ্ণাও হয়, আবার অনুকম্পাও আসে।

তাই জবাব দিলাম, 'সে কথা আমি কিছুই জানি নে।'

আমার উগ্রতা দেখে লোকটা চুপ করে গেল, মনে মনে বল্‌লাম, 'যাও না, একবার তাঁর স্ত্রীর সাথে দেখা করে এসো। চাটুকার কোথাকার …'

লোকটা কি অদ্ভুত, আমার প্রত্যেকটা মিথ্যা খবরকেই সে সত্যি বলে মেনে নিয়েচে। বেশী কথাও বলে নি, পাছে আমি রেগে যাই।

কিন্তু সত্যি সত্যিই আমি রেগে গেলাম। গর্জ্জন করে বলে উঠলাম, 'পাজি কোথাকার! ভেবেচ, আমি এখানে বসে বসে যতসব গাঁজাখুরি নিছক মিথ্যে বুলি ক্রমাগত আউড়ে যাব! তোমার মত পাজির পা-ঝাড়া লোক ত কস্মিনকালেও দেখি নি। তোমার মতলবটা কি ? তুমি কি ভেবেছ, আমি তোমারই মত লক্ষ্মীছাড়া ভিখিরী ? তাই যদি ভেবে থাক ত

জেনে রাখ যে, আমি সে অপমান কিছুতেই সইব না,—তা তুমি যেই হও না কেন !'

লোকটা বোকার মত মুখ কাচুমাচু করে উঠে পড়ল এবং আমার কথাগুলি যেন নিঃশ্বাস না ফেলেই গিলে ফেল্‌লে, তারপর হঠাৎ বেঞ্চির উপর থেকে খবরের কাগজের বোস্তানিটা তুলে নিয়েই ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে বেরিয়ে গেল।

আমি ঝুঁকে পড়ে লোকটার যাওয়া দেখ্‌ছিলাম। বুড়ো মানুষ যেমন ছোট ছোট পা ফেলে ত্রস্ত হাঁটে, লোকটাও ঠিক তেমনি হেঁটে চোখের আড়াল হয়ে গেল। আমার মনে কেমন করে যেন এই ধারণাটা বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, এর মত বদমায়েস দুনিয়ায় আর একটি নেই। ওকে যে তীব্র ভৎর্সনা করলাম, তার জন্যে মনে কোনরূপ ক্ষোভই হল না।

দিনের আলো ক্রমে ম্লান হয়ে আসছিল—সূর্য্য পাটে বসেচে, গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে অস্তগামী সূর্য্যের শেষ কিরণ এসে পড়েচে। বড়ঘরের আয়ারা সব এতক্ষণ গাছের ছায়ায় ছেলে-মেয়েদের নিয়ে গুলতানি করছিল—এইবার তারা তাদের ঠেলা-গাড়ীতে 'বাবা-লোগ'দের চড়িয়ে নিয়ে একে একে বাড়ী ফিরতে লাগল। আমার মেজাজ তখন বেশ শরিফ। মনের যত্‌-কিছু উষ্মা যত-কিছু উত্তেজনা যতই আস্তে আস্তে মিইয়ে আসছিল, ততই পা-টা যেন নেতিয়ে পড়তে লাগল, ক্লান্তিতে

অবসাদে ঝিমিয়ে পড়ছিলাম। এতগুলি রুটি মাখন খাওয়ার জন্যে আইঢাই ভাবটাও আর ছিল না। বেঞ্চির হাতলে মাথা দিয়ে কাৎ হয়ে চোখ বুজে ঝিমুতে লাগলাম। কখন্ যে অজানতে ঘুমিয়ে পড়লাম জানতেও পারি নি, কিন্তু তখনই বাগানের একটা চৌকীদার এসে আমার কাঁধে হাত দিয়ে বল্লে, 'এখেনে বসে বসে ঘুমোন চলবে না বাবু, এটা শোয়ার জায়গা নয়। সরে পড়!'

'বেশ!' ধড়ফড় করে উঠে দাঁড়াতেই দুর্ভাগ্যের কথাটা মনে পড়ে গেল। এ রকম আলসেমি করে ত হবে না। কিছু যে করতেই হয়। এ ভাবে ত আর চলে না। চাকরীই বা কোথায় পাই? চেষ্টারও ত কিছু কসুর করচি নে। প্রশংসাপত্রগুলিও নাড়াচাড়া করতে করতে পুরান হয়ে গেল, আর সেগুলি এমন সব লোকের দেওয়া যাদের বড় একটা কেউ চেনেও না, তাই সেগুলি কাজেও আসছিল না। সারাটা গ্রীষ্ম ভরেই ত কত জায়গায় উমেদারী করলাম কিন্তু কই, কি হল? সব জায়গা থেকেই ত তীব্র ব্যর্থতা মিলেচে। ফলে কতকটা নিরাশ হয়েই পড়েছিলাম। ঘড়ভাড়া এখনো বাকী, আর দেরী করলেও নয়, যেমন করেই হোক, ভাড়াটা যে চুকিয়ে দিতেই হবে; তারপর আস্তে আস্তে দিন যদি একবার পাই!

বুভুক্ষা

এক রকম অনিচ্ছার সঙ্গেই আবার কাগজ পেন্সিল হাতে তুলে নিলাম। এবং কাগজের চার কোণে যন্ত্রচালিতের মত ১৮৪৮ সালটা কেন না জানি লিখে ফেল্‌লাম। যদি আমার অজ্ঞাত চিন্তার একটা কণা ভাষা হয়ে একবার বেরিয়ে পড়ে তাহলেই ত হল। কেন, এমন দিনও ত গেছে, বড় বড় প্রবন্ধ আমি অবলীলাক্রমেই লিখে ফেলেচি, আর তা কিছু মাত্র খারাপও হয় নি।

বেঞ্চিতে বসে বসে সারা কাগজটা ভরে কেবল ১৮৪৮ সালটাই অসংখ্যবার লিখলাম। যত রকম কায়দাতে সম্ভব, অক্ষরগুলি সাজিয়ে গেলাম—যদি সেই ফাঁকে মাথায় কিছু আসে ত লিখে ফেলব এই মতলব ছিল। কিন্তু কতকগুলি খাপছাড়া চিন্তা মাথায় এসে বায়োস্কোপের ছবির মত মিলিয়ে গেল। দিনের আলো যে শেষ হয়ে আসচে এই ভাবনায় লজ্জায় আমার মাথা নুয়ে আসছিল। শরৎ এসে পড়েচে—সঙ্গে সব কিছুই যেন অসাড় নির্জ্জীব হয়ে গেছে। পোকা থেকেই প্রথম শুরু। গাছপালায় মাঠে সর্ব্বত্র ওদের সেই বেঁচে থাকার জন্যে কঠোর প্রচেষ্টা গুন্ গুন্ স্বরে প্রচারিত হচ্চে। ওরা মরতে চায় না, বাঁচতে চায়; তারই জন্যে ওদের সে আকুল আগ্রহ। চিরপদ-দলিত পতঙ্গকুল বেঁচে থাকবার জন্যে কী চেষ্টাই না করচে। ওদের দিন যে ফুরিয়ে এসেচে! ওরা ওদের সবুজ মাথা ঘাসের

গোড়ায় ঢুকে, হাত-পা ছড়িয়ে কাঠমেরে যাচ্চে, তারপর সামান্য বাতাসে এখানে সেখানে গিয়ে উড়ে পড়চে।

প্রত্যেক বাড়ন্ত জিনিষেরই একটা নিজস্ব বিশেষত্ব আছে, শীতের শুরুতেও তার সেই ঠাণ্ডা হাওয়া বেশ আরাম দেয়। গাছের পাতা ঝড়ে পড়ে—মনে হয় যেন গুটিপোকা।

শরতের মুরশুম। আবার মহোৎসব লেগে গেছে। গোলাপ বাগিচায় রঙের দেয়ালি শুরু হয়েচে।

জীবনের মূলে মরণের টান বড্ড বেশী করেই যেন অনুভব করতে লাগলাম। প্রাণশক্তি যেন আস্তে আস্তে নিঃশেষ হয়ে আসচে। বেঁচে থাকার প্রয়োজনও যেন আর নেই। ভাগ্যের এই নির্ম্মম মূর্ত্তি কল্পনা করে আমি আতঙ্কে উঠে দাঁড়ালাম। এবং সামনের রাস্তা দিয়ে প্রচণ্ড পদবিক্ষেপ করতে আরম্ভ করলাম। দু'হাত জোরে জোরে চেপে ধরে চীৎকার করে উঠলাম, 'না,—তা হবে না! এর শেষ কোথায় দেখতে হবেই।' আবার বেঞ্চিতে বসে পড়লাম এবং কাগজ পেন্সিল নিয়ে মনোযোগের সঙ্গে একটা প্রবন্ধ লিখতে শুরু করে দিলাম।

এ ছাড়া যে আর কোন উপায় নেই—কল্পনায় দেখছিলাম, বাড়ীভাড়া যেন তার সেই ভীষণ মূর্ত্তি নিয়ে আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছে।

বুভুক্ষা

ধীরে—অতি ধীরে ভাবগুলো বিধিবদ্ধ হল। গভীর মনোযোগের সঙ্গে লিখ্‌তে শুরু করে দিলাম, এবং অনায়াসে লিখে গেলাম। লেখাও যে বেশই হল তাও বুঝতে পারছিলাম। ভূমিকাস্বরূপ কয়েক পৃষ্ঠা লেখা হয়ে গেল। এ লেখাটি যে-কোন লেখার গোড়াতেই বসান যায়। হয় একটা ভ্রমণকাহিনী, নয় ত একটা রাজনৈতিক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখব বলেই স্থির করলাম। মোট কথা, যে-কোন একটা ভাল লেখার গোড়া পত্তন এর দ্বারা হতে পারে। কাজেই কোন্ বিষয় নিয়ে কলম চালাব তাই মনের মধ্যে আঁতিপাঁতি করে খুঁজতে লাগলাম। কেবল একটা ঘটনা বা কোন ব্যক্তিবিশেষকে উপলক্ষ্য করে লেখা চলতে পারে; কিন্তু মাথায় কিছুই আসছিল না। তার উপর এই ব্যর্থ প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে আবার দ্বিধা, আবার সঙ্কোচ এসে আমার কেন্দ্রীভূত চিন্তাকে বিছিন্ন করে দিল। মনে হল, মাথা যেন একেবারে খালি, তাতে মগজ যেন কিছুমাত্র নেই। মাথাটা যেন নেহাৎই অনাবশ্যক ভাবে কাঁধের উপর বসে আছে! যেন কিছু করবার সঙ্গতিই নেই। সকল ইন্দ্রিয় দিয়েই অনুভব করছিলাম যে, মাথার খুলি একেবারে খালি, একেবারে ফাঁপা। দেহের কোথাও যেন কিছু নেই—সবই যেন ফাঁকা, সবই যেন ফতুর।

গভীর বেদনায় আমি চীৎকার করে বলে উঠলাম, 'ভগবান, ভগবান, কী করলে এ!'

বার বার কথা আবৃত্তি করতে লাগলাম।

শন্ শন্ করে হাওয়া দিচ্ছিল। ভাবলাম ঝড় হবে। আরো খানিকক্ষণ সেখানে বসে বসে লেখা কাগজগুলির দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার কেন্দ্রীভূত চিন্তার সূত্র তখন ছিঁড়ে গেছে। নিরুপায় হয়ে কাগজগুলি ভাঁজ করে জামার পকেটে রেখে দিলাম। ঠাণ্ডা লাগছিল, ওয়েষ্ট কোটও গায়ে নেই, কোটের সবগুলা বোতাম বেশ করে এঁটে দিলাম। পকেটে হাত দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে চলতে আরম্ভ করলাম।

যদি এই সময়টা আমি প্রবন্ধটা লিখতে পারতুম, যদি শেষ করতে পারতাম একবার! দুই দুইবার বাড়ীউলি আমার দিকে দৃষ্টি হেনে বাড়ীভাড়ার কথা জানিয়ে দিয়েছিল। অনুপায় হয়ে লজ্জারক্ত মুখে মাথা নীচু করে পাশ কাটিয়ে পালিয়ে আসতে হয়েচে। কিন্তু কতবার এমনি পালিয়ে পালিয়ে থাকব? এবারে যখন তার দৃষ্টির সামনে পড়ব তখন কি জবাব দিব নিজেকে?—না, এ আর চলতে পারে না।

পার্কের গেটে এসে পৌঁছুতেই দেখতে পেলাম, সেই বুড়োটা—যাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম—একটা বেঞ্চিতে বসে জিরোচ্চে। সেই রহস্যের আধার খবরের কাগজখানা তার পাশেই খোলা পড়ে রয়েচে, তাতে নানা রকম খাবার রয়েচে, সম্ভবত সে তখন খাচ্ছিল। এই কিছুক্ষণ আগে আমি যে

তার প্রতি দুর্ব্যবহার করেচি তার জন্যে তার কাছে ক্ষমা চাইতে ইচ্ছা হল, কিন্তু তার খাবার দেখেই বাধা পেলুম। সে তখন তার জীর্ণ হাত মাখন দিয়ে মাখান রুটিগুলা অসভ্যের মত গিলছিল। আঙুল ত নয়, থাবা! মনটা কেমন হয়ে গেল, তাকে কিছু জিজ্ঞাসা না করেই বার হয়ে গেলাম। সেও কিন্তু আমায় চিনতে পারে নি; সে তার দুটো চোখ দিয়েই আমার দিকে কটমট করে তাকালে। সে দৃষ্টি একেবারে প্রাণহীন, মুখের কোন স্থানই একটুকুও কুঞ্চিত হল না।

অনায়াসে পথ চলতে লাগলাম। অভ্যাস মত পথে যতগুলি খবরের কাগজের প্রাচীরপত্র দেখতে পেলাম, সেগুলি পড়বার জন্যে খানিকক্ষণ করে দাঁড়িয়ে যেতে লাগলাম। আশা, যদি কোথাও চাকরী খালি থাকে। সুখের বিষয়, আমি চেষ্টা করতে পারি এমন একটি বিজ্ঞাপন আমার নজরে পড়ল।

এক মুদীর দোকানের খাতাপত্র লিখবার জন্যে একজন মুহুরী দরকার। সপ্তাহে ঘণ্টা কয়েক মাত্র খাটুনী। দেখা করে মাইনে ঠিক করতে হবে। মুদীর নাম ও ঠিকানা টুকে নিয়ে ভগবানের নিকট নীরবে প্রার্থনা করলাম—কাজটি যেন হয়। এ কাজের জন্যে অন্যে যা দাবী করবে আমি তার চাইতে কমই চাইব নিশ্চয়। যত কমই হোক না, বর্ত্তমান অবস্থায়, তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট বলতে হবে।

বুভুক্ষা

বাড়ী গিয়ে আমার টেবিলের উপর বাড়ীউলির এক তাগিদ চিরকুট দেখলাম। তাতে তিনি জানিয়াছেন যে, অতঃপর ঘরভাড়া তিনি আগাম চান। আমার অসুবিধে হলে অবিলম্বে ঘর ছেড়ে দিতে হবে। এতে অবশ্য আমার ক্ষুণ্ণ হবার কোনই কারণ নেই, এ ছাড়া যে তার কোন উপায়ই ছিল না আর। বাড়ীউলি সহৃদয় সন্দেহ নেই।

সে যাই হোক, দরখাস্ত একখানা লিখে লেফাপা দুরস্ত করে তখুনিই তা ডাকে দিয়ে এলাম। ঘরে ফিরে এসে আমার দোলা-চ্যায়ারখানায় বসে কত কি ভাবতে লাগলাম। ক্রমে অন্ধকার জমে আসছিল। বেশীক্ষণ বসে থাকাও সম্ভব ছিল না।

পরদিন খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলে চেয়ে দেখি তখনও বেশ আঁধার আছে। একটু পরেই নীচের ঘড়িতে ঢং ঢং করে পাঁচটা বেজে গেল। আমি ফের্ ঘুমুতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু ঘুম আর এল না। তখন রাজ্যের ভাবনা চিন্তা এসে আমাকে পেয়ে বসল;

হঠাৎ আমার মাথায় এমন গোটাকয়েক কথা এসে গেল, যা একটা ছোটগল্পের শুরুতে বেশ লেগে যায়। তার যেমন ভাষার বাঁধুনি তেমনি তার সৌন্দর্য্য—এমনটা কিন্তু আর কথনো হয় নি। কথাগুলি শুয়ে শুয়ে বার বার আওড়াতে লাগলাম।

পরপর আরো কতগুলি এসে এদের সঙ্গে ভিড় করে জুড়ে গেল। আমি বিশেষভাবে সচেতন হয়ে উঠলাম। লাফ দিয়ে উঠে ভাঙা টেবিল থেকে কাগজ পেন্সিল কুড়িয়ে নিয়ে নিলাম। তখন আমার মনে হচ্ছিল যে, না লিখলে যেন আমার একটা শিরা ছিঁড়ে যাবে; শব্দের পর শব্দ যোজনা করে অল্প সময়ের মধ্যেই একটা লেখা শেষ করে ফেল্‌লাম। কত কথা আমার মাথায় এসে বুদ্বুদের মত মিলিয়ে যেতে লাগল; আমার মন তখন একটা পরিপূর্ণ খুশীতে ভরে গেল। আমি যেন সব মুখস্থ কথা লিখচি, এমনি ত্রস্ত লিখে চল্‌লাম—মুহূর্ত্তের জন্যও আমার কলম থামছিল না।

ভাবগুলি আমার মাথায় এত দ্রুতগতিতে আসছিল যে, পঞ্জাব মেলে কলম চালিয়েও আমার মনের সে ভাবসম্পদকে অক্ষরে ধরে রাখতে পারছিলাম না। অনেক ভাল ভাল জিনিষই হাতছাড়া হয়ে গেল। ভাবগুলি যেন আমায় চারদিক থেকে আক্রমণ করচে; বিষয়টি আমার সম্পূর্ণ অধিগত, এবং তার প্রত্যেকটি শব্দই যেন অনুপ্রেরণার সঙ্গে বার হয়ে আসছিল। এই অত্যদ্ভুত ভাবটি বেশ খানিকক্ষণ আমার অধিকারে রইল—এবং শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সমানে তা সচল ছিল। পনর বিশ পৃষ্ঠা লেখা হয়ে গেল, তখন লেখা থামিয়ে পেন্সিল একপাশে রেখে দিলাম। এই লেখাটি যে অমূল্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহই

আমার ছিল না। কাজেই চট্ করে জামাকাপড় পরবার জন্যে উঠে পড়লাম। তখন বেশ ফর্সা হয়ে আসছিল—সেই আলোকে দরজার পাশে দেয়ালে মোড়া খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন স্পষ্ট পড়তে পারছিলাম। কষ্টেস্যষ্টে লেখাপড়া করা যেতে পারে। লেখাটা পরিষ্কার করে টুকে ফেলতে আরম্ভ করে দিলাম।

আমার এই কল্পনাগুলি থেকে আলো ও রঙের এক অদ্ভুত উগ্র বাষ্প বার হতে লাগল। লেখার মধ্যে একটির পর একটি সুন্দর জিনিষ দেখে মনটা বিস্ময়ে অবাক হয়ে যাচ্ছিল এবং আপনার মনে এ কথা স্বীকার না করে পারছিলাম না যে, এর চাইতে উৎকৃষ্টতর কিছু আমি পড়ি নি। মাথাটা যেন খুশীর স্রোতে ভাসতে লাগল। খুশীতে আমি একেবারে ফুলে উঠলাম; শব্দসম্পদ যেন হঠাৎ আমার অসম্ভব রকম বেড়ে উঠল।

লেখাটা বার কয়েক নেড়ে চেড়ে আপনার মনে তার মূল্য নিরূপণ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। আমার মনে হল যে, অন্তত পাঁচ টাকা যে লেখাটা দেওয়া মাত্রই পাব সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পাঁচ টাকা সম্বন্ধে যে দর কষাকষি হতে পারে এ কথা কারুর মনেই আসে না—কেননা লেখার তুলনায় দশ টাকা হলেও খুব সস্তা বলেই মনে হবে।

এ রকম চমৎকার লেখা বিনি পয়সায় ছাড়ার ইচ্ছা আমার মোটেই ছিল না। আমি বেশ জানি যে, এ রকম গল্প যার-তার

কলম থেকে যখন তখন মিলে না, কাজেই দশটি টাকা অন্তত চাই-ই।

ক্রমে ঘরে আলো এসে পড়ল—দেয়ালের গায়ের খবরের কাগজের ছোট ছোট হরফগুলি পড়তেও আমার এতটুকু কষ্ট হচ্ছিল না। তখন ঘড়িতে মাত্র ছয়টা বেজেচে।

মেঝের উপর দাঁড়িয়ে কি ভাবতে লাগলাম, বাড়ীউলির তাগিদ ঠিক সময়েই এসেচে; এ ঘরটা সত্যিই আমার মত লোকের বাসের যোগ্য নয়, জানলায় নেহাৎ সাধারণ নীল রঙের পর্দ্দা, দেয়াল খবরের কাগজে মোড়া; খেতে জোটে না, এক কোণে যে তথাকথিত দোলা চ্যায়ারখানা রয়েচে তাকেও দোলা-চ্যায়ারই বলতে হচ্চে, অথচ যার মাথায় এতটুকুও কাণ্ড-জ্ঞান আছে, সে-ই এ চ্যায়ারটা দেখে হেসে উঠবে। কেননা বয়স্কের পক্ষে চ্যায়ারখানা নেহাতই নীচু এবং একবার কষ্টেসৃষ্টে বসলে উঠতে হয় একান্তই কায়ক্লেশে। এককথায় বলতে গেলে এ ঘরটার চারপাশে এমন একটা আবহাওয়া আছে—যাতে জ্ঞানার্জ্জনের পথ একান্তই রুদ্ধ। এই কারণে ঘরটা ছেড়ে দেব ছেড়ে দেবই মনে করচি। এ ঘর কিছুতেই আর রাখা চলতে পারে না। নিজের উপর এতদিন অবিচারই করেচি; না, আর না, এই গহ্বরে বাস আর চলবে না কিছুতেই।

বুভুক্ষা

লেখাটা বার বার পকেট থেকে বার করে পড়ে আশায় আনন্দে আমার মন ভরে উঠছিল। এবারে মন দিয়েই আমায় লেখা শুরু করতে হবে, তা ছাড়া উপায় নেই! কাগজের বোস্তানিটা, গোটা কয়েক কলার, রুটি মোড়া খানকয়েক পুরানো খবরের কাগজের টুক্‌রা, সবকিছু লাল রঙের একখানা রুমালে বেঁধে ফেল্‌লাম। কম্বলখানা ভাঁজ করে নিলাম এবং সাদা কাগজ ক'খানা ভাঁজ করে পকেটে রাখলাম। তার পর ঘরের প্রত্যেক কোণ আঁতিপাতি করে পরীক্ষা করে দেখলাম—কিছু রয়ে গেল কি না। আর কিছুই যখন নজরে এল না তখন জানলার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকালাম।

সকালটা বিষণ্ণ। আগুনে পোড়া কামারশালায় কাউকে দেখা গেল না। উঠানে ভিজা কাপড় তখনো ঝুলছিল। সবই আমার চির-পরিচিত। জানলা থেকে সরে এসে ভাঁজ করা কম্বলখানা কাঁধে তুলে নিয়ে দেয়ালে মোড়া খবরের কাগজের বাতি-ঘরের ও রুটিওয়ালার বিজ্ঞাপনের সম্মুখে মাথা নুইয়ে নমস্কার করলাম। দরজা খুলে ঘরের বার হব, এমন সময় সহসা বাড়ীউলির কথা মনে পড়ে গেল; তাকে ত না জানিয়ে যাওয়া চলে না, সে জানুক দরিদ্র হলেও সে এতদিন একটি ভাল লোককেই ঘর ভাড়া দিয়েছিল।

সে যে আমাকে দিন কয়েক বেশী থাকতে দিয়েচে

এ জন্যে তাকে লিখে ধন্যবাদ জানাতে ইচ্ছে হল। কিছু দিনের জন্যে ত আমি নিশ্চিন্ত হলাম। এই নিশ্চিন্ত ভাবটা আমার মনে নিশ্চিত হয়েই দেখা দিল, কাজেই তাকে একদিন পাঁচ শিলিং দেব বলে প্রতিশ্রুতি পর্য্যন্ত দিলাম, লিখলাম যে, এ পথ দিয়ে যেতে আসতে একদিন এসে টাকাটা দিয়ে যাব।

তা ছাড়া এতদিন তার ঘর যে ব্যক্তি ভাড়া নিয়েছিল সে যে সত্যিই সত্যিই একজন সাউকার লোক এটা তাকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার।

টেবিলের উপর চিঠিখানা রেখে ঘরের বার হয়ে পড়লাম।

ঘরের বাইরে এসে দরজার সামনে আর একবার দাঁড়ালাম, পিছন ফিরে তাকিয়ে চারদিকে নজর দিতেই স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টির বৈচিত্র্যের কথা মনে পড়ে গেল। আমার প্রতি তাঁর অসীম করুণার জন্যে তৎক্ষণাৎ হাঁটু গেড়ে প্রাণের একান্ত শ্রদ্ধাভক্তি নিবেদন করলাম।

আমি জানতাম—জানতাম, তাঁর করুণার জন্যে কাল যে আকুল প্রার্থনা করেছিলাম, আজ তার ফলেই আমার প্রাণে লিখবার এই প্রেরণা এসেচে। এ একান্তই দৈব-প্রেরণা।

আপনার মনে বলে উঠলাম—এ ভগবানের দান—এ তাঁরই দান। বলতে বলতে আনন্দে আমার কান্না এল। কান খাড়া করে শুনলাম, সিঁড়িতে কারুর পায়ের শব্দ শুনা যাচ্চে কি?

বুভুক্ষা

এবারে যাত্রার জন্যে তৈরী হলাম। নিঃশব্দে গা-ঢাকা দিয়ে আস্তে আস্তে বাড়ীর বার হয়ে পড়লাম।

অতি ভোরে বৃষ্টি হয়েছিল, তার ফলে পথঘাট তখনো পিছল হয়ে চক্‌চক্ করছিল। সারা শহরটার উপর এঁদো আকাশটা যেন ঝুলে রয়েচে। কোথাও এক ফোটা রোদ দেখা যাচ্চে না। আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম—এমন দিনে কি মিলবে! টাউন হলের দিকে হেঁটে চল্‌লাম। দেখি তখন সবে সাড়ে আটটা বেজেচে। এখন আরো ঘণ্টা কয়েক ঘুড়ে বেড়াতে হবে; কেননা দশটা এগারটার আগে সম্পাদকের কাছে গিয়ে কোন লাভ নেই—ততক্ষণ পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হবে, কিছু খেয়ে নিতে পারলে অবশ্য ভাল হত। সে যাই হোক, আজো যে না-খেয়েই রাত কাটাতে হবে না এ ভরসা রয়েচে। সেদিন আর নেই। ভগবানের অসীম করুণা! দারুণ দুঃস্বপ্নের মত যেন দুর্দ্দিন কেটে গেছে। আজ আমি এ সবের একটু উপরে!

কিন্তু কম্বলটা নিয়ে ভারী মুশ্‌কিলেই পড়ে গেলাম। হাজার লোকের চোখের সামনে দিয়ে এ অবস্থায় কম্বলটা বয়ে নিয়ে বেড়াতে আমার ভারী সঙ্কোচ বোধ হতে লাগল। লোকে আমার সম্বন্ধে না-জানি কি ভাবচে! চলতে চলতে মনে হল, আচ্ছা, এটা কোথাও রেখে দেওয়া চলে না? হঠাৎ

মনে হল, কেন এটাকে কোন একটা দোকানে নিয়ে গিয়ে বেশ করে 'প্যাক' করে নেওয়া যেতে পারে। তাতে যে দেখতেই ভাল হবে তাই নয়, বয়ে নিয়ে বেড়াতেও আর লজ্জা করবার কিছু থাকবে না।

সামনেই একটা দোকান দেখে ঢুকে পড়লাম। একটি ছোক্‌রাকে কম্বলটা প্যাক্‌ করে দিতে হুকুম করলাম।

ছেলেটা প্রথমটা কম্বলটার দিকে তাকাল, তারপর আমার দিকে। মনে হল, ছেলেটা আমার হাত থেকে কম্বলটা নিয়ে আপনার মনে আমার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইল। আমার মেজাজটা চড়ে গেল। আমি তাকে এক রকম চীৎকার করেই বল্‌লাম, 'ওহে ছোকরা, আরো একটু ভব্যতা শিখো। যে রকম হেলাফেলা ভাবে কম্বলটা নাড়াচাড়া করচ, তাতে ওর মধ্যে যে দামী ঠুন্‌কো জিনিষ আছে তা ভেঙে যাবে। মোড়কটা আমায় এ ডাকেই স্মার্ণা পাঠাতে হবে।'

কথাটা বেশ কাজে এল। ছেলেটা তার অঙ্গ চালনায় এমন ভাব দেখাল যেন কম্বলটার মধ্যে যে ঠুন্‌কো কিছু থাকতে পারে সেটা তার মনেই হয় নি। ছেলেটি বেশ আচ্ছা করে কম্বলখানা 'প্যাক' করে এনে আমার সামনে ধরে দিলে। আমি তাকে এমনি ভাবে ধন্যবাদ দিলাম যেন স্মার্ণাতে আমি হামেসাই দামী জিনিষপত্র পাঠিয়ে থাকি। দোকান থেকে

বুভুক্ষা

বেরিয়ে আসবার সময় ছেলেটি আমায় দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে দু-দুবার সালাম করলে।

বাজারে ঢুকে যে দিকে মেয়ে-দোকানীরা তাদের পণ্যদ্রব্য নিয়ে দিক আলো করে বসে রয়েচে সেই দিক দিয়েই আমি ঘোরাফেরা করতে লাগলাম। এক জায়গায় দেখলাম, একটি মেয়ে গাঢ় রক্তবর্ণ গোলাপ ফুল নিয়ে বসে আছে। তার কাছ থেকে জোর করে একটি গোলাপ ছিনিয়ে নেবার দুষ্প্রবৃত্তি হল। মেয়েটির নিকটতম সান্নিধ্য পাবার আশায় থাম্‌কা দাম জিজ্ঞাসা করলাম।

ট্যাঁকে আজ পয়সা থাকলে নিশ্চয়ই একটি ফুল কিনতাম। এখন মাঝে মাঝে কিছু কিছু সঞ্চয় না করলে আর চলচে না।

দশটা বেজে গেছে। খবরের কাগজের অফিসে গিয়ে হাজির হলাম। দেখি সহকারী সম্পাদক মহাশয় কাঁচি হাতে ভারী ব্যস্ত হয়ে এ-কাগজ সে-কাগজ থেকে লেখা কেটে কেটে ছাপতে দিচ্চেন। সম্পাদক মহাশয় তখনো এসে পৌঁচন নি। সহকারী চোখ না তুলেই কি প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করলেন। জবাবে লেখাটি তার সম্মুখে ধরে দিলাম। লেখাটা যে সত্যিই একটু অসাধারণ সেই ভাবটা আমার হাবভাবে প্রকাশ না করে পারলাম না। তাকে বললাম, 'সম্পাদক মহাশয়ের আসা মাত্রই যেন লেখাটা তাঁকে দেওয়া হয়।'

বুভুক্ষা

লেখাটা মনোনীত হল কিনা জানবার জন্যে বিকেলের দিকে আবার এসে খবর নিয়ে যাব এ কথাও বলে এলাম।

লোকটা মাথা না তুলেই বললে, 'বেশ, তাই হবে।' এই বলে ফের্ ঘাড় গুঁজে কাজে মন দিলে।

মনে হল, লোকটা যেন লেখাটা তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই গ্রহণ করলে; কিন্তু আমি আর কিছু না বলে অভ্যাস মত অভিবাদন করে চলে এলাম।

হাতে এখন অঢেল সময়। একবার যদি লেখাটা পছন্দ হয়! দিনটা ভারী বিশ্রী—হাওয়াও নেই, স্বস্তিও নেই, যেন কেমন এক মনমরা ভাব। পাছে জল হয় এই আশঙ্কায় মেয়েরা ছাতা হাতে নিয়ে চলেছেন, লোকগুলির মাথায় পশমের টুপি—দেখতে ভারি বীভৎস; মানুষের উৎসাহকে একদম দমিয়ে দেয়। বাজারটা আর একবার ঘুরে এলাম। শাকসব্জী ও গোলাপ ফুলের দোকানে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম। হঠাৎ পিছন থেকে পরিচিত স্বরে কে একজন 'অভিবাদন'! বলে কাঁধে হাত দিলে। পিছন ফিরে প্রত্যভিবাদন করে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে তার দিকে তাকালাম। লোকটা কে?

লোকটা সদ্য প্যাক-করা পুটুলিটা আমার হাতে দেখে একটু কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'এর মধ্যে কি আছে?'

'ও, জামার কাপড় নিয়ে এলাম।' আমার স্বরে একটা

তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটে উঠল। তাকে বিরক্তির সঙ্গেই বললাম, 'কাঁধে হাত দেওয়াটা আমি পছন্দ করি নে, জান?'

লোকটা একটু অবাক হয়ে হাঁ করে আমার দিকে চেয়ে রইল। একটু বাদে জিজ্ঞাসা করলে, 'ভাল কথা, আজকাল কেমন আছ?

'বেশ আছি।'

'তাহলে কাজ পেয়েচ বল?'

'কাজ?—হ্যাঁ, তোমাদের আশীর্ব্বাদে মার্চ্চেণ্ট অফিসের হিসাব বিভাগে একটি ভাল কাজই পেয়ে গেছি।

'তাই নাকি? বেশ বেশ, ভাল!' বলেই সে আরো খানিকটা এগিয়ে এল। তার পর বল্‌লে, 'খবরটায় সত্যিই অত্যন্ত খুশী হলাম। এখন দানখয়রাতে টাকাটা উড়িয়ে না দাও তবেই মঙ্গল। তাহলে আসি!'

এই বলেই সে চলছিল, কিন্তু মুহূর্ত্তবাদেই মুখ ফিরিয়ে সামনে এসে বল্‌লে, 'জামা তৈরী করতে চাও ত আমাদের দর্জ্জিকে বলে দিতে পারি, তার চাইতে ভাল দর্জ্জি তুমি পাবে না, এ কথা জোর করেই বলা যেতে পারে। বল ত তাকে তোমার কাছে পাঠিয়েও দিতে পারি।'

আমার আর সহ্য হচ্ছিল না। কে তার পরামর্শ চাইচে? আমি কোন্ দর্জ্জি দিয়ে জামা করাব তা নিয়ে তার মাথা ব্যথা কেন? সে টেকো-মাথা নবাব পুত্তুরের গায়ে-পড়া ব্যবহারে

বুভুক্ষা

আমার মেজাজ ক্রমেই চড়ে যাচ্ছিল, তাই অনেকদিন আগে সে যে আমার কাছ থেকে পাঁচটা টাকা ধার নিয়েছিল সেই কথাটাই একটু অকরুণ ভাবে তাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম। কিন্তু তার জবাব দিবার আগেই তাগাদা করার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করে বললাম, 'কিছু মনে করো না ভাই!' আমার তখন ভারী লজ্জা করতে লাগল, আমি আর তার চোখে চোখে চাইতে পারছিলাম না; ঠিক এমনি সময় একটি মহিলা এসে পড়াতেই তাকে যাবার পথ করে দিবার জন্যে তৎক্ষণাৎ সরে দাঁড়ালাম এবং এই সুযোগে পথ চলতে শুরু করে দিলাম।

দেরী আমায় করতেই হবে, অথচ এই দীর্ঘ সময়টা যে কি করে কাটাব—ভেবে পাচ্ছিলাম না। কোন একটা চায়ের দোকানে গিয়ে যে সময়টা কাটিয়ে দেব তারও জো নেই—ট্যাঁকে একটি পয়সাও নেই, তা ছাড়া এমন কোন আলাপী লোকও নেই যার সঙ্গে দেখা করে সময়টা কাটিয়ে দিতে পারি। যাদের বাড়ী যেতে পারতুম তারা সকলেই এখন কাজে চলে গেছে। তাই আপনার মনে সিধে রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করে দিলাম। এক খবরের কাগজের অফিসের সামনে গিয়ে সেদিনকার টাঙানো কাগজটায় চোখ বুলিয়ে নিলাম। তারপর ঘুরতে ঘুরতে গীর্জার পাশের বাগানটায় ঢুকে একখানা আসনে বসে পড়লাম, সেখানে তখন লোকজন বড় কেউ ছিল না।

বুভুক্ষা

সেই ঘুমন্ত নিস্তব্ধতার মাঝে, সেই বিশ্রী স্যাঁতসেঁতে আব-হাওয়ায় বসে বসে অনেক সময় কাটিয়ে দিলাম। হেঁটে হেঁটে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম, দারুণ অবসাদে শরীর ভেঙে পড়ছিল, চোখ দুটো ঘুমে জড়িয়ে আসছিল। এদিকে শীতে সর্ব্বাঙ্গ থর্ থর্ করে কাঁপছিলও।

মনে হল, গল্পটা কি সত্যই খুব ভাল হয়েচে? কে জানে! লেখাটার জায়গায় জায়গায় যে কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি নেই এমন কথা জোর করে বলতে পারি নে। গল্পটা যে ওরা নেবেই এমন কথাও বলা চলে না। হয় ত একান্ত থেলো গল্পই হয়ে থাকবে, হয় ত বা কিছুই হয় নি। ইতিমধ্যেই যে লেখাটা বাজে-কাগজের ঝুড়িতে আশ্রয় পায় নি তারই বা নিশ্চয়তা কি? .. এতক্ষণ ভরসায় ছিলাম কিন্তু এখন যেন মনটা সন্দেহাকুল হয়ে পড়ল। লাফ দিয়ে ওঠে ঝড়ের বেগে বাগান থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

একটা দোকানে উঁকি মেরে দেখলাম, সবে দুপুর পার হয়েচে। বিকেল চারটার আগে সম্পাদকের সাথে দেখা করে কোন লাভ নেই। গল্পটার কি গতি হল জানবার জন্যে মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। লেখাটা সম্বন্ধে যতই ভাবতে লাগলাম ততই মনে হল যে, অর্দ্ধজাগ্রত অবস্থায় অস্থির মস্তিষ্ক নিয়ে সাত-তাড়াতাড়ি যে লেখা লিখেচি তা মনোনীত না হওয়াই সম্ভব। হয় ত মিথ্যা মিথ্যা সারাটা সকাল আমি নিজেকে প্রতারিত করে খুশী

ছিলাম! ··· তাই কি! ··· আর কিছু মনে না করে ত্রস্তপদে রাস্তার পর রাস্তা পেরিয়ে খোলা ময়দানে এসে পড়লাম। এ-ধারে ও-ধারে পড়ো জমি, দু'একটায় চাষবাসও হয় ত কিছু কিছু হয়েচে। শহর ছাড়িয়ে গাঁয়ের পথে যখন এসে পড়লাম তখন যতদূর দৃষ্টি যায় কেবলি দিগন্ত বিস্তৃত ফাঁকা মাঠ।

ঠিক করলাম, এখানেই থেমে ফিরে যাব। এতটা পথ হেঁটে আমার গা দিয়ে গরম ছুটতে লাগল। মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে ফিরে চললাম। রাস্তায় দুটো খড় বোঝাই গাড়ীর সঙ্গে দেখা হল। গাড়োয়ান দুটো খড়ের গাদার উপর লম্বা হয়ে শুয়ে গান ধরে দিয়েচে। দু'জনারই নাঙ্গা মাথা, গোলগাল মুখ, তারা যে কষ্টের মধ্যে দিয়েই বেঁচে আছে, তা তাদের চেহারাতেই মালুম হচ্ছিল। তাদের কাছাকাছি যেতেই আমার মনে হল যে, তারা নিশ্চয় আমাকে সম্ভাষণ করবে, ঠাট্টা বিদ্রূপও করতে পারে। প্রথম গাড়ীখানা সামনে এসে পড়তেই গাড়োয়ান আমার হাতে যে পুটুলিটা রয়েচে তাতে কি আছে জানতে চাইল।

'একটা কম্বল!'

'ক'টা বেজেচে কর্ত্তা?'—সে জিজ্ঞাসা করল।

'ঠিক বলতে পারলাম না, তবে গোটা তিনেক হবে হয় ত।'

জবাব শুনে তারা দুজনেই হেসে উঠল এবং গাড়ী হাঁকিয়ে চলল। সেই মুহূর্ত্তে আমি যেন একটা তীব্র কশাঘাত অনুভব

করলাম। টুপিটা একবার নড়েই মাথা থেকে পড়ে গেল। নগণ্য গাড়োয়ানও আমার সঙ্গে একটু তামাসা না করে ছাড়লে না! কি করব, ঠিক করতে না পেরে একটা হাত মাথায় বুলিয়ে রাস্তার একপাশ থেকে ধূলায় ধূসরিত টুপিটা তুলে নিয়ে পথ চলতে লাগলাম। খানিকটা এসে একটা লোককে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, চারটা বেজে গেছে। চারটা বেজে গেছে! এরই মধ্যে চারটা বেজে গেল! আমি একরকম দৌড়েই শহরের দিকে ছুটতে লাগলাম এবং খবরের কাগজের অফিসের পথ ধরলাম। সম্পাদক মহাশয় সম্ভবত অনেকক্ষণ অফিসে এসেছেন; আর হয় ত ইতিমধ্যে কাজ শেষ করে চলেও গেছেন। আমি দৌড়ুতে লাগলাম, রাস্তার পথচল্‌তি লোক ও গাড়ীর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে হোঁচট খেয়ে সকলকে পিছনে ফেলে পাগলের মত হাঁপাতে হাঁপাতে অফিসে গিয়ে পৌঁছুলাম। দরজা ভেজান ছিল, কোন রকমে খুলে ভিতরে ঢুকে চার লাফে সিঁড়িগুলো ভেঙে উপরে গিয়ে হাজির হলাম। এবং দরজায় আঘাত করলাম।

কোন সাড়া শব্দ এল না।

সম্পাদক তাহলে চলে গেছেন, চলে গেছেন! সত্যি? আর একবার দরজায় ঘা দিয়েই ভিতরে ঢুকে গেলাম। সম্পাদক-প্রবর তাঁর আসনেই বসে আছেন, সামনে প্রকাণ্ড টেবিল, হাতে কলম, জানলার দিকে চেয়ে আছেন। কি যেন লিখবেন,

তারই সম্বন্ধে ভাবছেন। আমি হাঁপাতে হাঁপাতে তাঁকে সম্ভাষণ করলাম, তিনি আমার দিকে ফিরে আড়চোখে একবার তাকালেন এবং মাথা নেড়ে বললেন, 'আপনার লেখাটা পড়ে উঠতে পারি নি।'

সম্পাদকের জবাবে আমি বরং খুশীই হলাম, কেননা লেখাটা তাহলে অমনোনীত হয় নি! বললাম, 'বেশ! আমার তাড়া হুড়ো কিছু নেই। দিন কয়েকের মধ্যেই —'

'হাঁ, তা হবে। তাছাড়া আপনার ঠিকানাও ত লেখার সঙ্গে রয়েচে। আসতে হবে না, আমিই খবর পাঠাব।'

তাকে বলতে ভুলে গেলাম যে, আমার আর কোন ঠিকানা নেই এখন। এখন আর ত তাঁকে কিছু বলবার জো নেই। অভিবাদন করে চলে এলাম। আবার আশা হল। এখনো ত আশা আছে — হয় ত লেখাটা ওঁর মনোমতই হবে। অজ্ঞাতসারে কখন্ যে আমার মাথায় এল,—সুরলোকে আমার লেখা নিয়ে এক পরামর্শ-বৈঠক বসেচে এবং শেষ পর্য্যন্ত লেখাটা মনোনীতও হয়েচে। লেখাটার জন্য দশটা টাকা নিশ্চয়ই পাব।

রাত্রে কোথায় থাকি! এত রাত্রে থাকবার একটা আস্তানা কোথায় পাই, সেই চিন্তা আমায় এতটা পেয়ে বসলে যে, মাঝ-রাস্তায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। স্থান কাল সব ভুলে গেলাম। যেন সাগরের বুকে একটা অনড় পাহাড় ঠায় দাঁড়িয়ে

আছে, আর লক্ষ লক্ষ তরঙ্গ সেই পাহাড়ের গায়ে নিষ্ফল আঘাত করে গর্জ্জন করচে।

এক খবরের কাগজের ফেরিওলা ছোকরা আমায় একখানা কাগজ দিতে চাইল।

বললে, 'দেখুন না মশাই, চমৎকার লেখা সব। আপনার পয়সা বাজে খরচ হবে না।'

ছেলেটার দিকে একবার চেয়ে চলতে লাগলাম; ঘুরে ফিরে আবার সেই দোকানটার সম্মুখে এসে পড়লাম, এই দোকানটা থেকেই কম্বলখানা মুড়িয়ে নিয়েছিলাম।

তাড়াতাড়ি ডান দিকে পাশ কেটে চললাম—হাতে তখনো আমার সেই পুলিন্দাটা মনে মনে লজ্জা ও ভয়—পাছে জানলা দিয়ে দোকান থেকে কেউ আমায় দেখে ফেলে! সামনেই আর একটা দোকান, তারপরই থিয়েটার—সব ছাড়িয়ে সমুদ্রের দিকের পথ ধরে চললাম। সামনেই প্রকাণ্ড দুর্গটা। পথের পাশে একখানা বেঞ্চি রয়েচে; আর একবার জিরিয়ে অবস্থাটা ভেবে নিতে বসলাম।

আজকের রাতটা কোথায় আশ্রয় নিই।

এই রাতে মাথা গুঁজবার মত কি এতটুকু জায়গা পাব না? পুরোনো বাসায় গেলে সম্মানহানির আশঙ্কা আছে—সেখানে আর যাব না বলেই লিখে রেখে এসেচি। কাজেই স্পর্দ্ধার সঙ্গে সে সংকল্প পরিত্যাগ করলাম। সঙ্গে সঙ্গেই আমার সেই পরিত্যক্ত

বুভুক্ষা

ছোট্ট দোলা-চ্যায়ারখানার কথা মনে হতেই গর্ব্বের সঙ্গে হেসে উঠলাম। হঠাৎ কেমন করে জানি নে, এককালে যে দু'খানা ঘর ভাড়া নিয়ে বাস করেছিলাম তারই স্মৃতি মনের মধ্যে জেঁকে বসল। কল্পনায় দেখতে লাগলাম, সেই বাড়ীতে টেবিলের সামনে আমি বসে আছি আর আমার সামনে প্রচুর রুটি-মাখন রয়েছে। একটু পরেই আবার সে দৃশ্য বদ্‌লে গেল; দেখতে না দেখতে কোথা থেকে এল মাংস, এল কাঁটা চামচ। দোর খুলে গেল, বাড়ীউলি ঘরে ঢুকল এবং আমায় আরো চা খেতে অনুরোধ করল। ...

স্বপ্ন, অর্থহীন স্বপ্ন মাত্র! আপনার মনে বললাম, 'এখন যদি খাবার খাই তাহলে মাথা ঘুরবে, মস্তিষ্কে জ্বর অনুভব করব এবং আবার কত কি বাজে উদ্ভট কল্পনার রঙীন নেশায় মশ্‌গুল হয়ে পড়ব। কোন জিনিষই যে আর ভাল হজম করতে পারি নে, মুশ্‌কিল ত ওইখানেই।

হয় ত রাত্তিরের সঙ্গে সঙ্গে আশ্রয়ও কোথাও একটা জুটে যেতে পারে। এত তাড়া কিসের, আর যদি কোথাও মাথা গুঁজবার এতটুকু জায়গা নাও মিলে ত একটা গাছের তলায় বসে বসে ত রাতটা কাটিয়ে দিতে পারব। তা ছাড়া শহরতলিতে কোথাও একটা জায়গা খুঁজে নেওয়া অসম্ভব হবে না। আর শীতও ত তেমন অসহ্য কন্‌কনে নয়।

বুভুক্ষা

শহরের এক প্রান্ত থেকে সাগরের তরঙ্গোচ্ছ্বাসের শোঁ শোঁ শব্দ কানে আসছিল, এখানে সেখানে জাহাজগুলি যেন ইতস্তত ছড়ান রয়েচে, চিমনি থেকে গোলাকার ধোঁয়ার কুণ্ডলী শূন্যে উঠে চারদিকে ছড়িয়ে পড়চে—চারদিকে কেমন একটা নিরানন্দ নিস্তেজ ভাব। মাঝে মাঝে জাহাজের ইঞ্জিন থেকে একটা একঘেয়ে শব্দ এসে মনটাকে আরো দাবিয়ে দিচ্ছিল। সূর্য্যও ওঠে নি, বাতাসও এক ফোঁটা নেই, আমার পিছনে যে সারিসারি গাছগুলি দাঁড়িয়ে রয়েচে তা যেন একেবারেই ভিজে; এমন কি, যে বেঞ্চিটায় বসে ছিলাম তাও।

অনেকক্ষণ কেটে গেল। আমি শ্রান্ত হয়ে বসে বসে ঝিমুতে লাগলাম। এর মধ্যে এক পশলা বৃষ্টিও হয়ে গেল। একটু পরেই ঘুমে আমার চোখ দুটো বুজে এল এবং চোখ বুজেই রইলাম। ...

জেগে দেখি চারিদিক আঁধার হয়ে গেছে। কি করব স্থির করতে না পেরে কাঁপতে কাঁপতে পুটলি তুলে নিয়ে হেঁটে চললাম। শরীরটা গরম করবার উদ্দেশ্যে জোরে জোরে হাঁটতে হাঁটতে হাততালি ও পা ঘষ্‌তে ঘষ্‌তে চললাম। শীতে সর্ব্বদেহ এতটা অসাড় হয়ে গেছল যে, কম্বলের ভারও যেন আর সইতে পারছিলাম না। অনেক কষ্টে দমকলের আস্তানায় গিয়ে পৌছুলাম। রাত্তির তখন নয়টা বেজে গেছে। তাহলে ঘণ্টা কয়েকই ঘুমিয়েচি!

নিজেকে নিয়ে এখন কি করি? কোথাও যেতেই হয়।

সেখানে সেই দমকলের অফিসের দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম, যদি কোন রকমে এত বড় প্রকাণ্ড বাড়ীটার এককোণে একটু জায়গা করে নিতে পারি। বাড়ীতে ঢুকেই দরোয়ানের সঙ্গে আলাপ করব ঠিক করলাম। সে আমায় দেখতে পেয়েই সঙীন উঁচিয়ে আমি কি চাই জানবার জন্যে চোখ পাকিয়ে তাকাল। তার সেই বন্দুকটা দেখে আমার ভীতু মন আঁতকে উঠল। কিছু না বলেই পিছন হটে হটে তার দৃষ্টির আড়ালে চলে এলাম এবং কপালে হাত রেখে এমন ভাবখানা করলাম, যেন ভুল করেই আমি সে বাড়ীতে ঢুকে পড়েচি। যা হোক্, ফুটপাথে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম, যেন একটা সাংঘাতিক বিপদ থেকে মুক্তি পেয়েচি।

দারুণ শীতে ও ক্ষুধায় ক্রমেই আমি অবসন্ন হয়ে পড়ছিলাম। এক রকম ঊর্দ্ধশ্বাসেই আমি ছুটে এসে পার্লামেণ্ট গৃহের সম্মুখে পৌঁছুলাম। নিজেকে গালাগালি দিতে দিতে চললাম, কেউ শুনলে কিনা সেদিকে আমার মোটেই লক্ষ্য ছিল না। হঠাৎ আমার এক তরুণ শিল্পী-বন্ধুর কথা মনে হল, এক সময় তার যথেষ্ট উপকার করেছিলাম। মনে হতেই তাঁর বাড়ীর দিকে দ্রুত চললাম এবং গিয়ে দেখি বাড়ীর দরজায় তাঁর নাম আঁটা রয়েচে। দ্বারে আঘাত করতেই বন্ধুবর বার হয়ে এলেন। তাঁর সর্ব্বাঙ্গে মদ ও চুরুটের গন্ধ ভুর্ ভুর্ করছে!

বুভুক্ষা

'এই যে ভাল ত, নমস্কার!'—আমি হাত তুলে তাঁকে অভিবাদন করলাম।

'আরে তুমি! তুমি এই অসময়ে কোথেকে? ... সেটা ঢের বদল হয়ে গেছে ভাই, দিনের বেলা না দেখলে কিছুই বুঝতে পারবে না। এখন দেখে ত কোন লাভ নেই।'

'তা হোক, এখনই একবার দেখাতে হবে।'—আমি জবাব দিলাম। কোন্ ছবির কথা বলচে তা কিন্তু আমার মনেই ছিল না।

সে উত্তর করল, 'অসম্ভব! এখন ছবিটা কিছুই বোঝা যাবে না, খালি হল্‌দে রঙের ছড়াছড়ি দেখতে পাবে; তাছাড়া আর একটা কথাও আছে—' এই বলে সে আমার আরো কাছে সরে এসে চুপি চুপি বললে, 'এক তরুণী আজ আমার আতিথ্য গ্রহণ করেছেন, সুতরাং একেবারে অসম্ভব! ...'

'ও, তাহলে অবশ্য কোন কথাই নেই!'

এই বলেই আমি বন্ধুবরকে শুভরাত্রি জ্ঞাপন করে চলে এলাম।

এখানেও যখন কিছু সুবিধা হল না তখন বনেই অগত্যা আজকের মত রাত কাটাবার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু সেখানকার মাটিও যে স্যাঁতসেঁতে। কিন্তু আর কোন উপায় নেই যে! হাতের কম্বলটাকে একটু চেপে মনে হল, তবে

বুভুক্ষা

সত্যিই ঘুমোতে পাব ? একটু আশ্রয় পাবার জন্যে শহরে কত চেষ্টাই না করলাম, ফলে ক্লান্তি ও অবসাদ ছাড়া কিছুই কিন্তু মিলল না। একটু বিশ্রাম করতে পাব, হাত-পা ছড়িয়ে টান হতে পাব এই সম্ভাবনাটা আমার মনে একটা নিবিড় আনন্দ এনে দিল। ঢিকুতে ঢিকুতে চললাম, মনে তখন কোন চিন্তাই রইল না। রাস্তার এক পাশে দেখলাম একটা খাবারের দোকানে সারি সারি কত কি খাবার সব সাজিয়ে রেখেচে, দরজার একপাশে একটা বেরাল ঘুমিয়ে আছে। খাবারের বড় বড় পাত্রগুলির দিকে সতৃষ্ণনয়নে তাকালাম, কিন্তু পকেটে একটিও পয়সা নেই। তাই তাড়াতাড়ি চলে এলাম। খানিকটা এগিয়ে এসেই ধীরে ধীরে চলতে লাগলাম, কতক্ষণ যে চলেচি তা ঠিক বলতে পারি নে, তবে ঘণ্টা কয়েক যে হবে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। সে যাই হোক, শেষ পর্য্যন্ত আমি বনে এসেই উপস্থিত হলাম।

একটু এগিয়েই একটা প্রকাণ্ড গাছের তলায় বসে পড়লাম। জায়গাটা বেশ পছন্দসই হল। কাছ থেকে কতগুলি খড়পাতা কুড়িয়ে নিয়ে যেখানটা একটু খট্‌খটে মনে হলো সেখানটায় দিব্য এক শয্যা রচনা করে ফেললাম। কম্বলের খানিকটা বিছিয়ে বাকীটা গায়ে জড়িয়ে শুয়ে পড়লাম, অতিরিক্ত দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রমে আমি অত্যন্ত শ্রান্ত ছিলাম। কিন্তু শুয়েও

সহজে ঘুম আসছিল না। কান দিয়ে গরম ছুটছিল, তা ছাড়া শয্যাসামগ্রীও গায়ে বিঁধছিল। জুতা জোড়া খুলে মাথার দিকে রেখে দিলাম এবং কম্বল বাঁধা কাগজখানা দিয়ে তা ঢেকে রাখলাম।

চারদিকে তখন দারুণ অন্ধকার ঘনিয়ে এসেচে ... নীরব নিস্তব্ধ। কিন্তু দূরে থেকে বাতাসের একঘেয়ে শোঁ শোঁ শব্দ অশ্রান্ত ভেসে আসতে লাগল। অনেকক্ষণ কানপেতে এই অস্পষ্ট শোঁ শোঁ ধ্বনি শুনলাম, এ যেন স্বর্গ থেকে ভেসে আসা সঙ্গীতধারা, এ যেন নক্ষত্র-সভার সঙ্গীত। ...

নিজের মনে মনে বলে উঠলাম, 'যদি তাই হয় তাতেই বা আমার কি!'—এই বলে মনটাকে চাঙ্গা করে তুলবার জন্যে হেসে উঠলাম। এ নিশ্চয়ই পেচকের কলকণ্ঠ!

উঠে জুতা পায়ে দিয়ে বনের মধ্যে খানিকক্ষণ বেড়িয়ে বেড়ালাম। আপনার মনের সঙ্গে দস্তুর মত লড়াই করে প্রায় শেষ রাত্তিরে ঘুমিয়ে পড়লাম।

* * *

চোখ মেলেই দেখি বেশ বেলা হয়ে গেছে, ভাল করে তাকিয়ে বুঝলাম যে দুপুর হতে চলেচে।

জুতা জোড়াটা পরে কম্বলটা বেশ ভাঁজ করে বেঁধে নিয়ে

শহরের দিকে রওনা হলাম। সূর্য্যদেবের দর্শন আজ মিলবার জো নেই। শীতে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিলাম, পা-দু'টো যেন অবশ হয়ে গেছে, দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল— যেন তারা দিনের আলো সইতে পারচে না।

বেলা তিনটা বেজেচে। ক্ষুধাতৃষ্ণা বড় বেশী উৎপীড়ন আরম্ভ করে দিয়েচে। মাথাটা ঘুরচে, মনে হল, মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ব এবং মাঝে মাঝে অজ্ঞাতসারে হেঁচকিও আসছিল। একটা সস্তা খাবারের দোকানের সুমুখে ঘোরা ফেরা করতে লাগলাম। খাবারের মূল্য-তালিকাটা একবার পড়ে নিলাম। সঙ্গে সঙ্গে দোকানীর মনোযোগ আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে এমনি ভাবে মাথাটা নাড়লাম যে, এ সব সামান্য জিনিষ আমার ন্যায় লোকের খাদ্যই নয়। সেখান থেকে রেলষ্টেশনে এসে পৌঁছুলাম।

এমন একটা ভাব আমাকে এসে অধিকার করে বসল যে, মাথাটা যেন একদম গুলিয়ে গেল। একবার হোঁচট খেলাম, মাথাটাকে চাঙ্গা করবার চেষ্টাও করলাম কিন্তু অবস্থা আমার ক্রমেই আরো খারাপ হতে লাগল। শেষটায় একটা র'কের উপর বসে পড়তে বাধ্য হলাম। আমার ভিতরটায় যেন কি একটা ওলটপালট হয়ে যাচ্চে, হয় ত মাথাটা চৌচিড় হয়েই ফেটে পড়বে।

জ্ঞান তখনো অবশ্য হারাই নি, কানে সবকিছুই আসছিল,

এমন কি চেনা লোককেও যেতে দেখে চিনতে পারছিলাম এবং তাদের প্রতি-নমস্কার দিতেও ভুল হচ্ছিল না।

কেন এমন হল? বনের মধ্যে শুয়েই কি হল, না সারাদিনে কিছু খেতে পাই নি, তাই? সোজাসুজি দেখলে ত এ রকম জীবনের কোন অর্থ খুঁজেই পাওয়া যায় না। আমি যে এরূপ বিশেষ নির্য্যাতন সইবার উপযুক্ত তাও ত আমার মনে হল না। মনে মনে বলে উঠলাম, 'না, আর ভালমানুষীতে চলবে না।' খুড়োর কাছে কম্বল নিয়ে গিয়ে হাজির হওয়াই উচিত বলে মনে হল। এটা বাঁধা রেখে একটা টাকা পাওয়া যাবেই, তাহলে তিনবেলা ভরপেট খাওয়া আর কে ঠেকায়! আর সেই ফাঁকে একটা কিছু করবার মত ভেবে নিতে পারবই। ব্যাটাকে ঠকাতেই হবে। এই মনে করে পোদ্দারের দোকানের দিকেই চলেছিলাম কিন্তু দোকানের বাইরে এসেই থেমে গেলাম, মাথা নেড়ে সেখান থেকে সরে পড়লাম। যতই দূরে সরছিলাম, মনটা যেন ততই চাঙ্গা হয়ে উঠতে লাগল। এই প্রচণ্ড প্রলোভনকে জয় করার আনন্দে আমি বিভোর হয়ে পড়লাম। আমি যে এত দুঃখেও মাথা সোজা রেখে সম্মানকে ক্ষুণ্ণ না করেও টিঁকে আছি, এ কথাটা মনে আসতেই আমার মনে হল, হ্যাঁ, এই ত চাই, একেই বলে চরিত্র। এ যেন ঠিক সমুদ্রে ডুবে-যাওয়া-একটা জাহাজের মাস্তুল—এখনো সূর্য্যের আলোয় ঝকমক করচে। সবই তলিয়ে

গেছে, কেবল মাস্তুলটা এখনো মাথা খাড়া করে রুখে আছে।

নিজের তুচ্ছ দু'মুঠো খাবারের জন্যে অন্যের একটা জিনিষ বাঁধা দেওয়া—এর চাইতে মানব-আত্মার শোচনীয় অধোগতি, অবমাননা আর• কিছুই হতে পারে না। দুর্নামের কথা ছেড়ে দিলেও এমনি করেই মানুষের চরিত্র দেউলে হয়ে পড়ে। না, না, কখনো তা হবে না, হতে পারে না! সত্যি সত্যিই ত আমি কখনো এ কাজ করতে পারি নে। এ কাজের জন্যে ত আমি কখনো কারুর কাছে জবাবদিহি দিতেই পারি নে। এই সব নানা বিশ্রী চিন্তায় আমার মাথাটা গুলিয়ে উঠছিল, মনে হচ্ছিল এই চিন্তাটাই যেন আমাকে খুন করে ফেলবে। যে জিনিষ আমার নয় তা এমনি করে এ অবস্থায় বয়ে নিয়ে বেড়াতেও যেন আর ইচ্ছে হচ্ছিল না।

ভাগ্য যদি কৃপা করবে বলে, তখন এক দিক দিয়ে না এক দিক দিয়ে সাহায্য মিলে যাবেই। আচ্ছা ও-পাড়ার দোকানীর না একটা লোক দরকার, সেখানে দরখাস্ত পাঠিয়েছিলাম। খোঁজও ত আর নিই নি। চেষ্টা করতে দোষ কি? কাজটা লেগেও ত যেতে পারে।

হয় ত এবারে অদৃষ্ট প্রসন্ন হয়েচে, কে বলবে? আমি দোকানের দিকেই চলতে লাগলাম।

বুভুক্ষা

সম্প্রতি যে দারুণ উত্তেজনা আমায় অধিকার করে অভিভূত করে ফেলেছিল তার ফলে মাথাটা যেন একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। তাই জোরে চলতে পারছিলাম না। দোকানীর কাছে গিয়ে কি ভাবে প্রস্তাবটা পাড়ব তাই মনের মধ্যে ভেবে নিচ্ছিলাম।

লোকটা ভদ্রই হবে হয় ত। শুনেচি খেয়ালের ঝোঁকে নাকি না চাইলেও টাকাটা-সিকেটা আগামও দিয়ে বসে। এ ধরণের লোকের মাথায় সময় সময় চমৎকার খেয়াল এসে যায়।

একটা দোর দিয়ে চুপি চুপি ঢুকে থুথু দিয়ে পা-জামাটার খানিকটা বিবর্ণ করে ফেললাম এবং তাতে করে চেহারাটা ঠিক উমেদারের উপযোগী হয়ে দাঁড়াল। কম্বলের পুটলীটা একটা ভাঙ্গা কাঠের বাক্সের আড়ালে লুকিয়ে রেখে ছোট্ট দোকানখানায় ঢুকে পড়লাম।

একটা লোক পুরোনো খবরের কাগজ দিয়ে ঠোঙা তৈরী করছিল। তাকেই বললাম, 'মিঃ ক্রাইস্টির সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

লোকটা ঔৎসুক্যের সঙ্গে জবাব দিল, 'বলুন কি চাই, আমিই ক্রাইস্টি!'

'তাই নাকি! তা বেশ, ভালই হল। দেখুন, আমার নাম অমুক। আপনার কাছে একখানা দরখাস্ত পাঠিয়েছিলাম

কিন্তু সে দরখাস্তের কি হল না হলো আজো তা জানতে পারলাম না।'

আমি যে নামটা বলেছিলাম লোকটা বারকতক সেই নামটা আওড়াল, তারপরই হাসতে শুরু করে দিল। এবং বুক-পকেট থেকে আমার দরখাস্তখানা বার করে বললে, 'এই দেখুন না মশাই, আপনার চিঠির তারিখ। তারিখ লিখতে গিয়ে লিখে বসেছেন ১৮৪৮ সাল!' এই বলে লোকটা অট্টহাস্য করে উঠল।

আমি বিশেষ লজ্জিত হয়ে জবাব দিলাম, 'তাই ত দেখছি, বেজায় ভুল হয়ে গেছে।' মনে মনে নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্যে নিজেরই উপর ভারী অপ্রসন্ন হয়ে পড়লাম।

দোকানী বললে, 'আমার একজন লোক চাই বটে, কিন্তু এমন লোক চাই যে-লোকের হিসাবে কখনো ভুলত্রুটি হবে না। আপনার হাতের লেখা বেশ সুন্দর ও পরিষ্কার। দরখাস্তটা পড়েও আমার বেশ ভালই লেগেছিল কিন্তু দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে—'

আমি একটু অপেক্ষা করলাম। কেননা আমার মনে হল যে, এই তার চরম সিদ্ধান্ত নাও হতে পারে। সে কিন্তু আবার আপনার কাজে মন দিলে।

তখন নিজে থেকেই আমতা আমতা করে বললাম, 'তার জন্যে আমি বিশেষ লজ্জিত। তবে এ কথা আপনাকে বলতে পারি যে, এ রকম ভুল আর কখনো আমার হবে না। আর তাও বলি,

এ সামান্য ভুলের জন্য আমাকে মুহুরীর কাজের অযোগ্য বলে সাব্যস্ত করাও ঠিক নয়।'

দোকানী জবাব দিল, 'না, আমি ত তা বলি নি। তবে এ দেখেই আমি ঠিক করে ফেলেচি যে, আর একজন কাউকে রাখাই ঠিক হবে।'

'তা হলে লোক নেওয়া হয়ে গেছে ?'

'হাঁ।'

'তবে—তবে এ সম্বন্ধে আর কিছু বিবেচনা করবার নেই ?'

'কি করব বলুন !'

তাকে অভিবাদন জানিয়ে তখনই বার হয়ে এলাম। রাগে দুঃখে আমার সর্ব্ব শরীর রি-রি করতে লাগল। আমি সেইখান থেকে পুটুলীটা তুলে নিয়ে হন্ হন্ করে রাস্তা দিয়ে ছুটলাম। কত লোককে মাড়িয়ে ধাক্কা দিয়ে চললাম। অথচ, কোন দিকে ভ্রুক্ষেপও নেই, ত্রুটির জন্য মৌখিক দুঃখ প্রকাশটা পর্য্যন্ত আমার আসছিল না।

হঠাৎ এক জায়গায় একটা লোক আমার এই অশিষ্টতার জন্যে আমায় একটু সহবৎ শিক্ষা দিয়ে দিলে। আমি অস্পষ্ট অর্থহীন কি সব কথা বিড় বিড় করে আউড়ে আর একটা রাস্তা ধরে চলতে লাগলাম। রাগের মাথায় এক জায়গায় হোঁচট খেয়ে পড়লাম। লোকটার নাক লক্ষ্য করে যে

মুষ্টিটা উদ্যত হয়ে উঠেছিল তা তখনো মুঠি করাই ছিল। রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ থর্ থর্ করে কাঁপছিল।

লোকটা পাহারাওলা ডাকল। আমি দেখলাম মুহূর্ত্ত মধ্যে একটা অঘটন ঘটে যাবে। তাই লোকটার পিছনে পড়বার মতলবে খুব ধীরে ধীরে চলতে লাগলাম। কিন্তু সে আর এল না। ... একটা লোকের একান্ত কামনা ও প্রচেষ্টা যে এমনি ধারা ব্যর্থ হবে এর কারণ কি, কে বলতে পারে? আচ্ছা, আমি কেন '১৮৪৮ সালটা' লিখতে গেলাম? আমায় কি ভূতে পেয়েছিল? একান্ত করে এ সালটাই আমার মনে আসার কি কারণ থাকতে পারে? আমি না-খেয়ে মরচি, নাড়ীভুড়ী সব কুঁকড়ে কাঠ হয়ে আছে, এ অবস্থায় অদৃষ্টের কী পরিহাস! এ কি তাঁরই বিধান?

দেহে মনে ক্রমেই কাবু হয়ে পড়চি! দিন দিনই আমি অধঃপতনের দিকে এগিয়ে যাচ্চি। এখন আর মিথ্যে বলতে আমার এতটুকুও বাজে না, অন্যের সম্পত্তি—কম্বলখানা—তাও বাঁধা দিয়ে খেতে চাই। এর চাইতে মানুষ আর কতদূর হীন হতে পারে? বিবেক বলতে যেন আর কিচ্ছুই নেই।

দুষ্টগ্রহ যেন আমায় পেয়ে বসেচে। অথচ ঐ শূন্যে সর্ব্ব-শক্তিমান পরমেশ্বর বসে বসে আমার কার্য্যকলাপ নিরীক্ষণ করছেন। আমায় ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবার কোন ব্যতিক্রমই যেন তিনি হতে দেবেন না, ঠিক করেছেন।

বুভুক্ষা

হয় ত নরকের কর্ত্তা আমার উপর ভারী চটে আছেন, কেন না আমার যে যেতে নেহাৎই বিলম্ব হচ্চে, একটা কিছু সাংঘাতিক মহাঅপরাধ না করলেও ত ন্যায়বিচারক আমায় নরকে নিক্ষেপ করতে পারছেন না। ...

পা চালিয়ে চললাম, বাঁ দিকের রাস্তাটা ধরে হন্ হন্ করে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে একটা আলোকিত বাড়ীর সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। রাগে উত্তেজনায় কখন যে আমি একটা রঙচঙে চিত্রবিচিত্র বাড়ীর গলি-পথে গিয়ে দাঁড়িয়েছি তা টেরও পাই নি। এক মুহূর্ত্তও ভাবতে হল না, দ্বারের অদ্ভুত চিত্র-বৈচিত্র্য আমায় তৎক্ষণাৎ আকৃষ্ট করে ফেললে। সামনেই সিঁড়ি। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে মানস-নয়নে কারুকার্য্যের সমস্ত খুঁটিনাটি সবই আমার নজরে এল। দোতালায় উঠে খুব জোরে জোরে কড়া নাড়া দিলাম। দোতালায়ই কেন যে উঠে ঐ দোরটার কড়াই নাড়লাম তার কারণ কিন্তু আজো আমার অজানা রয়ে গেছে।

ধোঁয়া রঙের পোষাক পরা এক তরুণী দ্বার খুলে বাইরে এল। মুহূর্ত্ত কয়েক সে অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে রইল, তার পর মাথা নেড়ে বল্লে, 'না, এখানে ত আজ কিছু হবে না।' বলেই সে দোর বন্ধ করতে উদ্যত হল।

এ বেচারীর উপর উপদ্রব করবার কি কারণ থাকতে পারে!

কোন কথাই আমায় জিজ্ঞাসা করলে না, অথচ ঠিক ভিখারী বলেই ধরে নিলে!

ইতিমধ্যে মেজাজ অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছিল, কাজেই সুবুদ্ধি ফিরে এল। টুপীটা তুলে শ্রদ্ধাভরে একবার মাথা নীচু করে তাকে অভিবাদন জানালাম। এবং তার কথা বুঝতে পারি নি এই ভাবটা দেখিয়ে একান্ত বিনয়ের সঙ্গে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনাকে একটু বিরক্ত করচি, আমায় ক্ষমা করবেন। এই বাড়ীতেই না এক পঙ্গু ভদ্রলোক তার ঠেলা-গাড়ী টানবার জন্যে একজন লোকের জন্যে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন?'

তরুণী খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মনে মনে এ বানানো কথায় কি মনে করলে কে জানে? শেষটায় সে বললে, 'না, এখানে ত সে রকম কেউ থাকেন না।'

'তাই নাকি! এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক—দিনে দু'ঘণ্টা কাজ করবার জন্যে তাঁর একজন লোক চাই—বারো আনা রোজ মাইনে দিতে চেয়েছেন।'

'না।'

'তাহলে আমায় মাফ করবেন, আপনাকে বিরক্ত করলাম। তিনি হয় ত একতালায় থাকেন। তাই হবে। আমার চেনা একজনের জন্য একটা কাজের সুপারিশ করতে চাই। তাকে যে-কোন একটা কাজ ঠিক করে দেওয়া

দরকার। আমার নাম ওয়েডেলজ্যাল সবার্গ।' * এই বলে তরুণীকে ফের অভিবাদন জানিয়ে বার হয়ে এলাম। সে লজ্জায় লাল হয়ে গেল। এবং এহেন সঙ্কট অবস্থায় সেস্থান থেকে সে নড়তে পর্য্যন্ত পারল না। সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসতে আসতে ফিরে তাকিয়ে দেখলাম সে তখনো সেইভাবে আমার দিকে হাঁ। করে চেয়ে আছে।

আমার ভিতরকার শান্তভাবটা ফিরে এল, মাথাটাও তখন খুব পরিষ্কার। তরুণীর সেই—'এখানে ত আজ কিছু হবে না'—আমার উত্তপ্ত মস্তিষ্কে বরফের কাজ করল। অবস্থাটা তখন এমন দাঁড়িয়েচে যে, যে-কোন লোক আমায় দেখিয়ে বলতে পারে, ওই একটা ভিখিরী যাচ্চে, পাঁচ জনের দাক্ষিণ্যে ওর উদরান্নের সংস্থান হয়!

মলার ষ্ট্রীটের একটা খাবারের দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। দোকানের ভিতর তখন মাংস রান্না হচ্ছিল, চারিদিকে তার সুবাস ছড়িয়ে পড়েচে। গন্ধটা আমিও পেলাম। অজ্ঞাতসারে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। এবং কোন বিশেষ উদ্দেশ্য না নিয়েই ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিলাম,হঠাৎ আমার ট্যাকের কথা মনে পড়ে গেল, তাই যথাসময়ে সেখান থেকে সরে পড়লাম। বাজারে পৌঁচে

* নরওয়ের সর্ব্বশেষ অভিজাত বংশের নাম।

কোথাও একটু জিরিয়ে নেব মনে করে একটা জায়গার সন্ধান করলাম। দেখলাম, বাজারের সবগুলি বেঞ্চিই লোকে ভর্ত্তি হয়ে রয়েচে। গীর্জ্জার চার পাশে বৃথাই একটু জনবিরল জায়গা খুঁজলাম।

তখন আপনা আপনিই বিষণ্ণ হয়ে বার কয়েক বলে উঠলাম—আপনা আপনি; তারপর আবার হাঁটতে শুরু করলাম। বাজারের ওই কোণটায় যে ফোয়ারাটা আছে সেটাকে একবার প্রদক্ষিণ করলাম। পেট ভরে আঁজল করে জলও খেয়ে নিলাম। তারপর আবার এক-পা দু-পা করে চলতে লাগলাম এবং প্রত্যেকটা দোকানের সামনে খানিকক্ষণ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে থেমে থেমে প্রতিখানা পথচলতি গাড়ী লক্ষ্য করতে লাগলাম। চারদিক যেন ঝল্‌সে যাচ্চে, কপালের দু পাশে কি যেন স্পন্দিত হতে লাগল। জলটা খেয়ে আমার আইঢাই করতে লাগল। এখানে সেখানে থামতে হল, কেননা কেবলি হেঁচকি উঠছিল। আমার সে শোচনীয় অবস্থাকে অন্যের কাছ থেকে গোপন করে চলতে কত কৌশলই না করচি। এমনি করে করে এসে কবরখানায় পৌঁছুলাম।

কনুই দুটো হাঁটুতে থুয়ে হাতের তালুতে গাল রেখে বসে রইলাম। এ ভাবে বসে বেশ আরামই পাচ্ছিলাম, বুকের মধ্যে যে একটা হাঁপ ধরেছিল তা এমনি ভাবে বসে থাকায় আর তেমন নেই বলেই মনে হল।

পাশেই এক পাথর খোদাইকর কোলের উপর পাথর রেখে কি লিপি খোদাই করছিল। চোখে তার নীল চশমা। তাকে দেখে আমার এক প্রায়-ভুলে-যাওয়া আলাপী লোকের কথা মনে পড়ে গেল।

যদি লজ্জার মাথা খেয়ে তাকে সব কথা বলতে পারতাম যে, বেঁচে থাকা আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েচে। তাকে আমার কামানোর টিকেট বইখানা বরং দিতে পারি, যদি সে আমায় তার বিনিময়ে কিছু দেয়!

কামানের টিকেট বইখানা দিব! কেন?—অসম্ভব! এখনো তা দিয়ে আট দশ দিন কামানো চলতে পারে। ব্যাকুল আগ্রহে আমার সেই পরমসম্পদ খুঁজতে লাগলাম। পকেটে হাত দিবামাত্রই তা পেলুম না, তাই প্রথমটা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ভয়ে ভয়ে ফের খুঁজতে লেগে গেলাম। অনেক খোঁজাখুঁজির পর বুক-পকেটে অন্যান্য প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় কাগজের সঙ্গে সেটি পেয়ে গেলাম। কী পরমসম্পদই আমার!

বইখানা নেড়ে চেড়ে বার বার করে টিকেটগুলি গুণে দেখলাম, এখনো ছয়খানা টিকেট রয়েচে, অনেক দিন আগেই তা ফুরিয়ে যাবার কথা, কিন্তু নিয়মিত ব্যবহার না করায় এখনো রয়ে গেছে। মেজাজ এমনি হয়ে গেছে যে, এখন আর কামানোর দিকেও তেমন আগ্রহ নেই। কি অদ্ভুত খেয়াল!

এখনো তা হলে আমার ছয় আনার পয়সা রয়েচে! ভাবতে কি আরাম! খুশীর সঙ্গে ভাবতে ভাবতে অনেকক্ষণ কেটে গেল। আমার চারদিকের বড় বড় বাদাম গাছগুলির ফাঁক দিয়ে জোরে বাতাস বয়ে যাচ্চে। দিনের আলো নিভে আসচে।

পকেটের কাগজগুলি পরীক্ষা করে দেখলাম, অনাবশ্যক কিছু আছে কিনা, কিন্তু কিছুই মিলল না। সবই যেন দরকারী। 'টাই'টার উপযোগিতা কিছুই ছিল না, সুতরাং সেটা কাউকে অনায়াসেই দেওয়া যেতে পারে। কোটের গলার বোতাম খুব এঁটেই দিতে হয়, কেননা ওয়েষ্ট কোটটা ত অনেক আগেই হাতছাড়া হয়ে গেছে। কাজেই 'টাই'টা ঝেড়ে ফুড়ে একখানা কাগজে বেশ করে ভাঁজ করে কামনোর টিকেট বইয়ের সঙ্গে পকেটস্থ করলাম। তারপর ওপল্যাণ্ড কাফিখানার দিকে রওনা হলাম। বিকেলে ব্যাঙ্ক ছুটি হবার পরই ত সেই কেরাণী-বাবুটির সঙ্গে সেখানে দেখা হবার কথা।

টাউন হলের ঘড়িতে তখন সাতটা বেজে গেছে। জোরে জোরে কাফিখানার সামনে দিয়ে পাইচারী করতে লাগলাম। অথচ কাফিখানায় যারা ঢুকছিল ও বার হচ্ছিল তাদের দিকেও নজর রাখছিলাম। অবশেষে প্রায় আটটার সময় সে তরুণ যুবক বেশ ফিটফাট পোষাক পরে কাফিখানায় এসে ঢুকল।

বুকটা একবার কেঁপে উঠল কিন্তু কোন রকম সম্ভাষণ না করেই তাকে বলে উঠলাম, 'ছয় আনা মাত্র!' এই বলে আমার সেই পরমসম্পদ টিকেটবই ও টাইশুদ্ধ পুলিন্দাটি তার হাতে দিয়ে ফের্ বললাম, 'এরই দাম ছয় আনা।'

সে জবাব দিল, 'কিন্তু টাকা ত পাই নি! সত্যি বলচি, একটি পয়সাও এখন নেই আমার!' এই বলেই তার পকেট দুটো ঝেড়ে আমায় দেখালে, ব্যাগের মধ্যেও কিছু নেই। 'কাল রাত্তিরটা বাইরে কাটিয়েছি, কাজেই হাতে যা-কিছু সামান্য ছিল সবই ফুঁকে দিয়েছি। বিশ্বাস কর ভাই, সত্যি একটি পয়সাও নেই আজ।'

তার কথা অবিশ্বাস করার কোনই কারণ ছিল না, তাই বললাম, 'তা বেশ ত, তোমার কথা ত অবিশ্বাস করচি নে। সবদিনই কি সকলের হাতে পয়সা থাকে!' সত্যিই ত, সামান্য ক'আনার জন্য তার মিছে কথা বলার কি দরকার? এটাও লক্ষ্য করলাম, সে যখন তার এ-পকেট সে-পকেট আঁতিপাতি করে খুঁজে দেখছিল তখন তার চোখ দুটি সজল হয়ে উঠেছিল। পিছন ফিরে চলতে চলতে বললাম, 'মাফ করো ভাই, তোমায় বিরক্ত করলাম। সময়টা বড় খারাপ যাচ্ছে কিনা।' এই বলতে বলতে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, খানিকটা যেতেই পুলিন্দাটি ফেরত দিবার জন্য সে আমায় ডাকল। আমি বললাম, 'না, না, থাক,

তুমিই নাও! ওতে তেমন বিশেষ কিছুই নেই, খানকয়েক কামানর টিকেট আর একটি টাই মাত্র, আর ওই হচ্চে আমার একমাত্র সম্পদ।' এবং নিজের কথায় নিজেই অভিভূত হয়ে পড়লাম—কেননা সেই আসন্ন সন্ধ্যায় নিজের কানেই তা বড় করুণ শোনাল। আমার কান্না পাচ্ছিল।...

বাতাস বেগে বইতে লাগল, আকাশে মেঘের দল উন্মাদ হয়ে ছুটাছুটি লাগিয়েচে, অন্ধকার যতই জমে আসছিল ততই যেন বেশ ঠাণ্ডা লাগছিল। রাস্তা দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে চললাম, নিজের জন্য ভারী দুঃখও হল। চোখের জল আর কিছুতেই মানা মানছিল না। আপনার মনে অস্পষ্ট ভাষায় গোটা কয়েক শব্দ আউড়ে যাচ্ছিলাম, 'কী দুর্ভাগ্য আমার! আর যে জীবন-ভার বইতে পারি নে ঠাকুর!'

আরো এক ঘণ্টা কেটে গেল, সময়টা যেন আর কিছুতেই কাটতে চাইছিল না। মার্কেট ষ্ট্রীটে ঘোরাফেরা করে অনেকক্ষণ কাটালাম, কাউকে আসতে দেখলেই একপাশে নিজেকে লুকোবার ব্যর্থ চেষ্টা বা দোকানের দিকে লক্ষ্যহীন চেয়ে চেয়ে বিকিকিনি দেখা—এই ছিল কাজ। অবশেষে একটা গুদামের এক পাশে থাকবার মত একটু আশ্রয় বেছে নিলাম।

না, আজো আবার সেই বনে গিয়ে থাকতে পারব না। অদৃষ্টে যা আছে তাই হোক। বনে যাবার মত শক্তিও আজ আর

নেই, পথও ত কম নয়। রাতটা একরকমে না-একরকমে কাটিয়ে দিলেই হল। আজ আর নড়চি নে। শীত যদি নেহাতই বেশী মনে হয়, তখন না হয় গীর্জ্জাটার চারদিক হেঁটে শীত দূর করা যাবে। আর এ নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। সেখানেই একটা কেরোসিন কাঠের ভাঙা বাক্সে হেলান দিয়ে আমি ঝিমুতে শুরু করে দিলাম।

রাত তখন বেশ হয়েচে, গোলমাল ঢের কমেচে, দোকান-পত্তরও সব বন্ধ হয়ে গেছে। লোকজনের পথচলার শব্দ বড়-একটা শোনা যায় না। সামনের বাড়ীর একটা জানালা দিয়েও আর আলো দেখা যায় না। চোখ মেলে দেখি আমার সামনে কে একজন দাঁড়িয়ে আছে। লোকটার জামার বোতাম অন্ধকারেও ঝক্ ঝক্ করছিল, তাইতেই বুঝতে পারলাম—পাহারাওয়ালা। লোকটার মুখ কিন্তু দেখতে পারছিলাম না।

সে বললে, 'নমস্কার মশাই!'

ভয় পেয়ে জবাব দিলাম, 'নমস্কার!'

পুনরায় প্রশ্ন হল, 'কোথায় থাকা হয়?'

অভ্যাস বশে কিছু না ভেবেই আমার সেই পুরোনো চিল-কোঠার ঠিকানাটা বলে ফেললাম।

সে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

উদ্বেগের সুরে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিছু অপরাধ করেচি?'

সে বললে, 'না, তবে রাত অনেক হয়েচে কিনা, এবারে ঘরে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। ঠাণ্ডাটাও আজ বেশ পড়েচে।'

'হ্যাঁ, বেশ ঠাণ্ডাই পড়েচে।' আমি তাকে সেলাম করে অভ্যাস মত সেই পুরোনো বাড়ীর দিকেই চলতে শুরু করলাম। কাউকে না জানিয়েই উপরে উঠে যাচ্ছিলাম, সাত আট ধাপ মাত্র বাকী, এমন সময় সিঁড়িটা একবার ক্যাচ ক্যাচ করে উঠল। দরজার পাশে জুতা খুলে আস্তে আস্তে উপরে উঠে গেলাম। চারদিক নীরব নিস্তব্ধ, কেবল কোন্ ঘরে যেন একটা শিশু কেঁদে উঠল। তার পরই সব চুপ চাপ। যেমন করে দরজাটা ভেঁজিয়ে রেখে গিয়েছিলাম, তেমনই রয়ে গেছে। দরজা খুলে ঘরে ঢুকলাম। এবং নিঃশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম।

যেখানকার যা সবই ঠিক আছে। জানলার পর্দ্দাটা বাতাসে দুলচে। ভাঙা লোহার খাটের উপর কোন রকম বিছানাই নেই। টেবিলের উপর একখানা কাগজে কি লেখা চাপা দেওয়া পড়ে রয়েচে। সম্ভবত বাড়ীউলিকে আমি যে ছোট্ট চিরকুটখানা লিখে রেখে গিয়েচি তাই পড়ে আছে। হয় ত আমার চলে যাবার পরে আর সে উপরে আসে নি।

টেবিলের সেই শাদা কাগজখানার উপর হাত বুলিয়ে বুঝলাম যে, সেখানা একখানা চিঠি। অবাক হয়ে গেলাম। ভবিষ্যতে

আর কখনো যেন এ বাড়ীতে না ঢুকি এই মর্ম্মে বাড়ীউলি এক নিষেধাজ্ঞা জারী করে গেছে হয় ত।

আবার ধীরে ধীরে ঘরের বার হয়ে গেলাম,—এক হাতে জুতো জোড়া আর হাতে চিঠিখানা নিয়ে আর কম্বলখানা কাঁধের উপর নিয়ে। দাঁতে দাঁত চেপে মচমচে সিঁড়ি বেয়ে নিরাপদে নীচে নেমে এলাম। এসে দেউরীর একপাশে দাঁড়িয়ে জুতো জোড়া পায়ে দিয়ে চিঠিখানা হাতে নিয়ে উদ্দেশ্যহীনের মত পথ চলতে শুরু করে দিলাম।

রাস্তার গ্যাসের আলোগুলি টিম টিম করে জ্বলছিল। সটান একটা গ্যাস-পোস্টের কাছে গিয়ে চিঠিখানা খুলে পড়লাম। আলো যথেষ্ট ছিল না, তাই কষ্টেস্থষ্টে চিঠিখানা পড়ে ফেললাম। হঠাৎ বুক ফেটে যেন একটা আশার ফুলকি উদ্দাম বেগে ঠিকরে বেরিয়ে এল। আপনার মনেই উল্লাসে চীৎকার করে উঠলাম। চিঠিখানা সম্পাদকের কাছে থেকে এসেচে।—গল্পটা মনোনীত হয়েচে, টাইপ করা হচ্চে, একবার গিয়ে সেটা দেখে দেবার জন্যে সম্পাদক অনুরোধ জানিয়েছেন! সামান্য কিছু অদলবদল দরকার হবে ... সামান্য ক'টা ভুল সম্পাদক নিজেই শুধরে নিয়েছেন। ... লিখেছেন, লেখাটায় নাকি শক্তির যথেষ্ট পরিচয় রয়েচে। কালকেই ছাপা হবে ... দশটাকা পাওয়া যাবে।

হাসি ও কান্না দুটোই আমায় পেয়ে বসল। সারাটা রাস্তা পাগলের মত দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিলাম। নিজেই নিজের উরু চাপড়ে দিলাম, আপনার মনে কত কি জোরে জোরেই বলে গেলাম। এবং এমনি করে রাত কাটতে লাগল।

সারাটা রাত আমি গোটা রাস্তাটা যেন চষে ফেললাম এবং বার বার কেবল এই কথাটাই আওড়ালাম যে, লেখাটায় শক্তির যথেষ্ট পরিচয় আছে, প্রকাশ ভঙ্গিমাও সুন্দর। আর তার সঙ্গে দশটি টাকা!

আর চাই কি!!

२

হপ্তা কয়েক পরের কথা।

সে দিন সন্ধ্যায় পথে বার হয়ে পড়েচি। গীর্জ্জার ময়দানে বসে খবরের কাগজের জন্য একটা প্রবন্ধ রচনায় নিবিষ্ট ছিলাম। লেখা নিয়ে আকাশ পাতাল কত কি ভাবতে ভাবতে রাত আটটা বেজে গেল। চারদিক তখন আঁধার হয়ে এসেচে। ময়দানের ফটক বন্ধ করবার সময় হয়ে এল।

ভারী ক্ষুধা পেয়েচে তখন—পেটে যেন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলচে। সেই যে গল্পটা লিখে দশটা টাকা পেয়েছিলাম, তা দু'দিনেই ফুরিয়ে গেছে। প্রায় তিন দিন হতে চলল কিছুই খেতে পাই নি। ভারী দুর্ব্বল হয়ে পড়েচি; পেন্সিলটা হাতে ধরে রাখতেও যেন কষ্ট হচ্চে। পকেটে আছে একখানা ভাঙা পেন্সিল-কাটা ছুরি আর একগোছা চাবি, কিন্তু একটি আধলাও নেই।

ময়দানের ফটক বন্ধ হতেই সোজা ঘরের দিকে যাব মতলব করছিলাম কিন্তু ঘরের কথা মনে হতেই একটা স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা এসে আমায় পেয়ে বসল। কেননা আজকাল যেখানে থাকি সেখানটাকে 'ঘর' কিছুতেই বলা চলে না। কে একজন

বুভুক্ষা

পিতল-কাঁসার বাসন মেরামতের দোকান করেছিল, ক'দিন আগে সে দোকান তুলে নিয়ে গেছে, সম্প্রতি সেই অন্ধকার স্যাঁৎসেঁতে ঘরেই কিছু দিন বাস করবার অনুমতি নিয়েচি। কোথায় চলেচি ঠাহর না করে টলতে টলতে টাউন হল ছাড়িয়ে খানিকটা এগিয়ে চললাম। অদূরেই সমুদ্র, রেলওয়ে ব্রিজের সামনের একখানা বেঞ্চিতে গিয়ে বসে পড়লাম।

তখন কোন দুঃশ্চিন্তাই আমার মনে নেই। দুঃখ কষ্টের কথা তখন একদম ভুলে গেছি, সাগরের সেই অন্ধকার আবছায়ার প্রশান্ত দৃশ্য দেখে আমার মনটাও অনেকটা শান্ত হয়ে পড়েচে। অভ্যাসের বশে এতক্ষণ চেষ্টা করে যেটুকু লিখেছিলাম তা পড়ে দেখলাম। আমার তখনকার উৎপীড়িত মস্তিষ্কে এই-ই মনে হল যে, এ রকম লেখা আমার কলম থেকে ইতিপূর্ব্বে আর কখনো বেরোয় নি।

পকেট থেকে লেখাটা বার করে পাঠোদ্ধারে মনোনিবেশ করলাম। চোখের সাম্‌নে লেখাটা ধরে আগাগোড়া প্রতিটি পংক্তিতে চোখ বুলিয়ে গেলাম। শেষটায় ক্লান্ত হয়ে লেখাটা ফের্ পকেটস্থ করলাম। চারদিক নীরব নিস্তব্ধ। সম্মুখে উদার অসীম নীল সমুদ্র, আর এক দেশ থেকে আর এক দেশে ছোট ছোট পাখীরা নিঃশব্দে উড়ে চলেচে।

দূরে একটা পাহারাওয়ালা পাইচারী করচে; এ ছাড়া আর

কোন জনমানবের সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্চে না। গোটা বন্দরটা যেন একেবারে মরে আছে।

আর একবার যথাসর্ব্বস্ব গুণে দেখলাম। একখানা ভাঙা পেন্সিল-কাটা ছুরি আর একগোছা চাবি কিন্তু একটি আধলাও নেই।

হঠাৎ কেন পকেটে হাত ঢুকিয়ে লেখাটা আবার বার করে নিলাম। এ যেন আপনা থেকেই, যেন স্নায়ুমণ্ডলীর একটা অজানা চাঞ্চল্য মাত্র। কাগজের তাড়া থেকে একখানা অলেখা শাদা কাগজ বেছে নিয়ে একটি ঠোঙা বানিয়ে সেটিকে এমন ভাবে ঢাকা দিলাম, যেন তাতে কিছু রয়েচে এবং তার পর সেটিকে ফুটপাথের উপর একধারে রেখে দিলাম। কেন যে এ পাগলামি হল, ভগবানই জানেন। বাতাসে প্রথমটা ঠোঙাটা একটু উড়ে যেতে চাইল কিন্তু খানিকবাদেই অনড় হয়ে পড়ে রইল।

এদিকে পেটের জ্বালায় আমি ত একেবারে অস্থির হয়ে উঠেচি। বসে বসে সেই কাগজের ঠোঙার দিকে চেয়ে রইলাম, মনে হল যেন ওটা ফেটে পড়ে ওর থেকে ঝকঝকে কতকগুলি টাকা বার হয়ে পড়বে। সত্যি সত্যিই আমার মনে হচ্ছিল যে, ওর মধ্যে কিছু না-কিছু নিশ্চয়ই আছে। ঠোঙাটার মধ্যে কত আছে তা মনে মনে অনুমান করবার লোভ আমি

সামালাতে পারলাম না ; অনুমানটা ঠিক হলে যে টাকাটা আমিই পাব সে বিষয়ে ত আর কোন সন্দেহ নেই।

কল্পনার জোরে ঠোঙার মধ্যে চকচকে আনি দুয়ানিগুলো যেন দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেলাম! গোটা ঠোঙাটাই হয় ত টাকা আনায় একদম ভর্ত্তি! বসে বসে বিস্ফারিত চক্ষে ঠোঙাটার দিকে তাকালাম এবং তা চুরি করবার জন্যে নিজেকে ঠেলতে লাগলাম।

অদূরে পাহারাওয়ালাটা খক্ খক্ করে কেশে উঠল। আমারও কাশবার প্রবৃত্তি যে কোথা থেকে এল কে বলবে? উঠে দাঁড়িয়ে পাহারাওয়ালাটা যেন শুনতে পায় এই মতলবে তিন তিনবার কাশলাম। সে কি তার সাংকেতিক বাঁশিটায় ফুঁ দেবে! নিজের চালাকিতে মনে মনে হেসে উঠলাম; আনন্দে হাত কচ্‌লিয়ে আপনার মনেই লোকটাকে গালাগালি দিতে লাগলাম। ব্যাটা পাজি, এসে কি ঠকনটাই না ঠকবে! ও ব্যাটাচ্ছেলে নিশ্চয়ই ওর দুষ্কৃতির জন্যে মরে নরকে অতিবড় শাস্তি সব ভোগ করবে। অনাহারে আমি তখন মত্ত অবশ, ক্ষুধায় উন্মাদ।

মিনিট কয়েক বাদে পাহারাওয়ালাটা ওর লোহার নাল দেওয়া নাগরা জুতোর খট্ খট্ শব্দ করে নিস্তব্ধতা ভেঙে এসে উপস্থিত হল। সারা রাতই হয় ত তাকে এমনি ধারা জেগে পাহারা দিতে হবে। ঠোঙাটার একান্ত কাছে না-আসা পর্য্যন্ত সেটা তার

নজরে এল না। নজর পড়তেই থমকে দাঁড়িয়ে হাঁ করে সে ঠোঙাটার দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকাল। ঠোঙাটা শাদা ধব্‌ধব্‌ করচে, হয় ত তার মধ্যে কিছু আছে—কিছুটা কি কয়েকটা রেচকি ? ... সে আস্তে আস্তে ঠোঙাটা কুড়িয়ে নিল। অনেক আশায় ঠোঙাটা দেখলে। অদূরে বসে বসে আমি তা দেখলাম এবং আপনার মনে হেসে উঠলাম, উরু চাপড়িয়ে পাগলের মত সে কী হাসি ! একটি কথাও কিন্তু আমার মুখ থেকে বার হল না। হাসি থেমে যেতেই চোখের জলে বান ডেকে আসে।

ফুটপাথের উপর আবার খট্‌ খট্‌ শব্দ করে পাহারাওয়ালা র'কের সিঁড়ির দিকে গেল। আমি সজল চোখে সেখানে বসে বসে হাসি চাপতে লাগলাম। উল্লাসে একেবারে আত্মহারা হয়ে গেছি। সরবে ঠোঙার কাহিনীটা আপনাকে আপনি বললাম, হতভাগা পাহারাওয়ালাটার হাবভাব অনুকরণ করলাম, আর নিজের খালি হাতটাও একবার তাকিয়ে দেখলাম, এবং বার বার আবৃত্তি করলাম—ও কিন্তু কেশেই ঠোঙাটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে। এই কথাগুলি অদল বদল করে এবং তার সঙ্গে আরো নতুন নতুন শব্দ যোগ করে এক চমৎকার গল্প বানিয়ে ফেললাম। পাহারওয়ালা আবার থক্‌ থক্‌ করে উঠল।

যতদূর শক্তিতে কুলোয় ও-কথাগুলিকে ঘুরিয়ে বাঁকিয়ে এক অদ্ভুত খিচুড়ী পাকিয়ে তুললাম। এই খেয়ালের খুশীতে

মশগুল হয়ে যে কতক্ষণ ছিলাম, জানতেও পারি নি; ওদিকে যে রাত হয়ে যাচ্চে সে দিকে নজরই ছিল না। সর্ব্বদেহ এলিয়ে আসচে, ক্লান্তিকে যেন কিছুতেই দমন করতে পারছিলাম না। চারদিকে ঘোর অন্ধকার, মৃদু বায়ুহিল্লোলে নীল সমুদ্র আন্দোলিত হচ্চে। দূরে জাহাজগুলি আর তার মাস্তুলগুলি যেন নির্ব্বাক দানবের মত বুক ফুলিয়ে আমারই প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। আমার কোন যন্ত্রণা নেই—ক্ষুধা মরে আসচে, কেবল তাই নয়, খালি পেটে যেন বেশ হালকাই বোধ করচি। চারদিকে কেউ কোথাও নেই। কেউ যে আমায় লক্ষ্য করবার নেই এতে মনটা খুশীতে ভরে উঠল। বেঞ্চির উপর পা তুলে দিয়ে হেলান দিয়ে শুয়ে পড়লাম। সত্যিকারের নির্জনতার যে কি গুণ, বেশ বুঝতে পারলাম। আমার মনের আকাশে তখন বিন্দুমাত্রও মেঘ নেই, এতটুকুও অস্বস্তি নেই। যতটা মনে হয় তখন কোন খামখেয়ালিও মনে জেগে নেই, এমন কি কোন অতৃপ্ত অকৃতার্থ আকাঙ্ক্ষাও আর আমার ছিল না। উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে বসে ছিলাম। কোনও সাড়া শব্দও আমায় বিরক্ত করছিল না। ধীরে ধীরে একটা অন্ধকারের পর্দ্দা যেন নেমে এসে আমার দৃষ্টি থেকে পৃথিবীটাকে ঢেকে ফেললে, আর আমি সেই কাল্পনিক জগতে নিমগ্ন হয়ে গেলাম। নির্জনতার সেই এক একঘেয়ে অস্পষ্ট শব্দ আমার কানে এসে বাজছিল এবং রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে সেই অন্ধকার

দৈত্যরা আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে সেই সুদূর সাগরের বুকে ফেলবে। কত অজানা জনশূন্য দেশের মধ্যে দিয়ে আমায় নিয়ে রাজকুমারী ল্যাজালির প্রাসাদে পৌঁছে দেবে। সেখানে ভাবতেও-পারি-নে-এমন সব জাঁকজমক যেন আমারই প্রতীক্ষায় রয়েচে, আমি যেন সেখানে দুনিয়ার মীরমজ্‌লিশ। রাজকুমারী ল্যাজালি এক সুবৃহৎ দীপালোকিত ঘরে পাণ্ডুর গোলাপের সিংহাসনে বসে আছে। আমায় দেখতে পেয়ে দুবাহু বাড়িয়ে দেবে; হেসে হাঁটু গেড়ে আমায় সাদর অভ্যর্থনা করে বলবে, 'এস। আমার রাজ্যের পক্ষ থেকে, আমার নিজের পক্ষ থেকে তোমায় সাদর অভিনন্দন দিচ্চি। আমি যে এই সুদীর্ঘ বিশ বছর তোমারই প্রতীক্ষায় রয়েচি বন্ধু! কত দীর্ঘ রজনী বিনিদ্র কাটিয়েচি তোমারই আসার আশায়। তোমার বিরহে কতই না কেঁদেচি, ঘুমেও কেবল তোমাকেই না স্বপ্নে দেখেচি আমি!' ... তরুণী আমার হাত ধরে নিয়ে গিয়ে একটা বারান্দায় উপস্থিত হল। সেখানে বহুলোক জমায়েত রয়েচে। আমাদের দেখতে পেয়ে তারা আনন্দধ্বনি করে উঠল। অদূরে বাগানে শত শত রূপসী কিশোরী হাসচে, নৃত্য করচে, গান করচে। তাদের পাশ কেটে আর একটা ঘরে গিয়ে পৌঁছুলাম। সে ঘরখানা চুনি-পান্না দিয়ে তৈরী; আর সেখানে সূর্য্যালোক উজ্জ্বলতর হয়ে প্রতিফলিত হচ্চে। চারদিকেই হাসি, গান, সুগন্ধ। একেবারে অভিভূতের মত হয়ে পড়লাম।

রাজকুমারীর হাত আমার হাতের মধ্যে দৃঢ়বদ্ধ। আমার দেহের সমস্ত শিরা-উপশিরার মধ্যে দিয়ে যেন একটা তড়িৎ-তরঙ্গ বয়ে গেল, আমি তাকে আলিঙ্গন করে আকর্ষণ করতেই সে চুপি চুপি বলে উঠল, 'ওগো এখানে নয়, এখানে নয় ; এসো, আরো এগিয়ে চল।' অবশেষে আমরা এক অত্যদ্ভুত ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলাম। চারিদিকের দেয়াল হীরা মুক্তায় মোড়া, মেঝে চুণী পান্নার। কত দামী আসবাব-পত্র! আমি আর সইতে পারলাম না, মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লাম।

জ্ঞান হতেই আমার মনে হল, সে যেন আমায় আলিঙ্গন করে রয়েচে, তার তপ্ত নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস আমার মুখের উপর অনুভব করলাম। সেই নিঃশ্বাস যেন কানে কানে আমায় বললে, 'বন্ধু আমার! এসো ... এবার চুম্বনে আমার সব ব্যথা দূর করে দাও বন্ধু ... ওগো দেও ... দেও ... আরো ... আরো ...'

বসে বসেই দেখতে পেলাম, কতকগুলি নক্ষত্র এ দিক থেকে আর এক দিকে ছুটচে। আনন্দের আতিশয্যে আমি আর কিছু ভাবতে পারলাম না।...

বেঞ্চির উপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। একটা পাহারাওয়ালা আমায় জাগালে। তখন জীবনের সে দুঃখদুর্দ্দশার কথা কী নিষ্ঠুর ভাবেই না মনে পড়ল। প্রথমটা নিজেকে উদার আকাশের তলে দেখতে পেয়ে বোকার মত অবাক হয়ে গেলাম কিন্তু পরক্ষণেই

নিজেকে এ অবস্থায় দেখে এক তীব্র নৈরাশ্য এসে গেল। তখনো যে বেঁচে আছি তা মনে করে আমার কান্না এল। আমি যখন ঘুমে অচেতন, তখন এক পস্‌লা বৃষ্টিও হয়ে গেছে, জামাকাপড় সবই ছপ্‌ ছপ্‌ করচে। শীতে কাঁপুনি ধরে গেছে।

ঘোর অন্ধকার। অনেক কষ্টে আমার সামনেকার পাহারা-ওয়ালাটাকে পাহারাওয়ালা বলে চিনতে পারলাম।

• পাহারাওয়ালাটা বললে, 'বেশ হয়েচে, এখন উঠে লক্ষ্মী ছেলেটির ঘরে যাও ত মশাই !'

তৎক্ষণাৎ উঠে পড়লাম। সে যদি আমাকে ফের্‌ সেখানেই শুয়ে পড়তে হুকুম দিত ত আমি তাই করতাম। মনটা আমার কেমন যেন খিঁচড়ে গেছে, গায়ে যেন কিছু মাত্র বল নেই ; তার উপর, ক্ষুধার অসহ্য জ্বালা আমায় মেরে ফেলছিল।

পাহারাওয়ালাটা আবার চেঁচিয়ে উঠল, 'কোথাকার বে-আক্কেল, টুপিটা যে পড়ে রইল, সেদিকে দেখচি কিছুমাত্র নজর নেই ! টুপিটা নিয়েই যাও না হে নবাবপুত্তুর !' আপনার মনে আওড়াতে আওড়াতে চললাম, 'তাই ত, কি যেন নেই, কি যেন ফেলে গেছি বলেই না মনে হয়েছিল। বেশ দাদা, বেশ ! নমস্কার !' এই বলে হেলে দুলে হোঁচট খেতে খেতে এগিয়ে চললাম।

যদি এক টুক্‌রা রুটি খেতে পেতাম ! যেতে যেতে রুটির

কথাই কেবল মনে হতে লাগল। সেই যখন কিনে খেতাম, ঠিক তেমনি বাদামি রঙের সুস্বাদু রুটি। ভয়ানক ক্ষুধাই নাকি পেয়েছিল, আর যেন চলতে পারছিলাম না। জলে ভিজে মাতালের মত টলতে টলতে এগিয়ে চলেচি।

এ দুঃখের আর যে শেষ আছে তাও ত মনে হয় না। সহসা মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়লাম। ফুটপাথে পা ঠুকে চেঁচিয়ে বলে উঠলাম, 'ব্যাটা আমায় কি বললে? গাল দিলে? আমি ঠুঁটো-জগন্নাথ? আমায় গাল দেওয়া বার করে দিচ্চি, দাঁড়াও না একবার!' পেছন ফিরে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে গেলাম। রাগে আমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গ যেন জ্বলে যাচ্চে। খানিকটা গিয়ে হোঁচট খেয়ে মাটীতে পড়ে গেলাম কিন্তু ভ্রূক্ষেপ না করে উঠে আবার ছুটলাম। ছুটতে ছুটতে একেবারে রেল ষ্টেশনে এসে পৌঁছুলাম। কখন যে সেই গন্তব্য স্থান পিছনে ফেলে এসেচি তা টেরও পাই নি। কিন্তু তখন শরীর এতটা অবসন্ন হয়ে পড়েচে যে, ফিরে আর সেখানে যাবার শক্তি ছিল না। তাছাড়া দৌড়ানর ফলে রাগটাও অনেকটা কমে এসেছিল। হাঁপ ছাড়বার জন্যে এক জায়গায় বসে পড়লাম। পাহারাওয়ালাটা আমায় যা বলেচে তা গায়ে না মাখাই ত আমার উচিত। নিশ্চয়ই। তবে সব ব্যাপারেই অবশ্য চুপ করে থাকা উচিত নয়।—তা ঠিক, কিন্তু সে ত এর চাইতে ভালো ব্যবহার কিছু জানে না, ও একটা

সাধারণ লোক বৈ ত নয়। এই যুক্তিটা আমার বেশ ভাল লাগল। আপনার মনে দু'বার আওড়ালাম, 'ও ত এর চাইতে ভাল ব্যবহার কিছু জানে না।' এবং তারপর আমি ফিরে এলাম।

অভিমানের সুরে মনে মনে বলে উঠলাম, 'ভগবান! কি তোমার মতলব! যে, আমায় আজ এই অন্ধকার রাত্তিরে ঝড়জলে ভিজিয়ে পাগলের মত ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্চ?' এই সময় ক্ষুধার জ্বালা আমার সর্ব্ব ইন্দ্রিয়কে গ্রাস করে বসেছিল, কোন রকমেই যেন আর এতটুকু স্বস্তিও পাচ্ছিলাম না। বার বার মুখের লাল গিলে পরখ করতে লাগলাম যে, তা ক্ষুধাশান্তির কাজে আসে কিনা। সুখের বিষয় তাতে অনেকটা কাজ হল বটে।

কয়েক সপ্তাহ ধরেই ক্ষুধার জ্বালা আমাকে এত বেশী পেয়ে বসেচে যে, হালে আমায় অনেকটা দুর্ব্বল করেই ফেলেচে। যদি বা কোন দিন কোন রকমে দু'চারটে টাকা জোগাড় হয়েচে, তা নিঃশেষ হতে কিন্তু বড় বেশীক্ষণ লাগে নি; দিন কয়েক উপুসের পর দুর্ব্বল শরীরটাকে সবল করতে না-করতেই আবার উপুসের পালা শুরু হয়, আরো কাহিল হয়ে পড়ি। পিঠ ও কাঁধ নিয়ে আমি বড় মুশ্‌কিলেই পড়লাম। বুকের ব্যথাটা না হয় কেশে বা কুঁজো হয়ে হেঁটে কমাতে পারি কিন্তু পিঠ ও কাঁধের

ব্যথা কমাই কি করে! আচ্ছা, আমার এ অবস্থার কোন বদল না হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে? দুনিয়ায় এত লোক বেঁচে থাকার অধিকার পেয়েচে, সে দাবীটুকুও কি আমার থাকতে নেই? এই ধরুণ না, পুস্তক-প্রকাশক পাশা বা জাহাজ অফিসের বড়বাবু হেনেচেন। আমি কি এদের মত খাটতে পারি নে, না আমার যোগ্যতা কিছুমাত্র কম আছে? আমি ত কাঠ-গোলায় করাত চালাবার কাজেরও প্রার্থী হয়েছিলাম, তবু ত আমার দু'মুঠো খোরাক জুটচে না। আমি ত অলস অকর্ম্মণ্যও নই। কত দরখাস্ত করেচি, কত বক্তৃতা শুনেচি, কত প্রবন্ধ লিখেচি, দিনরাত ভূতের মত খেটেচি, কিন্তু কই? যখন দু'পয়সা হাতে এসেচে বড়মানষী ফলাতে অনাবশ্যক খরচ করেচি, তাও ত নয়, দু'বেলা দু'মুঠো খেয়েই ত তখনো দিন কাটিয়েচি! আর যখন পয়সা থাকে নি, তখন ত উপুস ছাড়া আর উপায়ই ছিল না! হোটেলেও ত থাকি নি, বা দোতালার সাজানো ঘরও ত কখনো ভাড়া করি নি! যেখানে দেবতা-মানুষ ত দূরের কথা, শেয়াল-কুকুরও থাকে না, এমন জায়গায়ই ত সারাটা শীতকাল কাটিয়ে দিলাম। বরফের হাত থেকে বাঁচবার জন্যই না সে চিল-ছাতের কুটুরী ও কাঁসা-পেতলের মেরামতি দোকানে দিন কাটিয়েচি। তবে—তবে—না, এর কারণ ত কিছুই বুঝতে পারচি নে।

মাথা গুজে কেবল এই সবই ভাবছিলাম। অথচ আমার মনে ঈর্ষাবিদ্বেষ কিছুমাত্রও ছিল না।

একটা রঙের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে জানলার দিকে তাকালাম। টিনের গায়ে যে মার্কা ছাপান রয়েচে তা পড়তে চেষ্টা করলাম কিন্তু তখন এত অন্ধকার হয়ে গেছে যে, কিছুই পড়তে পারলাম না। নিজেই এই নতুন খেয়ালে নিজের উপর ভারী বিরক্ত হয়ে উঠলাম—কেবল তাই নয়, টিনগুলির গায়ে কি লেখা আছে তা পড়তে না পারায় ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে পড়ছিলাম। জানলার কাচে রাগের মাথায় দুবার ঘুষি চালিয়ে আবার চলতে লাগলাম।

মোড়ে একটা পাহারাওয়ালাকে দেখতে পেয়েই জোরে হাঁটতে শুরু করে দিলাম এবং তার কাছে সটান গিয়ে বললাম, 'দশটা মাত্র বেজেচে।'

সে অবাক হয়ে জবাব দিলে, 'না, দুটো।'

আমি জেদ করে বললাম, 'না, দশটা, দশটা মাত্র বেজেচে!' এবং রাগে গজ্ গজ্ করতে করতে হাত মুঠো করে জোর গলায় বললাম, 'দশটা বেজেচে বাপু, বেশী চালাকি করো না!'

লোকটা খানিকক্ষণ কি ভাবলে এবং আমার আপাদমস্তক তাকিয়ে হাঁ করে চেয়ে রইল এবং খানিক বাদে বেশ নম্রতার সঙ্গে বললে, 'যতটাই কেন না-বাজুক, আপনাদের ঘরে ফিরবার

সময় নিশ্চয়ই হয়েচে। বলেন ত আমিও আপনার সঙ্গে গিয়ে আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারি।'

লোকটার অপ্রত্যাশিত বন্ধুতায় আমি একেবারে হাল ছেড়ে দিলাম। বুঝতে পারলাম, চোখ বেয়ে জল এখনই ঝরে পড়বে, তাই তাড়াতাড়ি জবাব দিলাম, 'না, দরকার নেই! কাফি-খানায় বসে ছিলাম, এতটা যে রাত হয়ে গেছে তা টেরও পাই নি। যাক, তোমায় ধন্যবাদ।'

আমি চলতেই সে আমাকে কপালে হাত তুলে পুলিশী কায়দায় সেলাম করল। তার এই বন্ধু ভাবটা আমায় একেবারে অভিভূত করে ফেললে এবং ক্ষীণভাবে কেঁদে উঠলাম, কেননা আজ ওকে বকশিস দেবার মত একটা পয়সাও আমার পকেটে নেই!

একবার থেমে পিছন ফিরে তার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, সে তখন আপনার মনে হেঁটে চলেচে। দৃষ্টির আড়াল হয়ে যেতেই কপালে করাঘাত করে ডুকরে কেঁদে উঠলাম।

দারিদ্র্যের জন্যে নিজেকে নির্দ্দয় ভাবে গালাগালি করতে লাগলাম। রেগেমেগে আপনাকে নবাবপুত্তর, গাধা, কত কি সব বিশেষণে বিশেষিত করলাম। নিজেকে এমনি ভাবে নিরর্থক গালা-গালি দিয়ে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লাম। বাসস্থানের কাছা-কাছি না যাওয়া পর্য্যন্ত আমার মনের এই অবস্থা সমান সক্রিয়

ছিল। দরজা খুলতে গিয়ে আবিষ্কার করে ফেললাম যে, চাবির গোছাটা যেন কোথায় পড়ে গেছে।

আপনার মনে আওড়ালাম, 'আমি কেন না চাবির গোছা হারাব? আমারই চাবি ত খোয়া-যাবে। এখানে থাকি, এর নীচে একটা আস্তাবল, আর তার উপর কাঁসা-পিতলের মেরামতি দোকান। রাত্রি বেলা দরজায় তালা বন্ধ আছে, তখন চাবি ছাড়া কেউই তা খুলতে পারে না। কাজেই আমি কেন না সে চাবি হারিয়ে ফেলব?

রাস্তার কুকুরটা যেমন ভিজে সপসপে হয়ে যায়, আমি তেমনই ভিজেচি—ক্ষুধাও পেয়েচে, এই সামান্য রকম ক্ষুধা। কিন্তু পাও যে আর চলচে না, তবে আমি কেন চাবি হারাব না?

আমার সম্বন্ধে যদি তাই হবে ত আমি যখন বাড়ী ফিরলাম, তখন গোটা বাড়ীটা কেন অদৃশ্য হয়ে উড়ে গেল না। ... এবং ক্ষুধায় শ্রান্তিতে কঠোর হয়ে আপনার মনেই হেসে উঠলাম।

আস্তাবলে ঘোড়াগুলির পা ঠোকার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম, জানলা দিয়েও ঘরের ভিতরটা দেখছিলাম কিন্তু দরজা খুলতে না পেরে ঢুকতে পারছিলাম না। আবার বৃষ্টি হতে লাগল, সর্ব্বাঙ্গ ভিজে গেল। পাহারাওয়ালাকে দরজা খুলে দিতে বলা যাক। এই কথা মনে হতেই আমায় ঘরে ঢুকবার সুবিধা করে দিবার জন্যে তৎক্ষণাৎ তাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করলাম।

হয় ত সে পারবে, নিশ্চয়ই যদি সে পারে! কিন্তু সে পারল না, তার কাছে ত চাবি ছিল না। পুলিশের কাছে যে চাবি থাকে তা ত তার কাছে থাকে না, সেগুলো থাকে ডিটেকটিভ পুলিশের কাছে।

এখন কি করি তাহলে?

কেন, একটা হোটেলে গিয়ে রাত্তিরের মত একটা বিছানা পেতে পারি। কিন্তু সত্যি সত্যিই ত আর আমি হোটেলে যেতে পারচি নে, আর তাহলে বিছানাই বা কোথায় পাচ্চি; ট্যাকে ত একটি পয়সাও নেই। তাকে বলেচি আমি কাফিখানায় ছিলাম।...

খানিকক্ষণ আমরা উভয়ে টাউন হলের র'কের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে রইলাম! সে মনোযোগ দিয়ে আমার চেহারাটা দেখতে লাগল। বাইরে তখন মূষল ধারে বর্ষণ চলেচে।

সে তখন বললে, 'তাহলে ত আপনাকে ফাঁড়িতে গিয়ে খবর দিতেই হয় যে, আপনি ঘর-হারা।'

ঘর-হারা? এ কথা ত ভাবি নি আগে। বেশ, তাই হবে। পাহারাওয়ালাকে ধন্যবাদ দিলাম। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'সেখানে গিয়ে কেবল আমি ঘর-হারা বললেই চলবে ত?'

'নিশ্চয়ই।...'

ফাঁড়ির হাবিলদার জিজ্ঞাসা করল, 'নাম কি?'

'ট্যানজেন—য়্যান্ড্রিয়াস ট্যানজেন!'

জানি নে কেন মিথ্যা কথা বললাম; চিন্তাগুলি ইতস্তত দ্রুত সঞ্চালিত হতে লাগল এবং একটা থেকে আর একটা অদ্ভুত খামখেয়ালের প্রেরণা পেতে লাগলাম। সেগুলো দিয়ে যে, কি করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। উপস্থিতমত কিছু না ভেবেই এই বেথাপ্পা নামটাই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। মিথ্যে বলার প্রয়োজন না থাকলেও আমার মুখ দিয়ে মিথ্যে একটা বেরিয়ে এল।

'পেশা?'

এইবার আমার মাথায় বাড়ি পড়ল। পেশা! আমার পেশা কি? প্রথমটা মনে হল কাঁসা-পিতলের বাসন মেরামত-কারী বলেই নিজেকে চালিয়ে দিই—কিন্তু সাহসে কুলোল না; প্রথমত আমি যে নাম বলেচি, সে নাম কাঁসা-পিতলের বাসন মেরামতকারীদের মধ্যে হামেসা দেখতে পাওয়া যায় না—তা ছাড়া আমার চোখে পান্‌স্‌-নে চশমা। হঠাৎ মাথায় এল, গম্ভীরভাবে বলে ফেললাম, 'সাহিত্য-সেবী।'

কথা শুনে হাবিলদার একবার চমকে উঠল আর আমি ঘর-হারা মস্তবড় কেউকেটা যেন একজন তার সুমুখে গ্রামভারী চালে দাঁড়িয়ে! সন্দেহের কোন কারণ নেই। প্রথমটা

কেন জবাব দিতে একটু ইতস্তত করেছিলাম সে বেশ বুঝতে পারলে। এই গভীর নিশীতে একজন লেখককে ঘর-হারা অবস্থায় ফাঁড়িতে দেখে কি মনে হয়?

'কোন্ কাগজে লেখেন?'

কাগজের নাম করতে গিয়ে শ্রেষ্ঠ কাগজখানার নামই করে বসলাম। বললাম, 'সন্ধ্যার পরই একবার বাইরে বেরিয়েছিলাম, তারপর এই অবস্থা, লজ্জার বিষয় সন্দেহ নেই! ...'

হেসে বাধা দিয়ে সে বললে, 'সে কথা ত আর খাতায় লিখতে পারব না। জোয়ান ছেলেরা যখন রাত্তিরে বাইরে বার হয়... আমরা বুঝি!'

বৃদ্ধ পাশ ফিরে একজন কন্সট্বলের দিকে চাইতেই সে কায়দাদুরস্তভাবে সদ্দারকে কুর্ণিশ করে দাঁড়াল। বললে, 'ভদ্রলোককে ঘর দেখিয়ে দাও—দোতালায় ভদ্রলোকদের ঘরে। ...শুভরাত্রি!

আমার নিজের এ দুঃসাহসিকতায় গা দিয়ে যেন বরফের মত ঘাম ঝরে পড়ল। নিজেকে সামলে নেবার জন্যে হাত মুঠো করে গা-টা একবার ঝেঁকে নিলাম। যদি ও কাগজের নাম না করতাম তবে আর কোন ভয়ই ছিল না।

কন্সট্বলটা বাইরে দাঁড়িয়ে বললে, 'আলো দশ মিনিট মাত্র আছে, এরই মধ্যে সব সেরে নিতে হবে।'

বুভুক্ষা

'তার পরই আলো নিভে যাবে ?'

'হাঁ।'

বিছানার উপর বসে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করার শব্দ শুনতে পেলাম। পরিষ্কার উজ্জ্বল ঘরখানার চারিদিকে যেন একটা বান্ধবতার ভাব সুস্পষ্ট বিদ্যমান। বেশ ভাল লাগছিল। বেশ আশ্রয় পেয়েচি ; বাইরে জল ঝড়ের শব্দ শুনতে পেলাম। এর চাইতে ভালো আশ্রয় প্রত্যাশা করতে পারি নে। পরম খুশীতে মনটা ভরে উঠল। হাতে টুপিটা রেখে বিছানার উপর বসে দেয়ালের গায়ের গ্যাসের আলোর নলটার দিকে চেয়ে রইলাম। পাহারাওয়ালার সঙ্গে প্রথম আলাপের সব কিছু খুঁটিনাটি আপনার মনে আলোচনা করতে লাগলাম। জীবনে এই প্রথম এবং কি আশ্চর্য্য রকমেই না এদের ঠকালাম। লেখক !—ট্যানজেন, তাই হবে ! তারপর ও কাগজটার নাম করেই না লোকটার মনে একটু সম্ভ্রম জাগিয়ে তুলতে পেরেচি ! 'আমরা তা লিখব না !' তাই নাকি ? সারাটা দিন গীর্জ্জার বাগানে কাটিয়ে রাত দুটোয় ঘরের চাবি আর মনিব্যাগ ঘরে পড়ে রয়েচে ! মন্দ কি ! 'ভদ্রলোককে ঘর দেখিয়ে দাও— দোতালায় ভদ্রলোকদের ঘরে ! ...'

হঠাৎ আলোটা একদম নিভে গেল, নিব্‌বার আগে একটু বাড়া বা কমা কিছুই হল না, একটু কাঁপলও না।

বুভুক্ষা

ঘোর অন্ধকারের মধ্যে বসে রইলাম; এত অন্ধকার যে নিজের হাত পর্য্যন্ত দেখা যায় না—কিছুই দেখা যায় না। অন্ধকারে বসে আর কিছুই করবার নেই, তাই জামা ছেড়ে শুয়ে পড়লাম।

কিন্তু ঘুম আসছিল না। তা বলে ক্লান্তিও আসে নি। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ কাটিয়ে দিলাম—এ নিবিড় কালো অন্ধকার পুঞ্জের যেন আর শেষ নেই—আমার ধারণাশক্তি তার পরিমাণ করতে পারে না।

অন্ধকার এত নিবিড় কালো যে তার পরিমাপ করা আমার শক্তির; বাইরে আর তাই সেই গাঢ় অন্ধকার আমায় পীড়িত করে তুলল। চোখ বুজে আপনার মনে গান গেয়ে উঠলাম, তবু যদি মনটাকে বিষয়ান্তরে নিতে পারি, কিন্তু পারলাম না। অন্ধকার আমার চিন্তাকে একদম পেয়ে বসেছিল, মুহূর্ত্তের জন্য তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলাম না। মনে হচ্ছিল, হয় ত আমি নিজেই বুঝি অন্ধকারের সঙ্গে মিশে যাচ্চি—অন্ধকার যেন আমায় একদম আত্মস্থ করে ফেলেচে।

লাফ দিয়ে বিছানা থেকে উঠে পড়লাম। স্নায়ুমণ্ডলী উত্তেজিত হয়ে পড়ল, কত চেষ্টা করলাম কিছুতেই তাদের ঠাণ্ডা করতে পারলাম না। কেমন এক রকম অস্পষ্ট ঝিম্ ঝিম্ শব্দ শোনা যাচ্ছিল। অন্ধকারের মধ্যেই একবার উঁকি মেরে চাইলাম;

বুভুক্ষা

কিন্তু যে পুঞ্জীভূত নিবিড় নিকষ কালো অন্ধকার আমার নজরে এল, জীবনে আর কখনো সে রকম অন্ধকার দেখবার সুযোগ হয় নি। কই এতদিন ত এই অন্ধকারকে দেখতে পাই নি, অপর কেউ দেখেচে বলেও ত জানি নে। আমার মনে হাস্যকর সব চিন্তা দেখা দিল—সবটাতেই আমি ভয় পেতে লাগলাম।

এবারে আমার ঠিক মাথার উপর দেয়ালের গায়ের একটা ছোট্ট ছিদ্র আমায় পেয়ে বসল—সম্ভবত ও জায়গাটায় একটা গজাল বসান হয়েছিল কোন দিন। দেয়ালে তারই দাগ রয়ে গেছে। গর্ত্তটা কতটা গভীর শুয়ে শুয়ে তাই অনুমান করতে চেষ্টা পেলাম। গর্ত্তটা নেহাৎ যে অকারণে হয়ে গেছে, তা কিন্তু মোটেই নয়। গর্ত্তটার সঙ্গে নিশ্চয়ই কোন জটিল ব্যাপার সংশ্লিষ্ট, আমাকে এই রহস্যময় গর্ত্তটা থেকে আত্মরক্ষা করতেই হবে! যদি ওখান থেকেই একটা কিছু বেরিয়ে পড়ে! গর্ত্তটার চিন্তা আমায় এতটা পেয়ে বসল যে, আমি ভয়ে ও কৌতূহলে জড়সড় হয়ে গেলাম এবং একটু পরেই আর বিছানায় পড়ে পড়ে কল্পনার জাল বুনতে পারলাম না, চট্ করে উঠে পকেট থেকে সেই পেন্সিল-কাটা ভাঙা ছুরিখানা বার করে গর্ত্তটার গভীরতা নির্ণয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। এবং অগোণে বুঝতে পারলাম যে, গর্ত্তটা খুব বেশী গভীর নয়।

তখুনি আবার শুয়ে পড়ে ঘুমাতে চেষ্টা পেলাম। কিন্তু ঘুম এল না—অন্ধকারটা আমায় যেন কিছুতেই ছাড়তে চাইচে না। বাইরে বৃষ্টি থেমে গেছে, আর কোন শব্দই শোনা যায় না। রাস্তায় কারুর চলার শব্দ শুনতে পাওয়া যায় কিনা তা শুনবার জন্য অনেকক্ষণ কান পেতে রইলাম এবং যতক্ষণ না একজনের পায়ের শব্দ পেলাম ততক্ষণ যেন কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। শব্দ শুনে মনে হল যে, লোকটা নিশ্চয়ই পাহারাওয়ালা। সহসা হাতের আঙুলগুলো মট্‌কাতে মট্‌কাতে হেসে উঠলাম; এ নিশ্চয়ই সেই ব্যাটা শয়তান! হা—হা–! মনে হল আমি যেন একটা নতুন শব্দ আবিষ্কার করে ফেলেচি। বিছানা থেকে উঠে বসলাম, শব্দটা ত ভাষায় নেই; আমি আবিষ্কার করেচি। 'কুবোয়া' অন্য আর একটা শব্দের যেমন অক্ষর আছে, এটারও তাই আছে। নিজেকে বললাম, তুমি আজ একটা শব্দ আবিষ্কার করলে ... কুবোয়া ... এ শব্দটার না জানি কি গভীর অর্থ।

চোখ মেলে বসে রইলাম, নিজের আবিষ্কারে নিজেই মুগ্ধ হয়ে গেলাম এবং খুশীতে তৃপ্তিতে হেসে উঠলাম। তারপর চুপি চুপি নিজের সঙ্গেই কথা বলতে লাগলাম; কেউ হয় ত গোপনে আমায় লক্ষ্য করচে, সুতরাং আমার এ আবিষ্কার তার কাছে থেকে গোপন রাখতেই হবে। এইবার আনন্দের আতিশয্যের সঙ্গে সঙ্গেই আবার ক্ষুধার উদ্রেক হল। শরীরটা আমার তখন

বেশ হাল্কা, ব্যথা বেদনাও কিছু ছিল না। আমি চিন্তার রাশ একেবারে আল্‌গা করে দিলাম।

বেশ ধীরস্থির হয়ে আমার মনের সব কথাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরখ করতে লাগলাম। হঠাৎ আমার-আবিষ্কার-করা শব্দটার অর্থ নির্দ্দেশ করবার আগ্রহ জেগে উঠতেই চিন্তার সূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। এই শব্দটার অর্থ কি? এর প্রতিশব্দ যদি ভগবান বা টিভলী* দিই ত তার কোন মানে হয় না এবং এর দ্বারা পশুর মেলা বুঝায় তাই বা কে বললে? জোরে হাত মুঠো করে আর একবার আওড়ালাম, 'এ দ্বারা যে পশুর মেলা বোঝায় তাই বা কে বললে?' না; পরমুহূর্ত্তেই মনে হলো এ শব্দের দ্বারা তালা বা সূর্য্যোদয়ও বোঝা যায় না। এর একটা মানে বার করা খুব কঠিন কাজ নয়। অপেক্ষা করি, আপনিই একটা অর্থ বেরিয়ে পড়বেই। ইতিমধ্যে একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক।

খাটিয়ার উপর শুয়ে শুয়ে সেয়ানার মত হাসছিলাম বটে কিন্তু কিছুই বলছিলাম না, নিজের কোন মতামতের প্রতিবাদ করার ইচ্ছাও মনে জাগে নি। আরো কয়েকমিনিট কেটে গেল, ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে পড়লাম; এই নতুন শব্দটা আমাকে ভারী জ্বালাতন

*ক্রিশ্চিয়ানা শহরের বায়স্কোপ ইত্যাদি ও সাধারণের বেড়াবার স্থান পার্ক ইত্যাদিকে টিভলী বলে।

করতে লাগল। একে কিছুতেই মন থেকে দূর করতে পারছিলাম না। ক্রমে ভাবনায় একেবারে তলিয়ে গেলাম। এর মানে কি হতে পারে না, সে সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে এসেছিলাম বটে কিন্তু এর যে কি মানে হবে সে সমস্যার সমাধান কিছুতেই করে উঠতে পারছিলাম না। আপনার মনে জোরে জোরে বলে উঠলাম, সে যাক গে, ভেবে পরে ঠিক করা যাবে 'খন। হাত মুঠো করে আর একবার কথাটা আওড়ালাম। শব্দটা দৈবের দয়ায় মিলে গেছে, এই হচ্ছে আসল ব্যাপার। কিন্তু শান্তি মিলল না, পরপর আরো কত কথা আমার মনে চারদিক থেকে এসে আমায় ছেঁকে ধরেচে, আর সেই কারণে ঘুম আমার কিছুতেই আসছিল না! অসাধারণ দুর্লভ এই শব্দটি আমার কোন কাজে আসবে বলে কিছুতেই মনে হল না। আবার বিছানার উপর বসে দু'হাতে মাথাটা ধরে বসে আপনার মনে বললাম, 'না! তাও ত হয় না, চুরুটের কারখানা বা উপনিবেশ কিছুই ত এ শব্দের দ্বারা বোঝায় না! যদি ও শব্দটার অর্থ অত সোজাই হবে, তাহলে অনেক আগেই তার অর্থ ঠিক করিত পারতাম। না; শব্দটার মানে কোন একটা আধ্যাত্মিক অবস্থা, একটা অনুভূতিই হবে হয় ত। এর অর্থ নিরূপণ করতে কি পারব না?'—তাই এর কোন একটা আধ্যাত্মিক মানে বার করবার জন্য গভীর ভাবে

চিন্তা করতে আরম্ভ করে দিলাম। আমার মনে হল, কেউ যেন চিন্তার মাঝখানে এসে আমায় বাধা দিচ্চে। রেগে গিয়ে বলে উঠলাম, 'রক্ষা কর বাবা, তোমার মত ছোটলোক ত আর কাউকে দেখি নি। না, সত্যিই দেখি নি। ... চরকা কাটা ?—গোল্লায় যাও তুমি!' সত্যিই আমাকে হাসতে হল। আচ্ছা এ শব্দটার মানে চরকা কাটা হবে কেন, বিশেষত আমার যখন তাতে এতটুকু মত নেই? শব্দটা আমি নিজে আবিষ্কার করেচি, সুতারাং এর মানে ঠিক করার আধিকার পূরোপূরি আমারই এক্তিয়ার মধ্যে, যা খুশী মানে আমি ঠিক করতে পারি, এতে অন্যের হাত দেবার ত কিছুমাত্র অধিকার নেই। আমার যতদূর মনে পড়ে তাতে আমি ত কোন মতামত এখনো প্রকাশ করে নি ...

কিন্তু মাথাটা ক্রমেই গুলিয়ে গেল। হঠাৎ বিছানা ছেড়ে জলের কলটা দেখবার জন্যে লাফ দিয়ে উঠে পড়লাম। তৃষ্ণা পায় নি বটে কিন্তু মাথাটা ভারী গরম হয়ে পড়েছিল এবং আপনা-থেকেই জলের প্রয়োজন অনুভব করলাম। খানিকটা জল পান করে আবার গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। এবং এ-বারে ঘুমিয়ে পড়বার জন্যে একান্ত মনোনিবেশ করলাম। চোখ বুজে চুপ করে থাকতে নিজেকে বাধ্য করলাম। না-নড়েচড়ে কয়েক মিনিট চুপ করে থাকলাম কিন্তু ঘামিয়ে উঠলাম এবং শিরায়

বুভুক্ষা

শিরায় তীব্র রক্তস্রোত টগবগ করে বইচে অনুভব করলাম। সত্যি, লোকটা ঠোঙাটার মধ্যে যে টাকা পাবে বলে মনে করেছিল সেটা নেহাতই অভিনব উপায় সন্দেহ নেই! ও আবার একবার কেশেও ছিল। ও কি এখনো সেই পথেই পাইচারী করচে? সেই বেঞ্চিখানায়ই বসে আছে কি?—দূরে সেই উদার সুনীল সাগর ... সেই জাহাজগুলি সারি সারি ...

চোখ মেললাম। ঘুম যখন আসতেই চাইচে না, তখন চোখ বুজে থাকি কি করে? অন্ধকার আবার আমায় উত্যক্ত করে তুললে। সেই অতলস্পর্শ কৃষ্ণ যবনিকা, সেই যুগযুগান্ত ধরে যার সীমানির্দ্দেশ করবার জন্যে আমার চিন্তা প্রাণপণ চেষ্টা করেও সফল হতে পারে নি! এই অন্ধকারকে বুঝাবার জন্যে, অন্ধকারের একটি প্রতিশব্দ খুঁজে বার করবার কি চেষ্টাই না করলাম; এমন ভীষণ অন্ধকার প্রকাশক একটা শব্দ যা মুখে উচ্চারণ করতেই মুখ পর্য্যন্ত কালো হয়ে যায়! কী সাংঘাতিক অন্ধকারই না এ! সঙ্গে সঙ্গেই আমার চিন্তার সূত্র সাগর ও যে-অন্ধকার দানবটা সেখানে আমার প্রতীক্ষায় রয়েচে তার পানে ধেয়ে গেল। তারা যেন আমায় তাদের দিকে আকর্ষণ করে নিবে এবং হাতে পায়ে শক্ত করে বেঁধে আমায় এমন এক অন্ধকারের রাজ্যে নিয়ে যাবে, সে রকম অন্ধকার কেউ কখনো দেখে নি। মনে হল, আমায় যেন জলের

মধ্যে দিয়ে টেনে নিয়েই যাচ্চে, বেশ বুঝতে পাচ্চি। ডুবতে ডুবতে দেখতে পেলাম চারদিকে বিরাট মেঘপুঞ্জ ছড়িয়ে রয়েচে।

বিছানাটা শক্ত করে চেপে ধরে ভয়ে চীৎকার করে উঠলাম—আমি যেন একান্ত বিপন্ন হয়েই পড়েচি, জীবনের যেন আর কোনই আশা নেই। খাটিয়ার কাঠের পায়ায় হাত ঠুকতেই বুঝতে পারলাম, 'এবারে জবর বাঁচা বেঁচে গেছি!' আপনার মনে এই কথা আওড়ালাম, এই রকম করেই কি লোক মারা যায়! এখন মর তুমি!—খানিকক্ষণ অমনি পড়ে রইলাম এবং আমি যে মরতে বসেচি সে কথাই ভাবতে লাগলাম।

পরে হঠাৎ বিছানার উপর উঠে বসে পরুষকণ্ঠে শুধোলাম, 'যে শব্দটা আমি নিজে আবিষ্কার করেচি, তার কি মানে হবে তা স্থির করার অধিকার কি আমার নিজের হাতে নেই! ...' আমি যে প্রলাপ বকচি নিজেই তা স্পষ্ট বুঝতে পাচ্ছিলাম; এই যে কথা বলচি তা এখনো শুনতে পাই। আমার এই উন্মত্ততা দৌর্ব্বল্য থেকে এসেছিল এবং জ্ঞান একেবারে হারাই নি। হঠাৎ আমার মনে হল যে, আমি পাগল হয়ে গেছি। ভয় পেয়ে আবার আমি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। এবং দরজা খোলবার জন্যে টলতে টলতে এগিয়ে গেলাম এবং বার কয়েক দেয়ালে মাথা ঠুকলামও। চীৎকার করে হাতের আঙুল কামড়ালাম এবং গালাগালি ...

চারদিক নিস্তব্ধ নীরব ; কেবল দেয়ালে আমার স্বর প্রতি-ধ্বনিত হয়ে ফিরতে লাগল। মেঝের উপর পড়ে গেলাম, ঘরের মধ্যে আর নিজেকে আটকে রাখতে পারছিলাম না।

সেখানে শুয়ে আমার চোখের সামনে দেয়ালের গায়ে ধূসরবর্ণ চারকোণ একটা ছায়া দেখতে পেলাম—সম্ভবত দিনের আলো। এটা যে দিনের আলো সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, প্রতিলোমকূপে তা অনুভব করছিলাম। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম! মেজের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লাম এবং বাঞ্ছিত দিনের, আলো দেখতে পেয়ে আনন্দের আতিশয্যে চীৎকার করে উঠলাম। কৃতজ্ঞতায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম এবং টলতে টলতে পাগলের মত জানলার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। এবং সেই মুহূর্ত্তে আমি কি করচি সে বিষয়ে একান্ত সজ্ঞান ছিলাম। আমার সকল অবসাদ বিদূরিত হল; নিরাশা ও ব্যথা সবই দূর হল এবং সেই মুহূর্ত্তে আমার সকল আশা আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ হল। হাত জোড় করে মেঝের উপর বসে উষার জন্যে সাগ্রহ প্রতীক্ষায় রইলাম।

কী রাত্রিই না কাটালাম!

তারা কি কোনই গোলমালই শুনতে পায় নি! অবাক হয়ে এই কথাই শুধু ভাবলাম। আমি ছিলাম ভদ্রলোকদের শ্রেণীতে, সাধারণ অপরাধীদের চেয়ে উঁচু শ্রেণীতে। আমি ত আর যে সে লোক নই! ঘর-হারা মন্ত্রীমশাই আর কি!

বুভুক্ষা

মনটা তখন অনেকটা শান্ত। দেয়ালের যেখানটায় চারকোণ আলোটা ক্রমেই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছিল সেই দিকে চেয়ে ছিলাম। আমি যেন সত্যিই মন্ত্রীমশাই, আর আমার নাম ফন ট্যানজেন, আমার বক্তৃতা লাল ফিতে দিয়ে ফাইল করে রাখা হয়। আমার খেয়াল তখনো কমে নি, তবে স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতা অনেকটা কমেচে। যদি ভুল করে পকেট-বইখানা বাড়ীতে ফেলে না আসতাম, তাহলে আজ মন্ত্রীমশাইর মত আমার চমৎকার বিছানাখানা খালি থাকত নিশ্চয়! যথাসম্ভব গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে হেলতে দুলতে গিয়ে সেই খাটিয়ার উপর শুয়ে পড়লাম।

ইতিমধ্যে ঘরে যথেষ্ট আলো এসে পড়েচে, ঘরের সব কিছু অনেকটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম, এমন কি দরজার হাতলটা পর্য্যন্ত নজরে এল। যে নিকষ কালো ঘন অন্ধকার সারারাত আমায় উত্যক্ত করে তুলেছিল, এবং নিজেকেও যেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারে দেখতে পাই নি এখন তা দূর হয়েচে; রক্তও অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে আসচে, চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়লাম।

দরজায় শব্দ হতেই জেগে উঠলাম। তাড়াতাড়ি কাপড় জামা পরে বাইরে এলাম। রাত্তিরের সেই ভিজে জামা-কাপড় তখনো সেই অবস্থায়ই ছিল।

কন্সটবল বললে, 'নীচে গিয়ে বড়সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে হবে।'

তবে কি এখনো অনেক আনুষ্ঠানিক ব্যাপার আছে নাকি? ভয়ে ভয়ে ভাবলাম।

নীচে একটা প্রকাণ্ড হল-ঘরে গিয়ে পৌঁছুলাম। সেই ঘরে আমার মত ত্রিশ চল্লিশ জন ঘর-হারা বসে ছিল। তাদের একে একে নাম ধরে ডাকা হচ্ছিল এবং তাদের সকলকে জল খাবারের টিকেট বিলি করা হচ্ছিল। বড়সাহেব বারে বারে পাশের কন্সট্বলকে বলছিলেন, 'সকলেই টিকেট পাচ্চে ত? ওদের প্রত্যেককে টিকেট দিতে ভুল করো না যেন। ওদের চেহারা দেখেই মনে হচ্ছে যে, ওদের ভারী ক্ষিদা পেয়েচে!'

আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই টিকেট দেওয়া দেখছিলাম। আমারও ইচ্ছা হল, আমায় যদি একখানা টিকেট দেয়।

'য়্যান্দ্রিয়াস ট্যানজেন—লেখক।'

মাথা নীচু করে এগিয়ে গেলাম।

'মশাই, আপনি কি করে এখানে এলেন?'

আমি সমস্ত ঘটনা বলে গেলাম। কাল রাত্তিরে যা বলেছিলাম, এখনো তাই পুনরাবৃত্তি করলাম মাত্র, মিথ্যা বলতে এতটুকু জড়িয়ে গেল না, সরল ভাবে স্রেফ বানানো কাহিনী বলে গেলাম—'রাত্তির বেলা বেরিয়েছিলাম, দেরী হয়ে গেল, দুর্ভাগ্য ... কাফিখানায় ... ঘরের চাবি হারিয়ে ফেলেচি ...

বড়সাহেব হেসে বলল, 'হুঁ, তাই নাকি! রাত্তিরে ভাল ঘুম হয়েছিল ত?'

আমি জবাব দিলাম, 'নিশ্চয়ই, একেবারে নবাব পুত্তুরের মত ঘুমিয়েচি।'

সে বললে, 'শুনে খুশী হলাম।' এই বলে সে উঠে দাঁড়িয়ে আমায় অভিবাদন করলে।

আমি চলে এলাম!

টিকেট! আমায় একখানা টিকেট দিলে না! তিন দিন তিন রাত্তির কিছুই খাই নি। একখানা রুটি! কিন্তু কেউ ত আমায় একখানা টিকেট দিলে না এবং নিজেও চাইতে সাহস পেলাম না। কেননা তাহলে তৎক্ষণাৎ ওদের মনে সন্দেহ জেগে উঠবে। আর তাহলেই গোপনে সব কিছু আমার জেনে আমার সত্যিকারের পরিচয় জেনে ফেলবে। মিথ্যা বলার জন্য ওরা আমায় চালান দিতে পারে; কাজেই মাথা উঁচু করে পকেটে হাতে ঢুকিয়ে দস্তুর মত গ্রামভারী চালে ফাঁড়ি ছেড়ে এলাম।

সূর্য্য উঠেচে। আকাশ খুব পরিষ্কার। বেলা দশটা হয়ে গেছে। রাস্তায় লোকের ভিড় আরম্ভ হয়ে গেছে। কোন্ দিকে যাই? পকেট বাজিয়ে লেখাটা ঠিক আছে কিনা দেখলাম। বেলা এগারটার সময় সম্পাদক মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

বুভুক্ষা

রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ লোক চলাচল দেখলাম। ইত্যবসরে জামা-কাপড় অনেকটা যেন শুকিয়ে আসছিল। এবার ক্ষুধা দারুণ হয়েই দেখা দিল, নাড়িভুঁড়ি সবই যেন হজম হয়ে আসচে।

আচ্ছা, এমন একজন বন্ধু, চেনা লোকও কি নেই আমার, যার কাছে দু'চার আনা চাইতে পারি? স্মৃতির পাতা ওলট-পালট করে দেখলাম কিন্তু চারটে পয়সা চাইলে পেতে পারি এমন কাউকে পেলাম না।

সে যাই হোক গে, দিনটা কিন্তু ভারী চমৎকার! উজ্জ্বল সূর্য্যালোক, চারদিকেই বেশ গরম। পাহাড়ের উপর দিয়ে আকাশটাকে দেখাচ্চে যেন একটা নীল সমুদ্রের মত।

অজ্ঞাতসারেই বাড়ীর দিকে চলেচি। ক্ষিদে আমাকে যেন খেয়ে ফেলছিল। রাস্তায় একটুকরা কাঠ কুড়িয়ে পেলাম, তাই চিবোতে শুরু করে দিলাম। এতে একটু আরাম পেলাম। এত শীগগিরই যে আমায় ক্ষিদের জ্বালায় কাঠের টুকরা চিবোতে হবে তা কিন্তু ভাবি নি! ঘরের দরজা খোলাই ছিল; আস্তাবলের ছোকরাটা যথারীতি আমায় অভিবাদন করলে।

সে বললে, 'আজকের দিনটা ভারী চমৎকার!'

আমি জবাব দিলাম, 'হুঁ।'

এর বেশী কিছু বলবার মত পেলাম না। ওর কাছেই কি

বুভুক্ষা

একটা টাকা ধার চাইব? ওর কাছে যদি থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই দিবে; বিশেষত একবার ওকে একখানা চিঠিও ত লিখে দিয়েচি।

ছেলেটা আমার সঙ্গে কথা বলবার পূর্ব্বে সামনে এসে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ কি ভেবে নিলে।

'দিনটা চমৎকার!... আজকে আমায় ঘর ভাড়া দিতে হবে। অথচ হাতে টাকা নেই, তিনটে টাকা ধার দিতে পারেন? দিন কয়েক বাদেই দিতে পারব। আর একবার আপনি আমার যথেষ্ট উপকার করেছিলেন, সত্যি বড় উপকার হয়েছিল।'

আমি জবাব দিলাম, 'কিন্তু আমার পক্ষে ত এখনই টাকা দেওয়া সম্ভব হবে না ভাই, বিকেল পর্য্যন্ত হয় ত দিতে পারব।' টলতে টলতে সিঁড়ি বেয়ে নিজের ঘরে এগিয়ে চললাম।

বিছানার উপর গিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ে হেসে উঠলাম। ভাগ্যে ছেলেটা আগেই তার অভাব আমায় জানালে; মানটা রইল! তিনটে টাকা! তুমি সুখী হও ছোকরা! তিন হাজার টাকা চাইলেও এই জবাবই পেতে হত।

এবং এই তিনটে টাকার কথা মনে করে আমার হাসি পেল। জোরে হেসে উঠলাম। নিজেই না আজ কপর্দ্দকহীন, তিনটে টাকা! আহ্লাদটা যেনে বেড়ে গেল। এবং তাতে বাধা দিলাম না, উঃ! রান্নার কি বিশ্রী গন্ধ আসচে এখানে—চপ, কাটলেটের

বুভুক্ষা

গন্ধ কি ভয়ানক বিশ্রী! ছ্যাঃ! উঠে গিয়ে তখ্খুনি জানলাটা খুলে দিলাম—এই জঘন্য গন্ধটা যেন বাতাসের সঙ্গে বাইরে চলে যায়।

'বয়, আরো এক প্লেট মাংস এনে দাও!' টেবিলের দিকে তাকালাম- আমার এই অধম জীর্ণ টেবিলটা, লিখবার সময় হাঁটু দিয়ে ঠেকো দিতে হয়, একটা পা তার নেই—মাথা নুইয়ে বললাম, 'এক পাত্র মদ দেব? না? আমি মিঃ ট্যানজেন—মন্ত্রী ট্যানজেন। দুঃখের বিষয়—একটু দেরী হয়ে ছিল ঘরে ফিরতে ... দরজার চাবি ...'

আবার আমার চিন্তা চারদিকের নানা জটিল বিষয়ে জড়িয়ে গেল, রাশ বাগাতে পারলাম না। তবে এ জ্ঞান আমার সব সময়ই ছিল যে, আমি যা-তা বকে যাচ্চি। তবু প্রত্যেকটি কথা শুনে বুঝে তবে তার জবাব দিয়েচি। নিজেই নিজেকে বললাম, 'আবার তুমি যা-তা বকচ।' কিন্তু তবু আত্মসংবরণ করতে পারছিলাম না। এ যেন জেগে ঘুমানো, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কথা বলা।

মাথাটা বেশ চঞ্চল, তবু কিন্তু ব্যথা বেদনা কিছুই ছিল না। মেজাজটাও বেশ পরিষ্কার। খেয়ালের মুখে আমি ভেসে যাচ্ছিলাম, নিষ্কৃতি পাবার কোন চেষ্টাই করতে পারলাম না।

"ভিতরে এসো! হাঁ, সোজা ভিতরে এসো! যা-সব দেখচ সবই দামী হীরামুক্তার তৈরী—ল্যাজালি, ল্যাজালি! সেই

বুভুক্ষা

বৃহৎ প্রাসাদে সুকোমল শয্যা ! কি অনুরাগের সঙ্গে সে নিঃশ্বাস ফেলচে। প্রেয়সী আমার, চুম্বন দাও—আরো—আরো ! তোমার বাহুযুগল ম্লান তৃণমণির মত, অনুরাগে তোমার মুখ আরক্তিম হয় ... ছোক্‌রা, তোমায় না মাংস দিতে বললাম ! ...'

সূর্য্যালোক জানলার মধ্যে দিয়ে ঘরে বিকীর্ণ হচ্ছিল এবং নীচে আস্তাবলে ঘোড়াগুলির ছোলা চিবোনোর শব্দও শুনতে পাচ্ছিলাম। বসে বসে আপনার মনে পরমানন্দে সেই কাঠের কুচোটা চিবোচ্ছিলাম—প্রাণে তখন শিশুর অহেতুক খুশী।

লেখাটার কথা কিন্তু সব সময়েই আমার মনে জাগরূক ছিল। আসলে পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে আমি কিছু ভাবি নি বটে কিন্তু ওটা যেন আমার স্বভাবে আমার দেহের সকল রক্তবিন্দুর সাথে মিশে আছে যে, পাণ্ডুলিপির কথা যে আমি কিছুতেই মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারি নে। সেটা পকেট থেকে বার করলাম।

লেখাটা ভিজে গেছল; আস্তে আস্তে সাবধানতার সঙ্গে ভাঁজ খুলে রোদে শুকোতে দিলাম। ঘরের মধ্যেই পাইচারী করতে আরম্ভ করে দিলাম। চারদিকের সবকিছুই যেন বিষণ্ণ মলিন। ছোট ছোট টিনের অনাবশ্যক টুক্‌রাগুলি ইতস্তত সারা মেঝেময় ছড়িয়ে আছে। ঘরে বসবার একখানা চেয়ার নেই,

এমন কি দেয়ালের গায়ে একটা পেরেকও নেই। সবকিছুই একে একে বাঁধা দিয়ে খেয়ে বসেচি। খান কয়েক কাগজ টেবিলের উপর পড়ে আছে, তার উপর আধ ইঞ্চি পুরো ধুলো জমে আছে ; এই হচ্ছে আমার বর্ত্তমানের একমাত্র সম্পদ। বিছানায় যে পুড়োনো সবুজ কম্বলখানা রয়েচে, তা মাস কয়েক আগে হ্যান্স পলীর কাছে থেকে ধার নিয়েছিলাম। ... হ্যান্স পলী! হাতের আঙুলগুলি মটকালাম। হ্যান্স পলী পেটারশন আমায় সাহায্য করবে! তার কাছে আগেই চাই নি বলে সে নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হবে। মাথায় তথ্খুনি টুপিটি চড়িয়ে লেখাটা কুড়িয়ে নিয়ে পকেটে পূরে নীচে গেলাম।

অন্তরালে গিয়ে ছোকরাকে ডেকে বললাম, 'শোন, বিকেলে তোমায় হয় ত কিছু দিতে পারব।'

টাউন হলে পৌছে দেখতে পেলাম যে, এগারটা বেজে গেছে এবং তথ্খুনি সম্পাদকের কাছে যাব ঠিক করলাম। অফিসের বাইরে দাঁড়িয়ে লেখাটার পত্রাঙ্ক ঠিক আছে কিনা ও যেখানে কাগজগুলি ঘোঁচ লেগে গেছে সেখানটা ঠিক করে পকেটে রেখে দিলাম। এবং দরজায় গিয়ে কড়া নাড়লাম। ঘরে ঢুকবার সময় আমার বুকটা দপ্দপ্ করে শব্দ হচ্ছিল।

সম্পাদকের সহকারী কাজ করচে। সন্ত্রস্ততার সুরে সম্পাদক মশাইর খবর জিজ্ঞাসা করলাম। জবাব পেলাম না

কিছু। লোকটা মফঃস্বলের কাগজ থেকে ছোটখাট সব খবর কেটে কেটে নিচ্ছিল।

আরো একটু এগিয়ে গিয়ে ফের জিজ্ঞাসা করলাম। এবারে সে জবাব দিল, 'তিনি এখনো আসেন নি।'—মুখ তুলে তাকাল না পর্য্যন্ত।

তিনি তাহলে কখন আসবেন?

'কখন আসবেন্ তা বলতে পারি নে, কিছু ঠিক নেই।'

অফিস কতক্ষণ খোলা থাকবে?

এ প্রশ্নের কোন জবাবই আর পেলাম না, কাজেই বাধ্য হয়ে চলে এলাম। সহকারী মশাই এর মধ্যে একবারও আমার দিকে চেয়ে জবাব দেবার ফুরসৎ পেলে না। সে আমার গলার স্বর শুনতে পেয়েই আমাকে চিনতে পেরেছিল। আপনার মনে ভাবলাম, 'কি অসময়েই তুমি এসেচ এখানে যে, লোকটা তোমার কথার জবাব দেবার কষ্টটুকু পর্য্যন্ত স্বীকার করলে না। সম্পাদকদের এই রীতি! যেদিন থেকে আমার সেই চমৎকার গল্পটা এঁদের কাগজে বার হয়েছিল, তারপর থেকে প্রায় প্রতিদিনই আমার কত অবাঞ্ছিত লেখা নিয়েই না এঁদের বিরক্ত করেচি, আর প্রতিবারেই তাঁরা লেখা ফেরত দিতে বাধ্য হয়েছেন। হয় ত তিনি আর আমার লেখা চান না, তাই এই ব্যবস্থা ... রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম।

বুভুক্ষা

পেটারশন চাষীর ছেলে, এখানে পড়াশুনা করে, এক পাঁচতলা বাড়ীর চিলকোঠায় থাকে; সুতারং সে যে গরীব সে বিষয়ে কারুরই সন্দেহ হবার কথা নয়। কিন্তু তাহলেও তার কাছে যদি একটা টাকাও থাকে, সে আমায় ফেরাবে না। তার কাছে টাকা থাকাও যা, আমার নিজের পকেটে থাকাও তাই। তাই পথ চলতে চলতে এই কথাটা ভেবেই আমি পরিতৃপ্ত ছিলাম যে, তার কাছে একটা টাকা থাকলে নিশ্চয়ই সেটি আমি পাবই।

পেটারশন যে বাড়ীতে থাকে সে বাড়ীর সদরে এসে দেখলাম, ভিতর থেকে দরজা বন্ধ; তাই কড়া নাড়লাম।

একটি স্ত্রীলোক এসে দরজা খুলে দিতেই ভিতরে ঢুকতে গিয়ে বললাম, 'আমি পেটারশনকে চাই, পড়ুয়া পেটারশন। তার ঘর আমি জানি।'

স্ত্রীলোকটি জবাব দিলেন, 'যিনি চিল-কোঠায় থাকতেন? তিনি ত আজকাল এখানে থাকেন না। এ বাড়ী ছেড়ে গেছেন।'

স্ত্রীলোকটি তার নতুন ঠিকানা জানে না; তবে পেটারশন বলে গেছে যে, তার চিঠিপত্র সব অমুক জায়গায় পাঠাতে হবে। তাই সে আমায় সেই ঠিকানাই দিলে।

আমি একান্ত নির্ভরতা নিয়ে সারাটা পথ চলে তার সে নতুন ঠিকানায় গিয়ে পৌঁছুলাম। এখানে তাকে না পেলে আর

কোথাও কিছুমাত্র আশা নেই। পথে একটা সদ্য তৈরী বাড়ীর সদরে জনকয়েক ছুতার মিস্ত্রি দাঁড়িয়ে কি করছিল দেখতে পেলাম। এক পাশেই কাঠের অনাবশ্যক টুক্‌রা-টাক্‌রার স্তূপ পড়ে আছে, তার থেকে একটি কুচো তুলে নিয়ে মুখে পূরে দিলাম, আর একটি পকেটে নিলাম, পরে কাজ দেখবে। আবার চলতে শুরু করে দিলাম।

ক্ষিদের জ্বালায় আমি আর্ত্তনাদ করে উঠলাম। এক রুটিওয়ালার দোকানে এক আনা দামের বড় বড় রুটি সব সাজান রয়েচে দেখতে পেলাম। এক আনায় এর চাইতে বড় রুটি কোথাও পাওয়া যায় না।

'আমি ছাত্র পেটার্‌শনের ঠিকানা চাচ্চি।'

'দশ নম্বর বার্‌নুট্‌ সকার্স ষ্ট্রীটে সে থাকে, চিলকোঠায়।'

সেখানেও যাব? তাহলে পেটার্‌শনের নামের কোন চিঠিপত্তর থাকলে ত অনায়াসে নিয়ে যেতে পারি।

সেই পথে পুনরায় শ্রান্ত ক্লান্ত ভাবে এগিয়ে চললাম। পথে সে ছুতার মিস্ত্রির দল তখনো বসে দিব্য আরামের সঙ্গে খাবার খাচ্চে। রুটিওয়ালার দোকানের সেই রুটিগুলা তখনো ঠিক তেমনি ভাবেই সাজান রয়েচে। অনেকটা পথ এগিয়ে গিয়ে বন্ধু যে রাস্তায় থাকে সেই রাস্তায় পৌঁছুলাম, তখন ক্ষুধাতৃষ্ণায় ও ক্লান্তিতে আমি একান্ত অবসন্ন। দরজা খোলাই ছিল, এক

লাফে দু'তিন ধাপ পার হয়ে গিয়ে চিলছাতে পৌঁছুলাম। আমায় দেখেই যেন পেটারৃশন খুশী হয়ে যায় এই মতলবে পকেট থেকে তার নামের চিঠিগুলি বার করে নিলাম।

আমার অবস্থার কথা শুনে সে যে আমায় সাহায্য করতে কুণ্ঠিত হবে না, সে বিষয়ে আমার নিশ্চিন্ত বিশ্বাস ছিল। না, কিছুতেই সে আমায় ফেরাবে না; তার মেজাজ খুব দরাজ, এ কথা ত বহুবার আমি বলেচি।... দরজার একপাশে তার নাম লেখা একখানা কাগজ ঝুলছিল, তাতে লেখা আছে—সে দেশে গেছে।

শ্রান্তিতে ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে সেই মাটীর উপরই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম। তখন আর আমার নড়বার চড়বার শক্তিটুকু পর্য্যন্ত ছিল না। বার কয়েক আপনার মনে আওড়ালাম, 'দেশে গেছে—দেশে গেছে।' তারপর একেবারে চুপমেরে গেলাম। চোখে এক বিন্দু জল নেই, কোন রকম অনুভূতিই আর ছিল না তখন। কি করা উচিত সে বিষয়ে কিছু ঠিক না করে হাঁ করে তাকিয়ে বসে রইলাম, হাতে পেটারৃশনের চিঠিগুলি, মিনিট দশ কেটে গেল—বিশ মিনিট কি তারও বেশী পেরিয়ে গেল। সেই খানটাতেই নিশ্চল পাথরের মত বসে ছিলাম, আঙুলটি পর্য্যন্ত নড়ে নি। তখন আমার দস্তুর মত নির্ব্বেদ অবস্থা। অনেক্ষণ বাদে সিঁড়ি বেয়ে কে আসচে শুনতে পেলাম।

বুভুক্ষা

'আমি পেটারশনের কাছে এসেছিলাম। তার নামে দুখানা চিঠি আছে ...'

যিনি এলেন তিনি একজন স্ত্রীলোক। বললেন, 'তিনি ত ছুটীতে বাড়ী গেছেন। তাঁর চিঠি ইচ্ছে হলে আমার কাছে রেখে যেতে পারেন।'

আমি জবাব দিলাম, 'বেশ ত, তাই ভালো। এলেই ত আপনার কাছ থেকে চিঠিগুলি পাবে সে। চিঠিগুলি জরুরীও হতে পারে। ... নমস্কার!'

বাড়ীর বাইরে এসে এক জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে হাত মুঠো করে চীৎকার করে বলে উঠলাম, 'লোকে তোমায় সর্ব্বশক্তিমান বলে। আমি বলি তারা বোকা,—তুমি একটি নিরেট!' এবং দাঁতে দাঁত ঘষে আকাশের দিকে চেয়ে প্রচণ্ডভাবে মাথা নাড়লাম; 'তুমি খাঁটি নিরেট, এ কথা জোর করে বলতে পারি।'

কয়েক পা এগিয়ে গিয়েই আবার থমকে দাঁড়ালাম! সহসা আমার মনোভাব বদলে গেল। হাত জোড় করে বিনীতভাবে বলে উঠলাম, 'তাঁর কাছে তোমার আবেদন জানিয়েচ বাছা?'

কথাটা ঠিক শোনাল না!

আবার বলে উঠলাম, 'তাঁকে প্রার্থনা জানিয়েচ?' সঙ্গে সঙ্গেই মাথাটা নীচু হয়ে এল এবং সুর নরম করে জবাব দিলাম, 'না!'

এটাও ঠিক শোনাল না।

হ্যাঁরে নির্ব্বোধ কোথাকার! ভণ্ডাম ত চলবে না তোর! হ্যাঁ, এ কথা বলা উচিত যে, আমি পরমপিতা পরমেশ্বরের কাছে আমার প্রার্থনা জানিয়েচি। এবং সে প্রার্থনায় নম্রতা ও আন্তরিকতা থাকা চাই, তবে ত তাঁর দয়া হবে! কিন্তু খামকাই তাঁকে দোষ দিলে ত চলবে না। তবে ত আর রক্ষা পাওয়া যাবে না! তখনই আমি হাঁটুগেড়ে সেই মাঝ-পথে প্রার্থনা করতে বসে গেলাম। রাস্তার লোকগুলি অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে চেয়ে যাচ্ছিল।

আমার পকেটে যে কাঠের কুচো ছিল তাই অবিরাম চিবোতে চিবোতে এগিয়ে চললাম, চলার গতিবেগ আমার কমেও নি বাড়েও নি, অথচ কোন দিকে খেয়ালও ছিল না। খেয়াল যখন হল তখন দেখি রেলওয়ে স্কোয়ারের সামনে এসে পৌঁছেচি। গীর্জার ঘড়িতে তখন দেড়টা বেজে গেছে। একটু থেমে দাঁড়িয়ে ভেবে নিলাম। কপালে অস্পষ্ট ঘাম দেখা দিল এবং তা চোখের পাতা বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। নিজেই নিজেকে বললাম, 'আমার সঙ্গে পুল পর্য্যন্ত যেতে পারবে ?'

মাথা নীচু করে একবার নিজেকে নমস্কার করলাম এবং জেটীর কাছে রেল-পুলের দিকে এগিয়ে চললাম।

সেখানে জাহাজগুলি ভিড় করে রয়েচে। সূর্য্যের কিরণে

সাগরের নীল জল দুলচে। সর্ব্বত্র একটা হৈ চৈ ও ছুটাছুটির সাড়া পড়ে গেছে, মাঝে মাঝে জাহাজের সিটির শব্দ পাওয়া যাচ্চে, কুলিরা বড় বড় মোটগুলি ওঠাতে নামাতে ব্যস্ত, চারদিকে হাঁকডাকের সীমা নেই। আমার পাশেই এক বুড়ী কেক্-বিস্কুট বিক্রী করবার জন্যে একান্ত যত্নের সঙ্গে পরিপাটি করে পণ্যদ্রব্য সাজাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তার সামনে একটি পুচকে টেবিলে নানারকম জিনিষ থরে থরে সাজান রয়েচে। স্ত্রীলোকটা তার কেক্-বিস্কুটের গন্ধে সারা পোস্তাটা ভরে তুলেচে। ছ্যাঃ! এ সব জঘন্য খাদ্য ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া উচিত!

আমার পাশে-বসা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ জুড়ে দিলাম। এখানে সেখানে এ সব বিশ্রী কেক-বিস্কুট বিক্রী করার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ জানালাম। যুক্তির উপযোগিতা তাঁকে স্বীকার করতেই হবে। ... কিন্তু আমার এ অভিযোগের ভিতর গলদ আছে বলেই যেন ভদ্রলোক মনে করলেন। এবং কথা শেষ করতে না দিয়েই তিনি স্থান ত্যাগ করে গেলেন। তাঁকে তাঁর ভুল বুঝিয়ে দিতে সংকল্প করে আমিও উঠে তাঁর পিছু নিলাম।

বললাম, 'স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে দেখলেও ...' বলেই তাঁর কাঁধে চাপড় দিলাম।

লোকটি চম্‌কে উঠে আমার দিকে সভয়ে চেয়ে জবাব দিলেন,

'মাপ করুন আমায়, আমি এখানে নতুন এসেচি, এখানকার হালচাল সম্বন্ধে আমার কিচ্ছু জানা নেই।'

'ওঃ তাহলে ত সে আলাদা কথা।' কথা আর এগুলো না।... আমি কি ওঁর কোন কাজে আসতে পারি নে? অন্তত শহরটাও ত ঘুরিয়ে দেখাতে পারি। তাই নয় কি? ওঁর সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে আমার আনন্দই হবে, আর আমার সঙ্গে বেরুলে ওঁর খরচও কিছু নেই।...

কিন্তু লোকটি যেন শুদ্ধ আমার হাত থেকে পরিত্রাণ পেতেই চান। তাই তিনি এখান থেকেও চট্‌পট্‌ সরে পড়লেন।

আমি ফের গিয়ে বেঞ্চিখানায় বসে পড়লাম। ভয়ঙ্কর ভাবে উত্যক্ত হয়ে পড়েছিলাম। দূরে নারীকণ্ঠে কে গান গাইছিল, তার সে করুণ সুর আমার দেহের সমস্ত শিরা-উপশিরায় একটা তীব্র রক্তস্রোত বইয়ে দিলে। আমার প্রতি ধমনীতেও যেন এই বিষাদ সুরই প্রতিধ্বনিত হচ্চে। মুহূর্ত্তকাল পরেই আমি বেঞ্চিতে কায়েম হয়ে বসে পড়ে গানের সঙ্গে সুর মেলাতে আরম্ভ করে দিলাম। উদ্গত কান্নার বেগ কিছুতেই থামাতে পারছিলাম না।

যখন কেউ না-খেয়ে মরতে বসে তখন তার মর্জ্জি যে কত দিকে কত ভাবে ছড়িয়ে পড়ে তা বলা শক্ত। গানের সুরে সমান তাল দিতে লাগলাম, সুরে যেন নিজেকে মিশিয়ে ফেললাম,

এবং মনে হল যেন সুরের সঙ্গে তালে তালে শূন্যে উড়ে বেড়াতে লাগলাম। আমার সারা অন্তরটা আনন্দে নেচে উঠল। ...

মেয়েটি এসে আমার কাছে দুটো পয়সা চাইলে। 'দুটো পয়সা দাও বাবু!'

না ভেবে চিন্তে জবাব দিলাম, 'হাঁ, দিচ্চি, দাঁড়াও।' উঠে দাঁড়িয়ে এ-পকেট সে-পকেট একান্ত মনোযোগের সঙ্গে আঁতি পাঁতি করে খুঁজে দেখলাম, মেয়েটি কিন্তু মনে করল, তাকে নিয়ে আমি রহস্য করলাম মাত্র। এবং একটি কথাও না বলে সে সেখান থেকে দূরে সরে গেল।

তার সে নীরব সহিষ্ণুতা আমায় একেবারে পেয়ে বসল। সে যদি আমায় গালাগালি দিত ত বরং সহ্য করা সম্ভব হত। তাকে দুটো পয়সা দিতে না-পারার দুঃখ কষ্ট আমায় যেন বিঁধতে লাগল। আমি তাকে ডেকে বললাম, 'এখন আমার কাছে একটা পয়সাও নেই; তবে তোমার কথা আমি ভুলব না, হয় ত কালই তোমায় কিছু দিতে পারব। তোমার নাম কি? ... বেশ, বেশ, সুন্দর নাম; আমি ভুলব না তোমার কথা। তবে কাল আবার দেখা হবে।...'

আমি ঠিক বুঝতে পারলাম সে আমার কথা বিশ্বাস করল না, অবশ্য সে একটি কথাও কইল না; দুঃখেকষ্টে কেঁদে ফেললাম, একটা রাস্তার কুলটারও আমার উপর বিশ্বাস নেই!

আবার তাকে ডাকলাম এবং সে আসতেই কোটটা আমার গা থেকে টেনে খুলে ফেলে তাকে ওয়েষ্ট-কোটটা দিতে যাচ্ছিলাম। তাকে বললাম, 'ক্ষতিপূরণ করব, একটু সবুর কর।' কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার ত ওয়েষ্ট-কোট নেই, সেটা ত বাঁধা রেখেছি! কয় সপ্তাহ আগেই ত ওটা আর আমার হাত ছাড়া হয়ে গেছে। আমার কি হয়েচে? মেয়েটি আমার ব্যবহারে একেবারে অবাক হয়ে গিয়েছিল। সে আর কিছুমাত্র অপেক্ষা না করে সভয়ে আমার সামনে থেকে চলে যাচ্ছিল এবং আমিও আর তাকে বাধা দিলাম না। আমার চার পাশে পথ-চলতি লোকের ভিড় জমে গেল, তারা জোরে জোরে হেসে উঠল। ভিড় ঠেলে একটা পাহারাওয়ালা এসে আমার কাছে উপস্থিত হয়ে জানতে চাইল যে, কি হয়েচে? হল্লা কিসের?

আমি জবাব দিলাম, 'কিছুই হয় নি! আমি ওই ছোট্ট মেয়েটিকে আমার ওয়েষ্ট-কোটটা দিতে চাইছিলাম ... তার বাপের জন্যে ... আপনারা সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছেন যে বড় ... বাড়ী গিয়ে এখনই আমি আর একটা ওয়েষ্ট-কোট পরব।'

পাহারাওয়ালা বললে. 'রাস্তায় হল্লা করতে হবে না, এবারে সব যে যার সরে পড়।' এই বলে সে আমায় একটা ধাক্কা দিলে।

পাহারাওয়ালা আবার আমাকে ডেকে বললে, 'এ সব কাগজ কি তোমার?'

তাই ত, এ যে আমারই লেখা কাগজ সব। খবরের কাগজের জন্য যে প্রবন্ধটি লিখেছি এ যে দেখছি তারই পাণ্ডুলিপি। 'হ্যাঁ, খুব দরকারী কাগজ; এদিকে ত খেয়ালই ছিল না আমার।' এই বলে তার হাত থেকে কাগজগুলি ছিনিয়ে নিয়ে সটান খবরের কাগজের অফিসের দিকে জোর পায়ে হেঁটে চললাম।

গীর্জার ঘড়িতে চারটা বেজে গেছে। অফিস বন্ধ হয়ে গেছে। নিঃশব্দে চোর যেমন পালিয়ে আসে ঠিক তেমনি ভাবে নীচে নেমে এলাম। দরজার সামনে অস্থির ভাবে থমকে দাঁড়ালাম। এখন কি করি? দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ইটগুলির দিকে হাঁ করে তাকিয়ে ভাবছিলাম। পায়ের কাছে একটা আল্‌পিন ঝক্ ঝক্ করচে। মাথা গুঁজে সেটা তুলে নিলাম। আচ্ছা, কোটের বোতামগুলি খুলে নিয়ে যদি বিক্রী করতে চাই, তাহলে কত পাব? হয় ত কিছুই মিলবে না। বার বার নেড়েচেড়ে সেগুলি দেখতে লাগলাম। মনে হল সেগুলি এখনো নতুনই রয়ে গেছে। যাক ভাগ্যে এ সন্ধানটা মিলে গেল। পেন্সিল-কাটা ছুরি দিয়েই বোতামগুলি কেটে নিয়ে বন্ধকী-দোকানে গিয়ে বাঁধা দিতে পারি। পাঁচটা বোতাম বিক্রী করার সম্ভাবনা আছে দেখে ভারী খুশী হলাম এবং চেঁচিয়ে বলে উঠলাম, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, এ দিয়েই আজকার মত কাজ চালিয়ে নিতে পারব!' খুশী আমায় একেবারে পেয়ে বসল এবং একটার

পর একটা করে বোতামগুলি ছাড়াতে বসে গেলাম। যখন এ কার্য্যে ব্যস্ত ছিলাম তখন আপনার মনেই এই কথাগুলি বলাবলি করতে লাগলাম :

'দেখতেই ত পাচ্চ, একটু টানাটানি চলেচে; অবশ্য অভাব অনটনটা সাময়িক ... একে ত আর স্থায়ী দারিদ্র্য বলা চলে না। কিছু বলতে গিয়ে কখনো বেফাঁস কিছু বলে না ফেলাই ভাল। আচ্ছা, আরো অনেকে কোটের বোতাম না লাগিয়েও ত জামা পরে। আমি সব সময়ই বুক খোলা রেখেই কোট পরি; এ আমার অভ্যাস, এবং একটা খেয়াল। ... না, না; যদি তুমি তাতে রাজী না হও, বেশ! আমি কিন্তু এইগুলি বেচে অন্তত এক আনার পয়সা চাই-ই। ... না? কে বলচে তোমায় করতেই হবে? চুপ করে থেকে আমায় একটু শান্তিতে থাকতে দাও ত লক্ষ্মী। ... ইচ্ছে হলে পাহারাওয়ালাও ডাকতে পার, পার না? আমি এখানেই আছি, যাও না, ডেকে নিয়ে এসো গে। তোমার কিছুই চুরি করব না। বেশ, নমস্কার! নমস্কার! হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার নাম ত ট্যানজেন; একটু দেরীতে ঘরের বার হয়েছিলাম। ...

কে একজন উপর থেকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছিল। জ্ঞান ফিরে এল, অবস্থাটা বুঝতে পেলাম। দেখলাম সহকারী মহাশয়। তাড়তাড়ি বোতামগুলি পকেটে রেখে দিলাম। সে

আমায় দেখতে পায় নি। চলে যাচ্ছিল, অভিবাদন করলাম কিন্তু প্রত্যভিবাদন সে করলে না। হঠাৎ যেন হাতের নখ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমি তাকে সম্পাদকের খবর জিজ্ঞাসা করলাম।

'তিনি ভেতরে নেই।'

'মিথ্যে বলচ!' বললাম এবং এমন ভ্যাংচিয়ে ওঠলাম যে, নিজেই অবাক হয়ে গেলাম। আবার বললাম, 'তাঁকে একটা খবর আমায় বলতেই হবে; খুব জরুরী খবর, বলতেই হবে।'

'সে খবর কি আমায় বলতে পার না?'

'তোমায় বলব!' আপাদ মস্তক তার দিকে নজর বুলিয়ে নিলাম। তাতে ইপ্সিত ফলও ফলল। তখনি সে দরজা খুলে আমায় ভিতরে নিয়ে গেল। ভয়ে কাঁপতে লাগলাম, মুখ বুজে দাঁতে দাঁতে চেপে সাহস সঞ্চয় করে নিলাম। দরজার কড়া নেড়ে সম্পাদকের খাস-কামরায় ঢুকে পড়লাম।

'এই যে, তুমি এসেচো?' সম্পাদক সদয় ভাবে বললেন, 'বসো।'

তিনি যদি আমায় ঘরের বার করে দিতেন তাতেও আমার দুঃখ করবার কিছু ছিল না। আমার যেন রুদ্ধ আবেগে কান্না ফেটে পড়ছিল। অনেক কষ্টে বললাম, 'আপনাকে বিরক্ত করলাম, মাফ ...'

তিনি পুনরায় বললেন, 'বসো না আগে!'

বসে পড়ে তাঁকে বললাম, 'আর একটা প্রবন্ধ লিখেছি, সেটাও দিতে চাই। এটা লিখতে অনেক খেটেছি।'

'পড়ব, রেখে যাও।' বলে হাত বাড়িয়ে লেখাটি গ্রহণ করলেন। 'যা-কিছু লেখো সবতাতেই মেহনৎ হয়। কিন্তু দেখছি তুমি একজন প্রচণ্ড লেখক। আর একটু যদি ধীর স্থির হতে। সব সময়েই একেবারে উত্তেজিত, অস্থির, চঞ্চল। যাক, আমি লেখাটা পড়ে দেখব 'খন।' এই বলে তিনি তাঁর টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলেন।

সেখানে বসে রইলাম। একটা টাকা চাইব?—সাহস হল না। কেন সব সময়ই এত উত্তেজনা, কেন এত অস্থিরতা, তার কারণ ওঁকে বলব? নিশ্চয় তিনি আমায় সাহায্য করবেন। আর এই ত প্রথম নয়।

উঠে দাঁড়ালাম। শেষ বার যখন দেখা হয় তখন ওঁর টাকা পয়সার অনটনের কথা জানিয়ে ছিলেন এবং আমায় দেবার জন্যে একজন লোককে টাকা আদায় করতে পর্য্যন্তও পাঠিয়ে ছিলেন। হয় ত এবারেও তাই হতে পারে। না; নিশ্চয়ই এবার সে রকম অভাব ঘটবে না। টাকা পয়সাই যদি না থাকবে ত নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি বসে বসে কাজ করতে পারতেন না।

আর কিছু বলবার আছে কিনা তিনি শুধোলেন।

'না,' জবাব দিলাম এবং আমার যে সত্যিই আর কিছু

বলবার নেই তা বুঝাবার জন্তে স্বরটাকে সংযত করে বললাম, 'তবে কবে পর্য্যন্ত লেখাটা সম্বন্ধে জানবার জন্তে আসব ?'

'ও, যে-কোন দিন এই পথ দিয়ে আসতে যেতে এলেই চলবে—দুতিন দিনের মধ্যেই।'

টাকা সম্বন্ধে অনুরোধটা জানাবার ব্যাগ্র আকাঙ্ক্ষাটা ঠোঁট দিয়ে বার হল না। ভদ্রলোকের সহৃদয়তার সীমা নেই, এবং সে সহৃদয়তার সম্মান রক্ষা করে চলাই আমার উচিত হবে। না হয় অভাবের তাড়নায় না খেয়েই মরে যাব! চলে এলাম। তখন ক্ষুধাতৃষ্ণায় আমার যে কি অবস্থা তা বলে বুঝান যাবে না। তা বলে সম্পাদকের নিকট যে কিছু চাই নি, তার জন্যেও মনে কোনও দুঃখ হল না। পকেট থেকে আর একখানা কাঠের কুচো বার করে মুখে পূরে দিলাম। তাতে অনেকটা কাজ হল। আগে কেন এ রকমটা করি নি ? 'তোমার নিজের জন্য তোমার নিজেরই লজ্জিত হওয়া উচিত।' জোরে জোরে বললাম, 'তোমার কি সত্যিই ভদ্রলোকের কাছে আবার টাকা চেয়ে তাকে অসুবিধেয় ফেলা সঙ্গত হত ?' এবং নিজের উপর ভারী ক্রুদ্ধ হলাম, কেননা যখন তখনই আমি এ রকম ধৃষ্টতা করে বসি। 'এর মত জঘন্য হীন কাজ আর কিছু আছে বলে ত শুনি নি,' আমি বললাম, 'তোমার টাকা দরকার তাই তুমি যখন তখন যার-তার কাছে গিয়ে তাকে অসুবিধেয় ফেলবে! কি অধিকার তোমার! সরে

পড়্, পালা তুই—এক্ষুণি! তোকে আজ আচ্ছা করে শেখাব।' নিজেকে জব্দ করবার জন্য প্রাণপণে ছুটে চললাম, যখনই ক্লান্তিতে কোথাও দাঁড়িয়ে পড়বার ইচ্ছা হত তখনই নিজেকে যা-তা বলে গালি দিয়ে চাঙ্গা করে তুলতে লাগলাম। এমনি করে দৌড়ে অনেকটা পথ এগিয়ে গিয়ে পাইল স্ট্রীটে এসে উপস্থিত হলাম। তখন শ্রান্তি ক্লান্তিতে এতটা অবসন্ন হয়ে পড়েচি যে, আর এক পাও নড়তে পারলাম না। অসহ্য দুঃখে কেঁদে ফেলে মাঝ পথে দাঁড়িয়ে পড়লাম বটে কিন্তু দাঁড়িয়েও থাকতে পারছিলাম না, টলতে টলতে সামনেকার র'কে বসে পড়লাম। 'না; আর পারি নে!' বললাম। নিজেকে যথাযোগ্য পীড়ন করবার জন্যে পুনরায় উঠে দাঁড়ালাম এবং জোর করেই নিজেকে দাঁড় করিয়ে রাখলাম। নিজেকে বিদ্রূপ করলাম এবং এমনি করে নিজেকে হায়রান করতে পেরেচি জেনে আত্মপ্রসাদ লাভ করলাম। শেষে কয়েক মিনিট বাদে অনেক ভেবে চিন্তে নিজেকে বসবার অনুমতি দিলাম, তাও র'কের এমন জায়গায়, যেখানে আরামের 'আ'ও না মিলে। জিরোতে পারাটা কি আরামের! মুখের ঘাম হাত দিয়ে পুছে ফেললাম। শ্বাস-প্রশ্বাস সহজেই নিতে পারচি। কি ছোটনটাই না ছুটিয়েছিলাম আপনাকে! তবু তার জন্য এতটুকুও কিন্তু দুঃখ নেই; এ যে আমার একান্তই পাওনা ছিল। সম্পাদকের কাছে একটি টাকা চাইবার ইচ্ছে কেন আমার

হয়েছিল ? যেমন কাজ তেমন ফল ভোগ করতেই ত হবে। মা যেমন অশান্ত ছেলেকে উপদেশ দেয় তেমনি নিজে নিজেকে উপদেশ দিতে লাগলাম। শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে ক্রমশ শান্ত হয়ে পড়লাম এবং এতটা দুর্ব্বল হয়ে পড়লাম যে, না-কেঁদে থাকতে পারলাম না।

প্রায় মিনিট পনেরো বিশ সেখানটায় বসে রইলাম। লোকজন আসা-যাওয়া করছিল, কিন্তু কেউ আমায় কিছু বলে নি। আমার চার পাশে ছেলেমেয়েরা খেলাধূলো করচে, রাস্তার ও-পাশের একটা গাছের উপর একটা ছোট পাখী বসে ডাকছিল—যেন গান করচে।

একটা পাহারাওয়ালা এগিয়ে এল। 'এখানে কেন বসে আছ ?' সে শুধোলে।

'কেন বসে আছি ?' জবাব দিলাম, 'এমনিই, আপন খুশীতে।'

'আধঘণ্টা ধরে তোমায় লক্ষ্য করচি। এখানে আধঘণ্টা বসে আছ।'

'তা হবে,' বললাম; 'বেশীও হতে পারে। আর কিছু চাও ?'

গরম হয়ে উঠে পড়লাম এবং চলতে লাগলাম। বাজারে এসে পৌঁছুলাম, দাঁড়িয়ে রাস্তার দিক তাকালাম। আপন খুশীতে!

ও-রকম জবাব দেওয়া কি ঠিক হয়েচে? তোমার বলা উচিত ছিল, বড় পরিশ্রম হয়েচে, তাই এখানটায় বসে একটু জিরিয়ে নিচ্চি। স্বরটা আরো একটু খাটো করা উচিত ছিল। তুমি একটা গণ্ডমূর্খ; মনের ভাব গোপন করতে আজো শিখলে না। পরিশ্রান্তই যদি হবে ত হাঁসফাঁস করা ত উচিত ছিল, তার ত কোন লক্ষণই দেখতে পাই নি।

দমকলের অফিসের সামনে গিয়ে যখন পৌঁছুলাম তখন একটা নূতন মতলব মাথায় এল। হঠাৎ হাতের আঙুলগুলি মট্‌কিয়ে এমন ভাবে অট্টহাসি হেসে উঠলাম যে, পথচলতি লোকগুলি পর্য্যন্ত বিহ্বল হয়ে পড়ল। নিজেই নিজেকে বললাম, 'এখনই তোমায় একবার পুরোহিতের কাছে যেতে হবে। একবার সেখানে গিয়ে চেষ্টা করে দেখতে আপত্তি কি? তাতে ত কোন লোকসান নেই? আর দিনটাও বেশ পরিষ্কার।' *

সামনেই একটা বইয়ের দোকান, সেখানে ঢুকে ডিরেক্টরী দেখে পুরোহিত মশাইর ঠিকানাটা জেনে নিলাম।

আপনার মনেই বললাম, 'সেখানে গিয়ে কিন্তু পাগলামি করো না। খবর্দ্দার! তোমার মত দরিদ্রের অত মান অহঙ্কার থাকতে নেই, বুঝলে? তুমি ক্ষুধার্ত্ত, জরুরী কাজে এসেচ, কাজ

* গ্রাম্য-পুরোহিতরা অনেক সময় দুস্থ নর-নারীকে খাদ্য দিয়ে সাহায্য করেন।

উদ্ধার করে তবে অন্য কথা। মাথাটা একটু ঝাঁকিয়ে ধীর স্থিরভাবে কথা বলবে। বলতে পারবে না? কেন? বেশ, তাহলে আমি এক পাও এগুচ্চি নে। বুঝেচ? তোমার অবস্থা যে কত শোচনীয় তা কি বুঝচ না, জানি তুমি অভাবের তাড়নায় দিনরাত্তির অকথ্য যাতনা ভোগ করচ, পেটে খাবার নেই, পরণে কাপড় নেই, কোনরকম ভোগের কিছুমাত্র সঙ্গতি নেই। অবস্থা ত তোমার এই। এখানে দাঁড়িয়ে আছ, ট্যাকে একটি পয়সা নেই। সুখের বিষয় এখনো নিজেকে হারিয়ে ফেল নি, ঈশ্বরে বিশ্বাস এখনো তোমার অটুট রয়েচে। শয়তানকে তুমি ত কোন দিনই শ্রদ্ধা কর নি, বরং তাকে চিরকাল ঘৃণা করেই এসেচ। তবে ধর্ম্মগ্রন্থ—সে আলাদা কথা।' এই সব কথা আওড়াতে আওড়াতে পুরোহিতের বাড়ী এসে পৌঁছুলাম। দরজার পাশে লেখা আছে—'বারটা থেকে চারটা পর্য্যন্ত দেওয়া হয়।'

'খবর্দ্দার, বাজে কথা নয়,' বললাম; 'মাথা নীচু করতে হবে ...' এবং পুরোহিতের বাড়ীর কড়া নাড়লাম।

দাসী এসে দরজা খুলে দাঁড়াল, তাকে বললাম, 'পুরোহিত মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'ঘরে নেই, বাইরে গেছেন।'

বাইরে গেছেন, বাইরে গেছেন! আমার আশা ভরসা সমস্তই

পণ্ড হয়ে গেল ! এতটা পথ হেঁটে এসে কি লাভ হল ? একটু দাঁড়ালাম।

দাসী জিজ্ঞাসা করল, 'খুব জরুরী কোন কাজ ছিল কি ?'

'না, জরুরী তেমন নয়,' জবাব দিলাম, 'তেমন জরুরী কিছু নয়। যাক, অন্য সময় এসে দেখা করব 'খন।'

আমি সেখানে দাঁড়িয়ে, দাসীও দরজার মুখে দাঁড়িয়ে, আমি ইচ্ছা করেই তার মনোযোগ আকর্ষণ করবার জন্যে আলপিনটা খুলে ফেলে খালি বুকটা তাকে দেখালাম। আমার আসার উদ্দেশ্য বুঝিয়ে একটি দৃষ্টি হেনে তার দিকে তাকালাম কিন্তু বেচারী তা বুঝতেই পারলে না।

দিনটা ভারী পরিষ্কার। ... গিন্নী-মাও কি বাড়ী নেই ?

তিনি ঘরেই আছেন। তবে বাতে পঙ্গু, শুয়ে আছেন, নড়তে চড়তে পারেন না ... বক্তব্যটা ইচ্ছে করলে লিখে রেখে যেতে পারি।

না, তার দরকার হবে না। এই হাঁটতে হাঁটতে এ-দিক পানে এসেছিলাম, হাঁটলে শরীরটা ভাল থাকে ; খাওয়া-দাওয়ার পর খানিকটা হাঁটা শরীরের পক্ষে বড় উপকারী। ... ফিরে চললাম, কিন্তু মাথা ঘুরছিল। শরীরটা যেন অতি দ্রুত ভেঙে পড়ছিল। অসময়ে এসেছিলাম। খয়রাতের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। গীর্জার সামনের একখানা বেঞ্চিতে বসে পড়লাম। হা ভগবান,

যেদিকে চাই সেই দিকেই অন্ধকার! কান্না আসছিল বটে কিন্তু তাকে রোধ করলাম। একান্ত শ্রান্ত হয়ে পড়েছি, দেহের ভার যেন আর বইতে পারচি না। কি করব, কি হবে কিছুই স্থির করতে না পেরে সেখানে বিষাদক্লিষ্ট, নিশ্চল ক্ষুধার্ত্ত হয়ে বসে রইলাম। বুকটা সাংঘাতিক ভাবে জ্বালা করছিল; এ জ্বালা যেন কিছুতেই কমছিল না, কুচো কাঠ চিবিয়েও আর এতটুকু আরাম পাচ্ছিলাম না। সেই শুক্‌নো কাঠ চিবোতে গিয়ে চোয়ালে অসম্ভব বেদনা অনুভব করচি, কাজেই সেই নিরর্থক কাজ তখনকার মত মুলতুবি রাখলাম। আর কিছুই ভাল লাগছিল না। পথের মধ্যে ক্ষুদ্র এক টুক্‌রো কাঠের মত শক্ত রুটি কুড়িয়ে পেলাম, তাই চিবোতে শুরু করলাম, কিন্তু কেমন একটা বিশ্রী দুর্গন্ধে ও স্বাদে বমি আসছিল। শরীরটা ভারী অসুস্থ হয়ে পড়েচে—হাতের নীল শিরাগুলি যেন অসম্ভব রকম ফুলে উঠেচে। আচ্ছা, সত্যি করে আমি কি চাই? একটি টাকার জন্য সুদীর্ঘ চব্বিশ ঘণ্টা কি পরিশ্রমই না করলাম কিন্তু সেই টাকাটা যদি পেতামও তাহলে এমন কি সুবিধা হত? বড়জোর ঘণ্টা কয়েক বেশী বাঁচতে পারতাম বইত নয়। সবদিক ভেবে চিন্তে দেখলে দেখা যায় যে, মরণ যদি একদিন আগে বা পরে আসে তাহলেই বা তাতে কি এসে যাবে। একদিন আগে বা পরের মধ্যে ত কিছুমাত্র পার্থক্য দেখতে পারচি নে।

বুভুক্ষা

সাধারণ লোকের মতই যদি হতে পারতাম তাহলে অনেক আগেই বাড়ী ফিরে জিরোতে পারতাম এবং দশ জনের যেমন হয়ে থাকে আমারও সেই অবস্থা হত। মুহূর্তের জন্য মনটা দিব্য পরিষ্কার হয়ে গেল। এখনই তাহলে মরতে হবে। এখনই শেষ হয়ে যাবে, সময় হয়ে এসেচে, চারদিক নিস্তব্ধ, যেন সবকিছুই ঘুমে অচেতন। বেঁচে থাকার সবকিছু উপায়গুলিই হাতড়েচি, জানা সবগুলি উপায়ই প্রায় শেষ করেচি। এ চিন্তাকে যে মনের এক কোণে একান্ত শ্রদ্ধার সঙ্গেই লালন করে আসচি এবং প্রতিবারেই আশা ভঙ্গ হওয়ায় নিজেকে ভৎর্সনা করেচি, নির্বোধ কোথাকার, তুই যে মরণের কোলে এগিয়ে চলেচিস!

সময় থাকতে এখনই খানকয়েক চিঠি লিখে মরণের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকতে হয়। জামা কাপড় বিছানা ধুয়ে পরিষ্কার করে ঠিক করতে হবে। আমার একমাত্র সম্পদ—শাদা কাগজ ক'খানা ও কম্বলখানার উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ব। আমি ... সবুজ কম্বলখানা! যেন গুলি খেয়ে আতকে উঠলাম। দেহের সমস্ত রক্ত মাথায় চড়ে বসল, এবং বুকটা প্রচণ্ড ভাবে দপ্ দপ্ করে স্পন্দিত হতে লাগল। বেঞ্চি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটতে আরম্ভ করে দিলাম। দেহের সমস্ত অণুপরমাণুতে জীবনীশক্তি যেন উগ্র হয়ে আলোড়িত হয়ে উঠল। বার বার আমি উচ্চারণ করলাম, 'সবুজ কম্বলখানা, সবুজ কম্বলখানা।'

অতি দ্রুত চলেচি, যেন কোন জিনিষ তখুনি গিয়ে আমায় আনতে হবে। অনেকটা পথে এগিয়ে গিয়ে আমার সেই আস্তানার সামনে থম্‌কে দাঁড়ালাম। একটু না থেমে একেবারে সটান্ গিয়ে হ্যান্স পলির দেওয়া সবুজ কম্বলখানা বিছানা থেকে নিয়ে ভাঁজ করে ফেললাম। আমার এই চমৎকার মতলবেও যদি আমায় বাঁচাতে না পারে ত আশ্চর্য্যের কথা বটে। এতক্ষণ ধরে নির্বোধের মত যে জল্পনা কল্পনা করছিলাম তাকে অতিক্রম করে আমার মধ্যে জ্ঞান ফিরে এসেচে, আমার মনুষ্যত্ব এখন জেগে উঠেচে। আমি সব কিছু ফেলে রেখে বেরিয়ে এলাম। আমি মহৎ নই—নির্বোধ বা সাধুও নই। আমার জ্ঞান ফিরে পেয়েচি।

তখন কম্বলখানা হাতে নিয়ে ৫নং ষ্টেনার ষ্ট্রীটে গিয়ে পৌঁছুলাম। দরজার কড়া নেড়ে প্রকাণ্ড এক কামরায় গিয়ে প্রবেশ করলাম। এ বাড়ীতে আর কোন দিন আসি নি। দরজার উপর একটা ঘণ্টা ছিল, দরজা খুলতেই বার কয়েক ক্রিং ক্রিং করে আওয়াজ হল। পাশের ঘর থেকে একজন বার হয়ে এল, সে তখনো কি খাবার যেন চিবোচ্ছিল, এসে কাউণ্টারের সামনে দাঁড়াল।

‘এই চশমাখানা রেখে আমায় আনাছয়েক দিতে পার ?’ তাকে বললাম। ‘দুচার দিন বাদেই ছাড়িয়ে নেব, নিশ্চয় নেব ; দেবে ?’

'উহুঃ, চশমার ফ্রেম ত দেখচি লোহার, কেমন নয় কি ?'

'হাঁ।'

'না ; দিতে পারি নে।'

'বেশ না দিলে, আমি ঠাট্টা করছিলাম মাত্র। কিন্তু আমার একখানা কম্বল আছে, বলতে গেলে কোন কাজেই আসচে না। সেখানা অবশ্যই নিতে পার।'

'বলব কি মশাই, এত সব জমা হয়ে রয়েচে,' সে বলল ; এবং আমি যখন মোড়কটা খুলে কম্বলখানা বার করলাম, লোকটা একবার তাকিয়ে দেখেই বলে উঠল, 'না মশাই, মাফ করবেন। ও নিয়ে আমার কোন কাজে আসবে না।'

'এ দিকটে তত ভাল নয়, এর আর দিকটা ঢের ভাল,' বললাম।

'না, না মশাই, এ মোটেই কাজের নয়। এ জিনিষ কিনতে পারি নে। এর বদলে এক আনাও কোথা পাবেন না, জেনে রাখুন।

বললাম, 'একটা বিক্রী করে যে কিছুই মিলবে না, তা ত দেখতেই পাচ্চি, তবে আমার মনে হয়েছিল যে এটা আর একখানা পুরোনো কম্বলের সঙ্গে নীলামে বিক্রী করা হয় ত যেতে পারবে।'

'না, চলবে না মোটেই।'

আমি বললাম, 'আনা তিনেক দিতে পার ত ?'

'না, ও আমি রাখবই না মশাই ! কোন দরকার নেই।'

আমি কম্বলটি আবার কাঁধে তুলে নিয়ে বার হয়ে বাড়ীতে চলে এলাম।

কিছুই যেন হয় নি এমন ভাব দেখাতে লাগলাম। বিছানার উপর কম্বলটি পরিপাটি করে বিছিয়ে রাখলাম। যখন যে কাজ করি, পরিপাটি করে করাই আমার স্বভাব। খানিক আগের ঘটনা মন থেকে মুছে ফেলে দিলাম। যখন এমন একটা অপদার্থের মত কাজ করতে উদ্যত হয়েছিলাম, তখন নিশ্চয়ই আমার মাথার ঠিক ছিল না। এ সম্বন্ধে যতই ভাবি ততই এর অযৌক্তিকতা আমার চোখে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। এ ক্ষণিক দৌর্ব্বল্যের কাজ, এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে এই দৌর্ব্বল্য আমায় পেয়ে বসে ছিল। তবে শেষ পর্য্যন্ত আমি তার সেই ফাঁদে পড়ি নি। একবার বেশ মনে হয়েছিল যে ঠিক পথে যাচ্চি নে। সেই যে প্রথমে যখন চশমা বিক্রী করতে চেয়েছিলাম তখন। যে অসম্মান, যে নীচতা আমায় আমরণ কলঙ্কিত করে রাখত সে কাজে যে ব্যর্থকাম হয়েচি তাতে আমার আন্তরিক আনন্দ জন্মেচে।

আবার শহরের রাজপথে বার হয়ে পড়লাম। গীর্জার ময়দানে লোকের বসবার জন্মে যে বেঞ্চি ছিল তারই একখানায় বসে পড়ে ঝিমুতে শুরু করে দিলাম। এক একবার মাথাটা নীচু হতে হতে

বুকের সঙ্গে ঠেকছিল, প্রবল উত্তেজনার পর একটা দারুণ ঔদাসীন্যে আমি একান্ত পীড়িত, ক্ষুধায় কাবু! এমনি করে সময় কাটছিল। ঘরের থেকে বাইরে ঢের বেশী আলো রয়েচে, বেশ বসে বসেই ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে দেওয়া যাক। খোলা আবহাওয়ায় এসে বুকের ব্যথাটাও আর তত টন্ টন্ করচে না। সকাল সকালই বাড়ী যাওয়া উচিত; কিন্তু তখন আমার চোখে ঢুল এসেছিল, কত কি চিন্তাও অস্পষ্ট ভাবে মনের মধ্যে আসা-যাওয়া করছিল।

এক টুকরা পাথর কুড়িয়ে পেয়েছিলাম; কোটের আস্তিনে বেশ করে মুছে নিয়ে মুখে পূরে দিলাম। খানিকক্ষণ ওটা নিয়েই বেশ আরাম পাওয়া যাবে হয় ত। জায়গা থেকে একবারও নড়ি-চড়ি নি। লোকজন আসচে যাচ্চে, রাস্তায় গাড়ী-ঘোড়ার শব্দ, লোকজনের হাঁকডাকের সেই গুম্ গুম্ শব্দ কানে আসছিল। বোতামগুলি নিয়ে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখা যাক না। অবশ্য চেষ্টা করে কোন ফল হবে না নিশ্চয়, তা ছাড়া এখন সময়টাও ভাল না। ভেবে চিন্তে দেখলাম, ঘরে ফিরবার মুখে বন্ধকী-দোকান হয়ে গেলেই চলবে। অনেকক্ষণ পরে কষ্টেস্৻ষ্টে উঠে পড়ে চলতে আরম্ভ করে দিলাম, পা যেন আর দেহভার বইতে পারছিল না। মাথাটা যেন পুড়ে যাচ্চে—জ্বর আসচে এবং নিরুপায় হয়ে জোর পায়ে এগিয়ে চললাম। আবার সেই

বুভুক্ষা

রুটিওয়ালার দোকান সামনে পড়ল। 'আচ্ছা, এখানে খানিকক্ষণ দাঁড়ালে হয় না!' কিন্তু দোকানে ঢুকে যদি এক টুকরা রুটি চেয়ে বসি? যাক, এ একটা চলন্ত চিন্তা—একটা চমক; এ কথা ত আমি কখনো গভীর ভাবে ভেবে দেখি নি। 'ছোঃ!' আপনার মনে বলে উঠলাম এবং মাথা নেড়ে এগিয়ে চললাম! পথে একটা বাড়ীর সদর দরজার সামনে এক জোড়া প্রেমিক-প্রেমিকা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফুস্‌ফাস করছিল। আর একটু দূরে একটি মেয়ে জানলা দিয়ে মুখ বার করে ছিল। আমার চলা এত মন্থর, কত কি ভাবতে ভাবতে চলেছিলাম যে, আমি যে বিশেষ কিছু মন দিয়ে দেখচি তা আমায় দেখে কারুরই মনে হবে না। একটা কুলটা রাস্তায় এসে উপস্থিত হল। 'কি মশাই, কেমন চলচে সব? অ্যাঃ কি, অসুখ করেচে কিছু? ও বাবা, কি চেহারা!' ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে সে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। নিজেকে সংযত করলাম। আমার মুখে কি মরণের আভাষ ফুটে উঠেচে? তবে কি সত্যি সত্যিই মরতে চলেচি! গালে হাত দিয়ে একবার অনুভব করে দেখলাম; শুক্‌নো চলচলে—স্বভাবতই ত আমি কৃশ, গাল দুটো যেন চায়ের বাটী; কিন্তু আবার এক জায়গায় এসে একেবারে থেমে দাঁড়ালাম। এত রোগা হয়ে গেছি যে, কল্পনা করাও অসম্ভব। চোখ দুটো একেবারে গর্ত্তে ঢুকেচে। আচ্ছা, সত্যি সত্যি আমায় কেমন দেখাচ্চে?

বুভুক্ষা

একমাত্র ক্ষুধার তাড়নায় যদি কারুর জীবন্ত অবস্থায় চেহারার বিকৃতি হয় তবে তার চাইতে দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি হতে পারে। আর একবার—এই শেষ বার, আমার ক্রোধের উদ্রেক হল। 'ভগবান, আমায় রক্ষা কর! কি চেহারা হয়ে গেছে, ওঃ!' কিন্তু এখানে, এই ক্রিশ্চিয়ানা শহরে নিছক না খেতে পেয়ে আজ আমার চেহারায় কী বিকৃতি হয়েচে, অথচ এ রকম একটি মাথা, বাহুযুগল দুনিয়ায় বড় একটা বেশী মিলবে না। কি কাজ না আমি করতে পারি, অথচ ভাগ্যের কি নির্ম্মম পরিহাস! আজ আমি না-খেতে পেয়ে তিল তিল করে মরণের পথে এগিয়ে চলেচি। এর কি কোন সুসঙ্গত কারণ আছে? আমি যেন একটা ভাড়াটে গাড়ীর বেতো ঘোড়া, দিনরাত্তির কি হাড়ভাঙা খাটুনিই না খাটচি—অথচ সব নিরর্থক, কোন কাজেই আসচে না।

পড়াশুনা করে করে চোখ গর্ত্তে ঢুকেচে, মস্তিষ্ককে উপবাসী রেখে মাথা খাটিয়েচি, কিন্তু এত করে কি লাভ হল আমার? একটা রাস্তার কুলটাও আমার দৃষ্টি সইতে পারে না, ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়! না, এর শেষ এইখানেই হয়ে যাক্। বুঝতে পারচ ত? হয় শেষ, না হয় মাথা চাঁড়া দিয়ে ওঠ।

নিজের অক্ষমতায় নিজেই ভিতরে ভিতরে ক্ষেপে উঠছিলাম, দাঁত কিড়মিড় করতে করতে সজল চোখে রাগের মাথায় নিজেকে

গালাগালি দিলাম। পাশ দিয়ে যারা লোকজন আসা-যাওয়া করচে তাদের দিকে একবার তাকালামও না। মনে হল, নিজেকে নির্দ্দয় লাঞ্ছনা করতে পারলে যেন স্বস্তি পাই। তাই ল্যাম্প পোস্‌টে মাথা খুঁড়ে, হাতের তালুতে নখ বসিয়ে দিয়ে, জিভ কামড়িয়ে আত্মনির্য্যাতনের ব্যর্থ চেষ্টা করলাম। আবার থেকে থেকে উন্মাদের মত হেসে উঠলাম, কিন্তু আঘাতটাও ত আমায় রেয়াত করছিল না। যতই আঘাত পাই, ততই আত্মনির্য্যাতনের নূতন নূতন পন্থা আবিষ্কারের পরম উৎসাহে মেতে উঠি।

অবশেষে নিজেই নিজেকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'হ্যাঁ, বুঝলাম, লাগে, কিন্তু আমি কি করব?' ফুটপাথের উপর বার বার পা ঠুকে আওড়ালাম, 'আমি কি করব?'

আমার এ পাগলামি দেখে এক ভদ্রলোক হেসে চলে গেলেন, 'তোমার মত লোককে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখাই দরকার। নিজে গিয়েই পাগলা-গারদে ভর্ত্তি হয়ে যাও না।' লোকটার দিকে একবার তাকালাম—একে যে চিনি, ও ডিউক,—ডাক্তার। হায় রে, ওও আজ আমার সত্যিকারের অবস্থাটা বুঝতে পারচে না। একে যে অনেকদিন জানি! কতকদিনের আলাপ। ঠাণ্ডা হলাম। শিকল দিয়ে বাঁধবে? নিশ্চয়, তাই করাই উচিত—আমি যে সত্যিই পাগল হয়ে গেছি। ডাক্তার, ঠিকই বলেচ! প্রতি রক্তবিন্দুতে যেন উন্মত্ততা অনুভব করলাম। সে যে কি তীব্র বেদনা,

মাথাটা যেন ছুঁচ দিয়ে কে বিঁধচে ; তবে কি আমার এই পরিণাম ! নিশ্চয়, নিশ্চয়। আবার সেই পীড়াদায়ক কষ্টকর পথচলা শুরু করে দিলাম। আজো কি সেই আশ্রয়-স্থানেই রাত কাটাতে হবে !

সহসা আমার গতিরুদ্ধ হল। ... কিন্তু না না, শিকল নয় ! আমি চলচি, বাঁধবার অবস্থা এখনো আসে নি। ভয়ে আমার স্বর প্রায় ভেঙে আসছিল। নিজের জন্যে কৃপা ভিক্ষা করলাম, বাতাস ও প্রকৃতির কাছে আবেদন জানালাম—আমায় যেন শিকল দেওয়া না হয়। কালকের মত ফাড়িতে গিয়ে সেই অন্ধকার—সূচীভেদ্য অন্ধকার কুঠুরীতেই আটক থাকা সঙ্গত। না, না, তা চাই নে !

আচ্ছা, অন্য আরো ত কত উপায় থাকতে পারে। আমি ত এখনো সব উপায় পরখ করে দেখি নি। দেখি না চেষ্টা করে। এবারে প্রাণপণ চেষ্টা করে দেখতে হবে, সহজে নিরাশ হলে চলবে না; ধৈর্য্য চাই। অক্লান্ত ভাবে দোরে দোরে গিয়ে চেষ্টা করতে হবে ! এই ধর না, বাদ্যযন্ত্র ও স্বরলিপি বিক্রেতা সিজ্‌লার-এর ওখানে একবারও যাওয়া হয় নি। কে বলতে পারে, সেখানেই অদৃষ্ট লেগে যেতে পারে। ... টলতে টলতে আপনার মনে বকে যাচ্ছিলাম। আবেগে কেঁদে উঠলাম। সিজ্‌লার ! আচ্ছা, এ কি ভগবানের ইঙ্গিত ? থাম্‌কা থাম্‌কা ত আর এ নামটা আমার মনে আসবার কথা নয়। সিজ্‌লার অনেক দূরে থাকে ;

তা হোক, ধীরে সুস্থে গিয়েও তার সঙ্গে দেখা হবে। তার দোকানে যাওয়ার রাস্তা ত আমার বেশ চেনা, অনেকবার সেখানে গিয়েচি। অবস্থা যখন ভাল ছিল, কত গানই না কিনেচি। তার কাছে আনা কয়েক পয়সা চাইব? হয় ত পয়সা চেয়ে তাকে মুশকিলে ফেলা হবে। একটা টাকা চাওয়াই ঠিক হবে।

দোকানে ঢুকেই মালিকের সাথে দেখা করব জানালাম। কর্ম্মচারীরা মালিকের ঘর দেখিয়ে দিল। তিনি সেখানে হাল-ফ্যাশানের দামী পোষাক পরে কি একটা হিসেবের খাতা দেখছিলেন। খানিকটা আম্‌তা আম্‌তা করে আমার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলাম। ক্ষিদার তাড়নায় নিরুপায় হয়েই তার কাছে একটা টাকা চাইতে হল ... টাকাটা ফিরিয়ে দিতে বেশী দেরীও হবে না .. খবরের কাগজে-দেওয়া লেখাটার টাকা পেলেই পরিশোধ করতে পারব। ... টাকাটা পেলে যে কি উপকারই না হবে। ... আমার বক্তব্য বলে গেলাম, কোন দিকেই কিন্তু তাঁর লক্ষ্য নেই, আপনার মনে হিসেবের খাতায় একান্ত মনোযোগের সঙ্গে মন দিলেন। আমার বলা শেষ হতেই চোখ মাথা বাঁকিয়ে তিনি একবার আমার দিকে তাকালেন। মাথা নেড়ে বললেন, 'না।'

সরল সহজ একটিমাত্র কথা।—না; কোন কৈফিয়ৎ নেই, আর একটি শব্দ খয়রাত করবারও ফুরসৎ নেই।

বুভুক্ষা

হাঁটু দুটো সাংঘাতিক ভাবে কাঁপছিল, অতিকষ্টে দেয়ালে ভর দিয়ে নিজেকে সামলালাম। আর একবার চেষ্টা করতেই হবে। অতদূর থেকে এঁর নামটাই বা কেন মনে হল? বাঁ দিকটা বার কয়েক ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল এবং ঘাম দেখা দিল। অনেক কষ্টে বললাম যে, বড় কষ্টে আছি, সময়টা অত্যন্ত খারাপ যাচ্চে, যদি দয়া করেন, টাকাটা পরিশোধ করতে বেশী বিলম্ব অবশ্য হবে না। দয়া কি হবে ওঁর?

'ওহে বাছা, আমার কাছে কেন এসেচ?' তিনি বললেন; 'তোমায় ত আমি আদৌ চিনি নে। আমার কাছে ত তুমি রাস্তার অচেনা লোক ছাড়া আর কিছুই নও; যে কাগজের অফিসে তোমার চেনা-শুনা আছে, তাঁদের কাছে যাওয়াই সঙ্গত হবে।'

'সে অফিস বন্ধ হয়ে গেছে,' আমি বললাম, 'আজকের জন্যে আমায় দয়া করুন। ভারী ক্ষিদে পেয়েচে আমার।'

তিনি অবিচল ভাবে মাথা নাড়লেন; যতক্ষণ না আমি চলে এলাম ততক্ষণ তিনি তেমনি ভাবেই মাথা নাড়লেন। 'নমস্কার! আসি তাহলে,' আমি বললাম।

চলে আসতে আসতে মনে হল, তা হলে এঁর নাম মনে পড়ায় ভগবানের কোন রকম ইঙ্গিত নেই! নির্দ্দয় ভাবে হেসে উঠলাম। টলতে টলতে নীচে নেমে এলাম, মাঝে মাঝে সিঁড়িতে বসে

বসে জিরিয়ে নিচ্ছিলাম। পাগল বলে আমায় শিকল দিয়ে আটকে না রাখে, এই হল আমার তখনকার একমাত্র ভাবনা। সেই আঁধার কুঠরীতে বন্দী হওয়ার ভাবনা সর্ব্বক্ষণ আমায় সন্ত্রস্ত করে তুলছিল; সেই দুর্ভাবনায় মনে এতটুকু স্বস্তি নেই। পথ চলতে গিয়ে দূরে একটা পাহারাওয়ালা নজরে পড়লেই তাড়াতাড়ি তাকে এড়াবার জন্যে পাশের রাস্তায় ঢুকে পড়ি। আরো কতটা পথ আমায় অদৃষ্ট পরীক্ষা করবার জন্যে আবার চলতে হবে। একসময় না-একসময় এর একটা সুরাহা হবেই। ...

একখানা ছোট্ট পশমী সুতার দোকান—ইতিপূর্ব্বে এ দোকানে আর কখনো আসি নি; কাউণ্টারের ওপাশে ছোট্ট একটি চ্যায়ারে একটি মাত্র লোক বসে আছে, তার সামনে একখানা ছোট্ট টেবিল। লোকটি একান্ত মনোযোগের সঙ্গে কাচের আলমারীতে পণ্যদ্রব্য সাজিয়ে রাখছিল। শেষ খরিদ্দারটি চলে না-যাওয়া পর্য্যন্ত দোকানের বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম। শেষ খরিদ্দারটি ছিল এক তরুণী। তার গালে সুন্দর টোল খেলে গেল। ওকে দেখে মনে হল, ও কতই না সুখী! আমার বোতামহীন কোটটাকে একটা আলপিন দিয়ে এঁটে রেখেছিলাম, তাতে নিশ্চয়ই আমায় নেহাৎ খারাপ দেখাচ্ছিল বলে মনে হল না। পিছন ফিরে এগিয়ে আসতেই বুকটা ফুলে উঠল।

'আপনি কিছু চান ?' দোকানী শুধোল।

'মালিক আছেন ?' জিজ্ঞাসা করলাম।

'তিনি শহরের বাইরে বেড়াতে গেছেন,' সে জবাব দিল। 'বিশেষ কোন জরুরী দরকার ছিল কি তাঁর সাথে ?'

মুখে হাসি আনবার চেষ্টা করে জবাব দিলাম, 'এমন বিশেষ কিছু নয়, এই খাবারের জন্যে আনা কয়েক পয়সা চাইছিলাম, খুব খিদে পেয়েছে কিনা তাই; সঙ্গে একটা পয়সাও নেই।'

'তাহলে ত দেখছি তুমি আমারই মত বড়লোক!' এই বলে সে আপনার মনে পশমের একটা বাণ্ডিল বাঁধতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

'দোহাই তোমার ভাই, আমায় নিরাশ করো না, দোহাই তোমার!' পিঠ পিঠ অনুনয় করে ওঠলাম। একটা দমকা ঠাণ্ডা হাওয়া অনুভব করলাম। 'খিদের জ্বালায় প্রায় মরতে চলেচি; ক'দিন হল কিছুই খেতে পাই নি।'

পরম গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে একটিও কথা না-কইয়ে লোকটা একে একে পশমের বাণ্ডিলগুলি নাড়াচাড়া করতে আরম্ভ করে দিলে। তার কথাই ত আমার বিশ্বাস করা উচিত। কেমন নয় কি ?

'মাত্র দুটো পয়সা,' বললাম, 'এবং দু' একদিনের মধ্যেই তোমায় এক আনা ঘুরিয়ে দেব—নিশ্চয়ই দেব।'

'বেশ লোক ত তুমি! আমি কি শেষটায় তোমার জন্যে তহবিল তছরূপ করব নাকি?' অধীর ভাবে সে বললে।

'হাঁ, তহবিল থেকেই দুটো পয়সা নিয়ে দাও, আমায় বাঁচাও ভাই, দোহাই তোমার !'

সে বললে, 'না না, আমি তা কিছুতেই পারব না।' পরক্ষণেই আবার বললে, 'এ রকমটা ঢের দেখেছি, আর বলতে হবে না, সরে পড়ে।'

নিজেকে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে হল। ক্ষুধার জ্বালায় তখন আমি উন্মাদ, অথচ লজ্জায় ভিতরটা আমার টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছিল। এক মুটো খাবারের জন্যে কুকুরেরও অধম হয়ে পড়েচি, অথচ তাও বরাতে জুটচে না। এর একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে! সত্যি আর পারা যায় না, সইবারও, ত একটা সীমা আছে। এই দীর্ঘ কাল কত না কষ্ট সইয়েও নিজেকে ধরে রেখেছিলাম, কিন্তু এখন একেবারে দাক্ষিণ্যের শেষ সীমায় তলিয়ে গিয়েচি। এই একদিনেই অধঃপতনের শেষ ধাপে নেমে এসেছি। আমার আত্মা চরম নির্লজ্জতার পাঁকে পঙ্কিল হয়ে গেল। সামান্য একটা দোকানীর কাছে গিয়ে দুটো পয়সা ভিখ্‌ মাগতেও আজ আর আমার লজ্জাশরম নেই, অথচ তাতেও ত পেট ভরল না।

কিন্তু তখন যে মুখে দিব এমন একটা দানাও আমার ছিল না। আজ আমি নিজের যে হাল করে ছেড়েচি তাতে নিজেরই উপর নিজের একটা বিরক্তি এসে যায়। এর যে শেষ করতেই

হবে। এদিকে তারা সদর দরজা হয় ত এখনই বন্ধ করে ফেলবে, তাহলে ত আর ঘরে ঢুকতেও পারব না। তাড়াতাড়ি গিয়ে না পৌঁছুলে আজো হয় ত আবার ফাড়িতে ঘর-হারাদের সাথেই রাত কাটাতে হবে।

এ-কথা মনে হতেই গায়ে অসম্ভব শক্তি পেলাম। সেই অন্ধকার কুঠুরীতে আমি আর কিছুতেই রাত কাটাতে পারব না। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে দুই হাতে বাঁ দিকের পাঁজর চেপে ধরে ফুটপাথের দিকে দৃষ্টি রেখে কায়ক্লেশে চললাম। পাছে কোন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, তাহলেই ত তাকে সাদর সম্ভাষণ করতে দেরী হয়ে যাবে, এই ভয়ে কোন দিকে না চেয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চললাম। ও হরি, মাত্র সাতটা বেজেচে! সদর দরজা বন্ধ হতে এখনো ঘণ্টা তিনেক ত দেরী আছেই। কি ভয়টাই না পেয়েছিলাম!

এদিকে চেষ্টার ত এতটুকু ত্রুটি কোন দিক দিয়েই হয় নি। শক্তিতে যতটা কুলোয় সবই ত করে দেখলাম। সারাদিন চেষ্টা করেও ত কিছুই করতে পারলাম না। অথচ এ কথা যে কেউ বিশ্বাসও করতে চাইবে না। যদি এ কাহিনী লিখি ত পাঠকরা বলবে এ সব আমার বানানো কাহিনী। কোথাও কিছু সংস্থান হল না! কি করব, কোন হাত নেই। সকলের কাছে গিয়ে আবার হাস্যাস্পদ হবার দরকার নেই। কি বিশ্রী ব্যাপার! নিজেই

নিজেকে বললাম, তোমার জন্যে আমার লজ্জার আর সীমা পরিসীমা নেই। যদি সকল আশাই নিঃশেষ হয়ে গিয়ে থাকে, তবে ত আপনা থেকেই সকল গোলযোগের অবসান হবে, তার জন্যে আস্তাবল থেকে কয়মুঠো ভিজা ছোলা চুরি অবশ্য করতে পারি নে। হঠাৎ মনের মধ্যে একটা আশার ক্ষীণ বিদ্যুৎ চমক মেরে গেল —অথচ জানি যে আস্তাবল ইতিমধ্যেই বন্ধ হয়ে গিয়েচে।

পরম নির্ভাবনায় শামুকের মত হামাগুড়ি দিয়ে আস্তানার দিকে এগিয়ে চললাম। সারা দিনের মধ্যে এই প্রথম তৃষ্ণা অনুভব করলাম। জলের খোঁজ করলাম। বাজার তখনো অনেক দূরে। কারুর বাড়ীতে গিয়ে ও যে একটু জল চাইব তার প্রবৃত্তিও হল না। অগত্যা ঘরে না পৌঁছা পর্য্যন্ত জল পানটা স্থগিদ রাখতেই হবে। ঘরে পৌঁছুতে আর বড়জোর মিনিট পনেরো লাগবে। একঢোক জলও যে পান করে হজম করতে পারব সে সম্বন্ধেও কোন নিশ্চিয়তা নেই; পেটের কোন গোলমাল আর এখন অবশ্য নেই—একমাত্র সেই যে নিজের মুখের লালা খেয়ে ক্ষুধা নিবারণের ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলাম, তার দরুণ গা-টা যেন একটু বমি বমি করছিল। কিন্তু বোতামগুলি! এখনো যে সেগুলি বাঁধা দিবার বা বিক্রী করবার কোন চেষ্টাই করি নি। সেখানে সেই পথের মধ্যে ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসতে শুরু করে দিলাম। হয় ত এ দিক দিয়েই একটু সুরাহা হতে পারে শেষটায়! এখনো তাহলে একটু

আশা আছে। এগুলির বিনিময়ে অন্তত এক আনার পয়সা পাবই; কাল সকালে একজায়গায় না-একজায়গায় কিছু জোটাতে পারবই, তারপর বৃহস্পতিবারে খবরের কাগজের লেখাটার জন্তে হয় ত টাকাটা পেয়ে যাব। এখন শুদ্ধ এই কাজটি, অর্থাৎ—বোতামের বিনিয়মে অন্তত আনা খানেক যাতে পাওয়া যায় তার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করতেই হচ্চে। এই কাজটি ভুলে গেলে ত কিছুতেই চলবে না। পকেট থেকে বোতামগুলি তুলে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সেগুলি দেখতে দেখতে চললাম। খুশীতে আমার দৃষ্টি ঝাপ্ সা হয়ে এল। রাস্তাটা আমার দৃষ্টিতে এল না, আমি শুদ্ধ অভ্যাসমত হেঁটে চললাম। আমার সেই পরমহিতৈষী রক্তশোষক পোদ্দার মহাশয়ের দোকান ত আমার ঠিক জানাই আছে, কতদিন কত সন্ধ্যায়ই না তার স্নেহে অভিষিক্ত হয়েচি। একটির পর একটি করে আমার সব কিছুই তার গহ্বরে স্থান পেয়েচে—আমার সামান্য দ্রব্যগুলি, এমন কি শেষ বইখানাও। নিলামের দিনে সেখানে যেতে আমার খুব ভাল লাগে। কেন না আমার প্রাণাপেক্ষাপ্রিয় বইগুলো যোগ্য ব্যক্তির হাতে পড়েচে দেখলে আমার খুশীর আর সীমা থাকে না। দেশের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ম্যাগলসেন সেদিন আমার ঘড়িটি কিনেছেন; সত্যি এতে আমি একটু গর্ব্বই অনুভব করচি। আমারই চেনা একজন আমার

প্রথম জীবনের লেখা কবিতার খাতাখানা নিয়েছেন। ওভার-কোটটি নিয়েছেন এক ফটোগ্রাফার, তাঁর ষ্টুডিয়োতে ব্যবহার করবেন বলে। কোন জিনিষই অযোগ্য লোকের হাতে পড়ে নি, কাজেই দুঃখ করবার কোনই কারণ দেখচি নে। বোতামগুলি হাতেই ছিল, খুড়ো তখন বসে বসে কি লিখচে। বললাম, 'আমার তাড়াহুড়ো নেই কিছু, হাতের কাজ শেষ করে নাও।' পাছে লোকটা বিরক্ত হয় তাই একটু আমৃড়াগাছি করে নিলাম। আমার নিজের স্বরই এমন অস্বাভাবিক ফাঁকা শোনাল যে, নিজেই তা চিনতে পারছিলাম না। বুকটায় যেন কামারের হাতুড়ি এসে পড়ল।

অভ্যাস মত সে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়াল এবং সটান হাত দুটো কাউণ্টারের উপর ছড়িয়ে দিয়ে কিছু না শুধিয়ে আমার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। তার কাছে রাখবার মত যৎসামান্য কিছু একটা এনেচি বটে—গোটা কয়েক বোতাম। আমার হাতের দিকে তার নজর পড়ল। বোতামের বিনিময়ে দুটো পয়সাও কি সে দিবে না?—খুশী হয়ে তার বিবেচনায় যা দেয় তাতেই আমি রাজী। বিস্মিত হয়ে খুড়ো কটমট করে চেয়ে বললে, 'বোতাম রেখে পয়সা চাও? এই কয়টা বোতাম মাত্র? কি ভেবেছ তুমি?'

একটা চুরুট বা আর কিছু দিয়েও যদি হয় ত আমার কিছুমাত্র

আপত্তি নেই জানালাম। এই পথ দিয়েই যাচ্ছিলাম, মনে হল একবার হয়ে যাই, তাই ...

বৃদ্ধ পোদ্দার উচ্চ হাস্য করে উঠল এবং একটি কথাও না কয়ে নিজের জায়গায় গিয়ে বসে পড়ল। আমি সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। বেশী কিছু ত প্রত্যাশা করি নি, কেবল যা-হোক কিছু পেলে এখনকার মত উপকার হত মাত্র। তার এই হাসিটুকু আমার বুকে ছুরির মত এসে বিঁধল। মনে হল, চশমা রাখতে চাইলেও কোন ফল হবে না। বোতামগুলির সঙ্গে চশমা জোড়াও রাখতে আমার কোন আপত্তি নেই, যদি ও আমায় কিছু দেয়। এই মনে করে চশমাটিও হাতে তুলে নিলাম। ও কি এর বিনিময়ে এক আনা, নিদেন দুটো পয়সাও দিবে না ?

খুড়ো বললে, 'চশমার বিনিময়ে যে কিছু দিতে পারি নে এ কথা ত তোমার বেশ জানা আছে, আগেও ত একবার সে কথা বলেচি। তবে কেন আবার ... '

মূঢ়ের মত বললাম, 'আমার একখানা ষ্ট্যাম্প চাই ; চিঠি লিখে রেখেচি, ষ্ট্যাম্পের অভাবে ডাকে দিতে পারচি নে। এক আনার টিকেট, নিদেন আধ আনার হলেও চলে।'

সে জবাব দিল, 'ভগবান তোমার মুখ তুলে চান। আমার দ্বারা হবে না। সরে পড়।' এই বলে সে হাত নেড়ে আমায় চলে যেতে ইঙ্গিত করল।

আপনার মনে বলে উঠলাম, সত্যিই ত, এ ছাড়া আর কি হবে। অভ্যাসমত চশমাটা আবার চোখে দিলাম, বোতামগুলি হাতে তুলে নিলাম এবং চলে আসবার মুখে তাকে অভিবাদন করে যথারীতি দরজা বন্ধ করে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

তাই ত, আর ত কোন উপায় নেই! আপনার মনে আওড়ালাম, 'এগুলি সে কোন দাম দিয়েই নেবে না নিশ্চয়। বোতামগুলি অবশ্য একেবারে আনকোরা নতুন; তবু কেন নিলে না, বুঝতে পারলাম না।'

আমি যখন বন্ধকী-দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে আকাশ-পাতাল কত কি ভাবছিলাম, তখন একটা লোক এসে দোকানে ঢুকল। ত্রস্ততার জন্যে সে আমায় ধাক্কা দিল। উভয়েই তার জন্যে উভয়ের কাছে মাফ চাইলাম এবং ফিরে তার দিকে তাকালাম।

সে তখন ঘরে ঢুকতে যাচ্চে, হঠাৎ আমায় বললে, 'কে, তুমি!'

আমার সামনে আসতেই তাকে চিনতে পারলাম। 'কি বিপদ! আরে তুমি! এমন দেখাচ্চে কেন তোমায়? এখানে দাঁড়িয়ে কি করছিলে?'

'ও আমার একটু কাজ ছিল। তুমিও ত দেখচি এসেচো।'

'হাঁ; কি রাখতে চাইছিলে?'

হাঁটু দুটো কেঁপে উঠল; দেয়ালে ভর দিয়ে নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে হাতের বোতাম ক'টা তাকে দেখালাম।

সে চেঁচিয়ে উঠল, 'ছিঃ! এত দূর! তোমার এতদূর অধঃপতন হয়েচে! না; একটা ত সীমা থাকা উচিত!'

'নমস্কার!' বলেই চলে আসছিলাম। চোখদুটো ফেটে পড়তে চাইছিল।

সে বললে, 'যেয়ো না, একটু দাঁড়াও।'

আমায় দাঁড়াতে বললে কেন? সেও ত খুড়োরই দ্বারস্থ হয়েচে দেখচি। হয় ত বিয়ের আশীর্ব্বাদী আংটিটাই বাঁধা দিতে এনেচে। ওও হয় ত আমারই মত বুভুক্ষু—কতদিন হয় ত খায় নি। আমারই মত হয় ত ওরও বাড়ীওলির ঘর ভাড়া বাকী রয়েচে।

বললাম, 'আচ্ছা, দাঁড়াচ্চি। একটু শীগগির এসো ভাই!'

সে আমার হাতখানা ধরে বললে, 'হাঁ, বেশী দেরী হবে না। আর তাও বলি, তোমায় আমার বিশ্বাস হয় না। তুমি একটা মস্তবড় গাধা; না, আমার সঙ্গেই ভিতরে এসো, নইলে যদি পালিয়ে যাও।'

সে যা বলতে চাইছিল তা বুঝলাম এবং হঠাৎ মনে মনে একটু গর্ব্বও অনুভব করলাম। জবাব দিলাম, 'না, তা পারি নে, তোমার সাথে যাওয়া এখন সম্ভব নয়। তবে তোমায় কথা দিচ্চি যে, সাড়ে সাতটার সময় বার্ণট্ অকার্স ষ্ট্রীটে আমি নিশ্চয় যাব এবং ... '

'সাড়ে সাতটায় যাবে! তাই হবে; কিন্তু এখন যে আটটা বেজে গেছে। এই দেখ আমার ঘড়িটা, এটাই বাঁধা দিতে এসেচি। তুমিও ত আমারই মত ক্ষুধার্ত্ত পাপী; দাঁড়াও, ভাগ পাবে। তোমায় এর থেকে পাঁচটা টাকা দিচ্ছি।'

এই বলে সে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল।

৬

একটি সপ্তাহ সম্ভ্রমের সঙ্গে সুখে স্বচ্ছন্দে কেটে গেল।

এবারও দুঃখ দুর্দ্দশার হাত অতিক্রম করলাম। খেয়েছি রোজই। ফলে, মনে সাহস ও উৎসাহ ক্রমশ বেড়ে গেল; পরিশ্রম করতে আর কিছুমাত্র ত্রুটি হল না।

একসঙ্গে তিন চারিটি প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করে দিলাম। এই প্রবন্ধ কয়টি রচনায় আমার সমস্ত শক্তি সমস্ত মনীষা প্রয়োগ করতে কিছুমাত্র কসুর হল না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় আগের চাইতে লেখায় যেন ঢের বেশী আয়াস পাচ্ছিলাম। শেষ লেখাটা লিখতে কলম যেন পক্ষীরাজ ঘোড়ার মত উধাও হয়ে ছুটে চলেছিল। এ লেখাটার উপর অনেকখানি আশাভরসা ছিল কিন্তু লেখাটা সম্পাদকের কাছ থেকে অমনোনীত হয়ে ফেরত এল। ফলে আত্মাভিমান খানিকটা আহত হল। আমি এতটা ক্রুদ্ধ হলাম যে, লেখাটা আর একবার না পড়েই তৎক্ষণাৎ নষ্ট করে ফেললাম। ভবিষ্যতে এ বিষয়েই আরো ফলাও করে একটা প্রবন্ধ লিখব বলে ঠিক করলাম।

যদি সে লেখাটিও না চলে এবং অবস্থা যদি আরো শোচনীয় হয়ে আসে তাহলেও কোন ভয় নেই। জাহাজে চড়ে কাজ করতে পারব। 'নান' নামক জাহাজখানা জেটীতে প্রস্তুত হয়ে আছে, শীগগিরই সমুদ্রপথে যাত্রা করবে। এতে কোন একটা কাজ নিয়ে

কোথাও না-কোথাও যেতে পারবই এবং সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়ার কাজও চালাতে পারব। কাজ করবার মত অনেক পথই খোলা আছে। শেষ বারের বিপর্য্যয় আমায় একেবারে চ্যাপটা করে দিয়ে গেছে। মাথার চুল পড়েচে, বলতে গেলে মাথা প্রায় কেশহীন; মাথা ধরায়, বিশেষত সকালটায়, আমি বড় কষ্ট পাচ্চি, এবং কর্ম্মশক্তি একেবারে পঙ্গু হয়ে পড়েচে। সারাটা দিন বসে বসে কেবলই লিখচি। ছেঁড়া নেকড়া দিয়ে হাত দুটো জড়িয়ে নিয়েচি, কেননা নিজের নিঃশ্বাসের স্পর্শেও অসম্ভব যন্ত্রণা অনুভব করছিলাম, সে যন্ত্রণা এড়াবার জন্যই এই ব্যবস্থা করতে হয়েচে। আস্তাবলের সেই ছোকরা যখন দুম্ করে আস্তাবলের দরজা বন্ধ করে তখন এবং যখন কুকুরটা উঠানে ঘেউ ঘেউ করতে থাকে তখন তাদের সে শব্দ আমার মজ্জায় মজ্জায় একটা ঠাণ্ডা কাঁপুনি ধরিয়ে দেয়, যেন সর্ব্বাঙ্গে ছোরা বিঁধতে থাকে। সকল রকম দুঃখ কষ্টের স্বাদই ত জীবনে বেশ ভাল করেই পেলাম।

দিনের পর দিন কলম চালাতে লাগলাম। খেতে যে সামান্য সময়টুকু লাগে সেটুকুও যেন আমার সহ্য হচ্ছিল না, মনে হচ্ছিল বাজে খরচ করচি। খেয়েদেয়েই কিছুমাত্র বিশ্রাম না করেই আবার লিখতে বসি। এই সময়টায় সারাটা বিছানাময় ও নজ-গজে টেবিলটা কেবলি লেখা কাগজে ভর্ত্তি থাকত। এই সব লেখা দিনরাত পড়ে পড়ে আবশ্যক অদল-বদল করে সময় কাটাতে

লাগলাম। কোন একটা বিষয়ে যে ধারণা থেকে লেখাটা তৈরী করেছি, খানিক পরেই হয় ত আবার মত বদলে গেল, তক্ষুণি আবার শোধরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। লেখাটা পড়ে দেখতে পেলাম কোন্ জায়গায় ভাষার হয় ত দৈন্য আছে, হয় ত কোথাও একটা শব্দ তুলে দিয়ে আর একটা শব্দ বসালেই লেখাটার সৌষ্ঠব বেড়ে যায়, তখুনি তা করতে বসে যাই। এ রকমটা করতে যে কি মেহনতই না করতে হচ্ছিল তা বলে শেষ করা যায় না। একদিন বিকেলে সারাদিনের মেহনতে যে লেখাটা তৈরী হল সেটা পড়ে খুশী হয়ে পকেটে নিয়ে তখুনি সম্পাদকের কাছে রওনা হলাম। হাতে তখন দুই এক আনার বেশী পয়সা নেই; কাজেই অগৌণে কিছু অর্থ আহরণ করা একান্ত প্রয়োজন।

সম্পাদক মহাশয় আমায় একটু বসতে অনুরোধ করলেন। তিনি তখন একটা লেখা প্রায় শেষ করে এনেছেন, আর একটু লিখলেই সেটা শেষ হয়ে যাবে আর শেষ হয়ে গেলেই তিনি অবসর পাবেন। তাই আমাকে বসতে বলে তিনি আবার একমনে কলম চালাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

ছোট্ট অফিস ঘরখানার চারদিক তাকিয়ে দেখলাম— ছবি, মূর্ত্তি, খবরের কাগজের কাটিং, বই ইত্যাদি এখানে সেখানে ছড়ান রয়েচে। টেবিলের একপাশে কত রকম কাগজে ভর্ত্তি একটি টুকরী। আমার মনে হল এ টুকরীটা যেন এক একটা মানুষকে

হাড়গোড় শুদ্ধ চিবিয়ে খাবে। ওর এই ভয়ানক গহ্বরটা দেখে মনটা ভারী বিষণ্ণ হয়ে পড়ল—এ যেন রূপকথার দৈত্যের একটা প্রকাণ্ড মুখগহ্বর, সব সময়ই হাঁ করে রয়েচে, কত লোকের আশাআকাঙ্ক্ষা প্রচেষ্টা যে ও আত্মসাৎ করেচে তার সীমা সংখ্যা নেই। লেখা অমনোনীত হলেই ওর সেই সদাপ্রসারিত হাঁ-য়ের মধ্যে তলিয়ে যায়।

লেখা থেকে মুখ না তুলেই সম্পাদক মহাশয় শুধোলেন, 'আজ মাসের কয় তারিখ ?'

'আটাশে।' তাঁর এতটুকু কাজে আসতে পারলাম বলে খুশী হয়ে বললাম, 'আটাশে।'

তিনি একবার বললেন, 'আটাশে,' আবার তখুনি কলম চালাতে শুরু করলেন। খানিক পরে লেখা শেষ করে কাগজগুলো সব গুছিয়ে একপাশে রেখে দিলেন। কতকগুলি কাগজ ছিঁড়ে সেই টুকরীর ভিতর ফেলে দিলেন এবং কলমটা জায়গা মত রেখে দিলেন। তারপর চ্যায়ারে হেলান দিয়ে দুলতে দুলতে আমার দিকে তাকালেন। আমি তখনো দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছি দেখে খানিকটা গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে আর খানিকটা স্ফূর্ত্তির সঙ্গেই ইঙ্গিতে তাঁর পাশের একখানা চ্যায়ার দেখিয়ে দিলেন।

ঘরের ভিতর ঢুকে এমন ভাবে ঘুরে গিয়ে নির্দ্দিষ্ট চ্যায়ার-খানায় বসলাম যে, আমার যে ওয়েষ্ট-কোট নেই এ যেন তিনি

বুঝতে না পারেন। পকেট থেকে লেখাটা বার করে বললাম, 'এ একটি চরিতালেখ্য—হয় ত ভাল হয় নি, তবু যদি আপনি একবার ...'

তিনি আমার হাত থেকে লেখাটি নিয়ে তখনই তা পড়তে আরম্ভ করে দিলেন। মাঝে মাঝে তাঁর দৃষ্টি আমার দিকে নিবদ্ধ হচ্ছিল।

ছেলেবেলা থেকে যাঁর নাম শুনে আসচি এবং যতই দিন যাচ্চে ততই যাঁর পত্রিকা আমার উপর সব চাইতে বেশী প্রভাব বিস্তার করচে সেই ব্যক্তিকে চোখের সামনে যখন দেখলাম তখন মনে হল এই কি সেই লোক! মাথার চুল কোঁকড়ান এবং ছোট্ট কটা চোখ দুটি সর্ব্বদাই চঞ্চল। মধ্যে মধ্যে নাক খোঁটা ওঁর এক বদভ্যাস। কলম ক্রমাগত চলচে, কখন যে কার উপর নির্দ্দয়ভাবে প্রচণ্ড আক্রমণ চলবে তা কে বলতে পারে, অথচ এই অতিশান্ত সুবোধ ভালমানুষটিই যে প্রয়োজন হলে কালি-কলমের মারফতে যে কতটা নিষ্ঠুর আঘাত দিতে পারেন, তা এঁকে বাইরে থেকে দেখলে কিন্তু কিছুতেই বোঝা যায় না। এই মানুষটির কাছে যখনই আসি তখনই এক অদ্ভুত সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধায় আমার মনটা ভরে ওঠে। আমার চোখ দুটো দিয়ে অশ্রুধারা বার হয়ে আসবার উপক্রম হল এবং তাঁর শিক্ষা তাঁর উপদেশ যে আমার কত উপকারে এসেচে সেই কথাই বলতে যাচ্ছিলাম।

চলতে চাইছিলাম, আমায় যেন তিনি কখনো আঘাত না দেন। আমি এক দরিদ্র হতভাগ্য আনাড়ি, জীবনে অনেক দুঃখ কষ্টই সয়ে আসচি। ...

তিনি আমার দিকে তাকালেন এবং টেবিলের উপর আমার পাণ্ডুলিপিটা রেখে ঠিক হয়ে বসে কি ভাবলেন। পাছে লেখাটা ফেরত দিতে তাঁর মনে কোন কষ্ট হয় এই মনে করে হাত বাড়িয়ে লেখাটা ফেরত চাইলাম। বললাম, 'হয় ত লেখাটা কিছুই হয় নি। অমায় খুশী করবার জন্যে আপনাকে যাতে কিছুমাত্র অসুবিধায় পড়তে না হয়,' এইটুকু বলে নিজের মনে হেসে ওঠলাম যে, লেখাটা আমি খুশী মনেই ফেরত নিচ্চি।

তিনি জবাব দিলেন, 'পাঠক-সাধারণ যে লেখা পড়তে ভাল বাসে সে রকম লেখাই আমরা চাই। কারা সব আমাদের কাগজ পড়ে তা তোমার জানা আছে। কিন্তু সে কথা যাক, আরো সোজা সহজ কিছু লিখতে পার না কি? যে লেখা সকলেই বুঝতে পারে এমন লেখা হলেই ভাল হয়।'

তাঁর অসীম ধৈর্য্য আমায় অবাক করে দিলে। বুঝতে পারলাম লেখাটা অমনোনীত হল কিন্তু তাহলেও প্রত্যাখ্যানের ভঙ্গীটি আমায় মুগ্ধ করল। তাঁর মূল্যবান সময় আর নষ্ট করব না মনে করে বললাম, 'দেখি চেষ্টা করে, মনে ত হয় পারব।'

দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। এই বাজে লেখাটা নিয়ে

ওঁর যে মূল্যবান সময় নষ্ট করলাম, তার জন্যে উনি আমায় নিশ্চয় ক্ষমা করবেন ... মাথা নীচু করে ওঁকে নমস্কার করে দরজার হাতল টানলাম।

তিনি বললেন, 'দরকার থাকে ত কিছু আগাম নিয়ে যেতে পার। কাজের সুবিধা হতে পারে।'

আমি যে অর্থাভাবে লিখতে পর্য্যন্ত পারচি নে এটা ওঁর চোখ এড়ায় নি, কাজেই তিনি যে আগাম দিতে চাইলেন তাতে নিজেকে একটু খাটো মনে করলাম। জবাব দিলাম, 'না, এখন তেমন দরকার নেই। আরো ক'দিন চালাতে পারব। আপনি যে আমার প্রতি এতটা করুণা দেখালেন তার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। আচ্ছা, আসি তাহলে। নমস্কার!'

'নমস্কার!' সম্পাদক মহাশয় জবাব দিয়েই ফের্ কাজে মন দিলেন।

সে যাই হোক, যে অনুকম্পা তিনি দেখালেন সত্যি সত্যিই আমি তার যোগ্য নই, এর জন্যে ওঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই—এ সহৃদয়তার মর্য্যাদা যেন রাখতে পারি। ঠিক করলাম, যে লেখায় আমি নিজে সম্পূর্ণ তৃপ্ত না হব সেরূপ কোন লেখা নিয়ে আর কখনো এঁকে বিরক্ত করতে আসব না। ভালো লেখা হলে তবেই আসব। এমন লেখা হওয়া চাই যা দেখে তিনি একেবারে থ হয়ে যাবেন, হয় ত খুশী হয়ে পনর বিশ টাকা দিতেই আদেশ দিয়ে বসবেন।

বুভুক্ষা

বাড়ীতে গিয়েই লেখাটা নিয়ে বসে গেলাম।

ভারী মজার ব্যাপার হল। ক'দিনই ব্যাপারটা লক্ষ্য করে আসচি। রোজ সন্ধ্যা ঠিক আটটা বাজতে না-বাজতেই, অর্থাৎ রাস্তায় আলো জ্বালার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাপারটি আমার নজরে পড়তে লাগল।

সারাদিন মেহনত করে ও অনটনের সঙ্গে লড়াই করে সন্ধ্যার মুখে যখন ঘর থেকে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিলাম তখন আমার দরজার বিপরীত দিকের ল্যাম্প্-পোস্‌ট্‌টার পাশে কালো পোষাক-পরা এক মহিলাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম।

সে আমার দিকে তাকাল এবং তার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম তার দৃষ্টি আমায় রীতিমত অনুসরণ করচে। লক্ষ্য করলাম, প্রতিদিনই ও একই পোষাক পরে আসে, আর একই ঘোটা ওর্নাথানায় ওর মুখখানিকে ঢেকে রাখে। প্রতিদিনই দেখি ওর হাতে একটি হাড়ের বাঁটওয়ালা ছাতা। তিন তিন দিন এমনি অবস্থায় ওকে ঠিক একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। তার সামনে দিয়ে চলে আসার পর দেখি, আমি যে দিকে যাই মহিলাটি ঠিক তার বিপরীত দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে যায়। কৌতূহলে অতিশ্রান্ত মস্তিষ্ক আমার স্পন্দিত হতে লাগল এবং তৎক্ষণাৎ অহেতুক একটা ধারণা এসে আমায় অধিকার করে বসল যে, মহিলাটি রোজ আমায় দেখবার জন্যেই আসেন!

তারপর একদিন তার সঙ্গে কথা বলতে প্রায় যাচ্ছিলাম, তাকে জিজ্ঞেস করতে চাইছিলাম যে, সে কাউকে চাইচে নাকি। আমার সাহায্য যদি তার প্রয়োজন হয় বা যদি তাকে বাড়ী পৌঁছে দেওয়া দরকার হয় ত আমি তা করতে প্রস্তুত। দুর্ভাগ্যের বিষয় আমার পোষাক পরিচ্ছদ নিতান্তই বিশ্রী নোংরা, তবু রাত্রির অন্ধকারে তার সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে তাকে পৌঁছে দিতে পারি; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা অব্যক্ত ভয়ে আমায় একান্ত অভিভূত করে ফেলল যে, ওকে সাহায্য করতে গিয়ে আমার কিছু খরচও ত হতে পারে—গাড়ী ভাড়া বা এক গ্লাস মদ—এ ত চাই-ই; আর এদিকে ট্যাঁকে যে একটি পয়সাও নেই। আমার এই ক্লেশকর নিঃস্ব অবস্থাটা আমায় মহিলাটির সাহায্যে যেতে নিরুৎসাহ করে দিল। তার সামনে দিয়ে যেতে যেতে তাকে যে ভাল করে দেখব তাও সাহসে কুলোল না। আবার ক্ষুধার জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করে উঠলাম, কাল থেকে কিছুই খাই নি। অবশ্য এ ত আর তেমন দীর্ঘ সময় নয়, এক এক বারে ছয় সাত দিনও আমার নিরম্বু উপবাস করতে হয়েচে; কিন্তু শেষটায় আমি সাংঘাতিক অবসন্ন হয়ে পড়লাম। আগে উপোস করলে যে পথটুকু অনায়াসেই চলতে পারতাম, শেষটায় কিন্তু তাও আর পারছিলাম না। একটি দিন মাত্র তেষ্টায় জল খেয়ে ক্রমাগত গা-বমি-বমি করে আমায় বিছানা নিতে বাধ্য করেছিল, সে যে কি কষ্ট বলতে পারি নে। সারারাত

সে কি কাঁপুনি, জামা-কাপড় যা-কিছু ছিল সবই পরলাম কিন্তু তবু সে কাঁপুনি কমে না। শীতে একেবারে যেন জমে গেলাম। আড়ষ্টভাবে কখন ঘুমিয়ে পড়লাম টেরও পাই নি। পুরোনো কম্বলে শীত আর কিছুতেই মানছিল না এবং সেই জীর্ণ কুঁড়ে ঘরে সেই দুরন্ত শীতের বাতাসে নাকটা আমার বন্ধ হয়ে গেল।

রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চললাম এবং আর একটা প্রবন্ধ লেখা না হওয়া পর্য্যন্ত কেমন করে বেঁচে থাকব সেই ভাবনাই করছিলাম। একটা মোম বাতি জোগাড় করতে পারলে রাত্রিতেও লেখাটা নিয়ে চেষ্টা করা যায়। একবার মনটাকে সংযত করে বসতে পারলেই ঘণ্টা কয়েকের চেষ্টাতেই এটা তৈরী করে সম্পাদক মশায়ের সঙ্গে দেখা করতে পারি।

আর বেশী না ভেবে ওপল্যাণ্ড কাফিখানায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। আমার সেই সন্ত-আলাপী ব্যাঙ্কের কেরাণী বাবুটির কাছ থেকে একটা মোম বাতির জন্যে এক আনার পয়সা জোগাড় করাই ছিল আমার অভিপ্রায়। প্রায় সবগুলি কামরাই ঘুরে দেখলাম, কেউ বাধা দিল না। দেখলাম, কত নর-নারী দলে দলে বসে খাচ্ছে, গল্প করচে, কেউ কেউ বা আবার পান করতে করতে মত্ত হয়েও পড়েচে। গোটা কাফিখানার এখানে সেখানে আঁতিপাতি করে বন্ধুকে খুঁজে ফিরলাম কিন্তু তার সাক্ষাৎ মিলল না।

বুভুক্ষা

দারুণ বিমর্ষ ও উত্যক্ত হয়ে আবার এসে রাস্তায় পড়লাম এবং কায়ক্লেশে দেহটাকে প্রাসাদের দিকে টেনে নিয়ে চললাম।

আমার এই দুঃখকষ্টের কি কথনো পরিসমাপ্তি হবে না? কে বলতে পারে? কোটের কলারটি উল্টা করে কান পর্য্যন্ত ঢেকে নেহাৎ জংলীর মত পা-জামার পকেটে হাত ঢুকিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে নিজেকে ধিক্কার দিতে দিতে এগিয়ে চললাম। এই সুদীর্ঘ সাতআট মাসের মধ্যে এমন একটা ঘণ্টাও পাই নি, যে সময়টা আমি নির্ভাবনায় কাটাতে পেরেচি। একটা সপ্তাহও দেহ আর আত্মাকে খাড়া রাখবার মত সামান্য খাবারও আমি জোটাতে পারি নি, দু'এক দিন ভালয় ভালয় যেতে না-যেতেই আবার অভাব অনটন উপবাস আমায় হাঁ করে গিলতে এসেচে। কিন্তু সুখের বিষয়, এত দুঃখকষ্টের মধ্যেও বুক টান করে চলেচি, কোথাও নিজেকে এতটুকু খাটো হতে দিই নি—মনে প্রাণে জানি, কোথাও নিজেকে এতটুকু খর্ব্ব করি নি। ভগবান আমায় রক্ষা করুন, নইলে আমার কি শক্তি, এত বিরুদ্ধতার মধ্যেও নিজেকে খাড়া রাখতে পারি! আপনার মনেই তখন সেদিনকার কথাটা আওড়াতে লাগলাম যেদিন হ্যান্স্ পলীর কাছ থেকে ধার-করে-আনা কম্বলখানাও পোদ্দারের দোকানে বাঁধা দিতে গিয়েছিলাম। ভগবান আমার জ্ঞান ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, নইলে আমার কী সর্ব্বনাশই না আমি করে বসতাম!

বুভুক্ষা

এই ক্ষীণ দ্বিধা সঙ্কোচে কৃত্রিম হাসি হেসে ঘৃণা ভরে রাস্তায় থুথু ফেললাম এবং আমার এই নির্বুদ্ধিতায় নিজেকে যথাযোগ্য বিদ্রূপ করার মত জোরালো ভাষা খুঁজে পেলাম না। এই মুহূর্তে যদি কোন বিধবার বা ভিখারীর কাছে একটা একআনি দেখতে পেতাম, তাহলে নিশ্চয়ই আমি তা ছিনিয়ে নিতে পারতাম; সজ্ঞানে তা আত্মসাৎ করে আরামে ঘুমাতেও পারতাম, মনে এতটুকু গ্লানি আসত না। এই যে অব্যক্ত যাতনা সহ্য করচি এ একেবারে নিরর্থক নয়—ধৈর্য্যের মাত্রা পূর্ণ হয়ে আসচে। এখন সব কিছু করতে প্রস্তুত আছি।

প্রাসাদের চারদিক তিন চার বার প্রদক্ষিণ করলাম, তারপর ঠিক করলাম, এবারে ঘরে ফেরা যাক, অবশ্য তার আগে পার্কে খানিকটা ঘুরে ফিরে কার্ল জোহানের দিকে হাঁটতে শুরু করে দিলাম। তখন প্রায় এগারটা বেজেচে। রাস্তা ঘাট অনেকটা আঁধার হয়ে এসেচে, চারদিকেই লোকজন চলাফেরা করচে,—কেউবা যুগলে, আর কেউ কেউবা দলে দলে হাসি কলরব করতে করতে চলেচে। এই সময়ে যুগলে মিলে কত আমোদপ্রমোদেই না মত্ত হয়ে পড়ে, সে কারণে গাড়ী-ঘোড়ার ভিড়ও খুব বেশী বেড়ে যায়। পেটি-কোটের খসখসানি, এখানে সেখানে খাটো ইজের, হাসি মস্করা ঠাট্টায় চারদিক একেবারে সরগরম, কত ঘন আন্দোলিত বক্ষ, কত আসক্তি অনুরাগ, কত হাঁসফাঁসানি, কত

বুভুক্ষা

দীর্ঘনিঃশ্বাস! গ্র্যাণ্ড হোটেলের চারদিকে একটি মাত্র শব্দ শোনা যায়—'এস্মা!' সারাটা রাস্তা একেবারে জমজমাট।

আমার পকেটে যদি গোটা কয়েক টাকা থাকত! পথচল্‌তি প্রত্যেক নর-নারীর মধ্যে একটা তীব্র অনুরাগের পুলকশিহরণ জেগে উঠেছিল, গ্যাসের সেই মিট্‌মিটে আলোক, রাত্রির সেই পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা—সব কিছুই আমার উপর প্রভাব বিস্তার করল—ফুস্‌ফুসানি, আলিঙ্গন, কম্পন, স্বীকার, অঙ্গীকার, অর্দ্ধ উচ্চারিত বাণী এবং চাপা চীৎকারে এর বাতাস একদম ভারাক্রান্ত। একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর সামনে গোটাকয়েক বেরাল মিলে পরস্পরে চীৎকার করে তাদের প্রেম নিবেদন করছিল। আমার ট্যাঁকে কিন্তু একটা টাকাও নেই! এই যন্ত্রণা, এই হীনাবস্থা, এই চরম নিঃস্ব অবস্থার আর যেন তুলনাই হয় না। কী লজ্জা, কী পরিতাপের বিষয়! অথচ কোন উপায়ই নেই! আবার আপনার মনে ভাবতে লাগলাম, বিধবার শেষ কপর্দ্দক, স্কুলের ছেলের বই বা শ্লেট, এমন কি ভিখারীর ভিক্ষালব্ধ পয়সা, ছেঁড়া বস্ত্রখণ্ডও আমি এখন অনায়াসে আত্মসাৎ করতে পারি। আর সেগুলো নিয়ে বেচে খেতে পারি, তাতে কিছুমাত্র ইতস্তত আমার হবে না।

নিজেকে সান্ত্বনা দিবার উদ্দেশ্যে—ক্ষতির এতটুকু পূরণ করার মতলবে—রাস্তা দিয়ে যারা আসা-যাওয়া করছিল. তাদের

প্রত্যেকেরই দোষ ধরতে লাগলাম। ঘৃণা ভরে ঘাড় নেড়ে অবজ্ঞার সঙ্গে তাদের দিকে তাকাতে লাগলাম। এই সব অন্নেতুষ্ট মিষ্টিখোর স্কুল-কলেজের ছেলে, এরা নগণ্য মেয়ে-দর্জ্জীকেও অনায়াসে উত্যক্ত করে নির্দ্দয় আনন্দ উপভোগ করতে পারে! এই সব মেষ শাবকের দল,—ব্যাঙ্কের কেরাণী, ব্যবসাদার, আড্ডাধারী —এরা সামান্য একটা ছোটজাতের কুরূপা স্ত্রীলোককেও অনাদর করে না; এক পাত্তর বিয়ার-এর জন্যে ঐ সব কুলটা মেয়েগুলি যার-তার পা চাটতে পারে। কী ব্যাভিচার! গত রজনীতে দরোয়ান জাতীয় লোক বা আস্তাবলের ছোকরাদের আলিঙ্গনের উত্তাপ এখনো হয় ত এদের দেহে রয়ে গেছে! ওদের দ্বার সকল সময়েই খোলা, নব নব পুরুষের জন্যে উন্মুক্ত রয়েচে! একবার এলেই হল, সে যেই কেন না হোক!

ফুটপাথের উপর জোরে থুথু ফেললাম, কারুর গায়ে যে গিয়ে পড়তে পারে সে দিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য ছিল না! রাগে গস্‌গস্‌ করতে লাগলাম, এই যারা গায়ে পড়ে খামকা চেনাশুনা না থাক্‌লেও আত্মীয়তা করতে চায় তাদের উপর ঘৃণায় সর্ব্বাঙ্গ রি-রি করতে লাগল। আমার চোখের সামনেই ত ক'জনকে দেখলাম। মাথা তুলে এই মনে করে আত্মপ্রসাদ লাভ করলাম যে, নিজের ঘর সাফ রাখতে এখনো পেরেচি। পার্লামেণ্ট প্লেশে যখন এসে পৌছুলাম তখন একটি কিশোরীকে দেখতে

পেলাম। তার সামনা সামনি আসতেই সে অপলক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল।

তাকে 'নমস্কার' জ্ঞাপন করলাম।

প্রত্যুত্তরে ওও 'নমস্কার' জানিয়ে থামল।

হুঃ! এত বেলায় কি ও বেড়াতে বার হয়েচে? এই সন্ধ্যার মুখে কাল জোহানের আশেপাশে দিয়ে ওর মত এক তরুণীর রাস্তায় বার হওয়া কি বিপদজনক নয়?—নিশ্চয়ই। যে কেউ ত একা পেয়ে ওকে অপমান করতে পারে।

তাই ওকে বললাম, 'চল, তোমায় বাড়ী পৌছে দিয়ে আসি।'

সত্যিকারের কি মতলব তা ঠিক করবার জন্যে শ্যেন্ দৃষ্টিতে ও আমার দিকে বিস্ময়ে অবাক হয়ে তাকাল, আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল, তারপর সহসা আমার কাঁধের উপর হাত রেখে বলে উঠল:

'বেশ, চল আমারা দুজনে এক সঙ্গেই যাই। যাবে?'

ওকে নিয়ে হাঁটতে শুরু করে দিলাম। কিন্তু কয়েক পা যেতে না-যেতেই আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। এবং কাঁধ থেকে ওর হাতখানা সরিয়ে নিয়ে ওকে বললাম, 'শোন লক্ষ্মী, আমার কাছে একটি পয়সাও নেই!' এবং এই বলেই আমি চলতে লাগলাম!

প্রথমটা ও আমার কথা বিশ্বাস করল না; কিন্তু আমার

সব কয়টা পকেট খুঁজে যখন সত্যিই কিছু মিলল না তখন ভারী বিরক্ত হয়ে মাথাটা নাড়ল এবং যাচ্ছেতাই গালাগালি দিল।

'নমস্কার!'

'একটু দাঁড়াও,' ও ডাকলে; 'তোমার চশমার ফ্রেমটা কি সোনার?'

'না।'

'তবে চুলোয় যাও!'

আমি চলতে লাগলাম।

কয়েক সেকেণ্ড পরেই ও আমার পিছু পিছু দৌড়ে এল এবং চেঁচিয়ে ডাকল, 'পয়সা না থাক্—এসো। পয়সা তোমার ঠেঙে চাই নে।'

রাস্তার একটা কুলটার এ প্রস্তাবে নিজেকে অপমানিত বোধ করলাম। বললাম, 'না।' রাতও তখন বেশ হয়েচে, তাছাড়া একটা সভাতেও আমায় উপস্থিত থাকতে হবে।

'এসো না, এক সঙ্গে যাই।'

'বিনি পয়সায় ত আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারি নে।'

'আমার সঙ্গে না গেলেও ত আর একজনের সঙ্গে যাবেই।'

বললাম, 'না।'

একটা রাস্তার কুলটার কাছে যে আমি হাস্যাস্পদ হলাম

এ বিষয়ে আমি একান্ত সজ্ঞান ছিলাম, কাজেই ওর হাত এড়াবার এক উপায় ঠাউরে নিলাম।

'তোমার নাম কি?' ওকে শুধোলাম। 'মেরী, অ্যাঃ? বেশ নামটি ত! মেরী, তুমি আমার একটা কথা শোন!' এবং ওর আচরণ সম্বন্ধে ওকে উপদেশ দিতে শুরু করে দিলাম। আমার কথা শুনে মেয়েটা ভারী বিস্মিত হয়ে গেল। ও কি এখনো মনে করে যে সন্ধ্যা বেলায় যারা পথে বেরিয়ে মেয়ে খুঁজে বেড়ায় আমি সেই দলেরই একজন? ও কি সত্যি সত্যিই আমাকেও অতটা খারাপই মনে করচে? আমি ত ওর সঙ্গে কোন রকম অভদ্র ব্যবহার করি নি। সত্যি বলতে কি, আমি ওকে সম্ভাষণ করে সঙ্গে নিয়ে এই কয়েক পা এসেচি, ওর দৌড় কতটা, তা জানাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। শেষটায় ওকে বললাম যে, আমার নাম অমুক—আমি অমুক জায়গার পুরোহিত। 'যাক, এবার! ঘরে চলে যাও, আর পাপ করো না।' এই বলেই আমি চলে এলাম।

আমার সুবুদ্ধি এখনো অটুট আছে দেখে আনন্দে হাত কচলাতে আরম্ভ করে দিলাম এবং আপনার মনে জোরে জোরে বলে উঠলাম, 'ভাল কাজ করার মধ্যে ঢের আনন্দ আছে।' হয় ত সারা জীবনের তরে এই হতভাগিনী নারীর মধ্যে একটা শুভ-বুদ্ধির প্রেরণা জাগিয়ে দিতে পেরেচি। হয় ত সত্যি সত্যিই ওকে ত্রাণ করলাম—যখনই ও এ সম্বন্ধে ভাববে তখনই আমার এই

মহত্ত্বটুকু মনে করবে। হয় ত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমরণ আমার নাম ওর স্মরণে থাকবে। সাধু সচ্চরিত্র ও ধর্ম্মভীরু হওয়ায় লাভ অনেক!

মেজাজটা তখন একেবারে শান্ত সমাহিত। নিজেকে তখন উজ্জ্বল পবিত্র মনে হল, যত দুঃখ বিপদই আসুক না কেন তার সম্মুখীন হবার মত সৎসাহস আমার যথেষ্টই আছে বলে বিশ্বাস হল। এখন যদি আমার একটা মোমবাতি সংগ্রহ করবার সঙ্গতি থাকত তাহলে প্রবন্ধটা অনায়াসেই শেষ করতে পারতাম। হাঁটতে শুরু করে দিলাম, ঘরের নতুন চাবিটায় ঠনঠন করে শব্দ হচ্ছিল। গুন্‌গুন্ করতে করতে এবং শিস্ দিতে দিতে কেমন করে একটা বাতি জোগাড় করতে পারি তারই উপায় আবিষ্কার করতে চেষ্টা পেলাম। লিখবার কাগজপত্র নিয়ে রাস্তার আলোতে বসেই আমায় লিখতে হবে, এ ছাড়া যে আর কোন উপায়ই নেই। ঘরের দরজা খুলে কাগজ-পত্র নেবার জন্যে ভিতরে গেলাম। আবশ্যক মত কাগজ-পেন্সিল নিয়ে বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে সামনেকার আলোটার নীচে বসে গেলাম। চার দিকেই একটা স্তব্ধতা বিরাজ করচে; দূরে ফুটপাথের উপরে পাহারাওয়ালার জুতার শব্দ পাওয়া যাচ্চে, আরো দূরে কোথায় একটা কুকুর চীৎকার করছিল। বিরক্ত হবার মত কিছু নেই। কোটের কলারটা উল্টিয়ে কান পর্য্যন্ত ঢেকে দিলাম এবং একাগ্রতার সঙ্গে লেখা সম্বন্ধে ভাবতে লাগলাম।

বুভুক্ষা

এই ছোট্ট লেখাটিকে যদি একটি যথাযোগ্য সমাপ্তিতে শেষ করতে পারতাম তাহলে লেখাটা প্রকৃতই ভারী উৎকৃষ্ট হত। এতে একটা কঠিন বিষয়ই আলোচনা করতে চেষ্টা পেয়েছি, সুতরাং তাতে একটা নতুনত্ব থাকা একেবারে দরকার। শব্দ যোজনা ও প্রকাশ ভঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গে ক্রমপরিণতির একটা বিশিষ্টতা দেখানো আবশ্যক। কিন্তু আবশ্যক শব্দগুলি কিছুতেই মনে আসছিল না। শুরু থেকে লেখাটা আগাগোড়া বার কয়েক পড়ে নিলাম, প্রত্যেকটি বাক্য চেঁচিয়ে পড়লাম, যাতে আমার চিন্তার ধারা অব্যাহত গতিতে পরিণতির দিকে এগিয়ে যাবার সুযোগ পায়। কিন্তু লাভের মধ্যে এই হল, আমি যখন লেখাটা নিয়ে এমনি ধারা দস্তুর মত কসরৎ করছিলাম তখন পাহারাওয়ালাটা এসে আমার অদূরে বসে পড়ে আমার মেজাজটা একদম বিগড়ে দিলে। আচ্ছা, আমি বসে বসে কাগজের জন্যে একটা প্রবন্ধ রচনা করচি তাতে ও হতভাগার বাধা দেবার কি প্রয়োজন ছিল? ভগবান, অথই জলে তলিয়ে না গিয়ে মাথা জাগিয়ে রাখতে যত চেষ্টাই করি নে কেন, কাজে তা সার্থক করে তোলা কত না অসম্ভব! ঘণ্টাখানেক ওখানে অপেক্ষা করলাম। কন্সটবলটাও চলে গেল। এত দারুণ শীত বোধ হতে লাগল যে, কিছুতেই আর নিজেকে সেখানে ধরে রাখতে পারছিলাম না। আমার এত সাধের চেষ্টা নিষ্ফল হওয়ায় হতাশ

হয়ে একদম দমে গেলাম। তারপর আবার ঘরের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলাম।

সেখানেও ভারী শীত। এবং এত অন্ধকার যে জানলাটা পর্য্যন্ত নজরে আসছিল না। আপনা থেকে বিছানায় গিয়ে বসলাম; জুতো জোড়া খুলে হাত দিয়ে পা দুটো গরম করবার জন্যে রগড়াতে শুরু করে দিলাম। তারপর জামা-কাপড় পরেই শুয়ে পড়লাম।

এমন কত দিন থেকেই চলে আসচে। ভোর হতে না-হতেই পরদিন ঘুম থেকে জেগে বিছানার উপর উঠে বসে ফের প্রবন্ধটা নিয়ে বসে গেলাম। দুপুর পর্য্যন্ত সেটা নিয়েই কেটে গেল; বড় জোর দশবিশ লাইন মাত্র লিখতে পারলাম, শেষ করা আর হয়ে উঠল না।

বিছানা ছেড়ে উঠে জুতো জোড়াটা পায়ে দিয়ে ঘরের মেঝেয় পায়চারী আরম্ভ করে দিলাম, তাতে শীত কাটবারও সম্ভাবনা ছিল। চেয়ে দেখি জানলায় হিমানী—বাইরে বরফ পড়চে। নীচে উঠোনে পুরু হয়ে বরফ জমে আছে। ব্যস্ত হয়ে ঘরের মধ্যেই দৌড়ঝাপ দিতে লাগলাম, ওইটুকু জায়-গার মধ্যেই উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়ালাম, নখ দিয়ে দেয়ালে আঁচড় কাটলাম, তর্জ্জনী দিয়ে মেঝেয় আঘাত করলাম। তারপর ব্যস্ত সমস্ত হয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে কি সব কান পেতে

শুনতে শুরু করে দিলাম, যেন তা আমার পক্ষে একান্ত জরুরী; সারাটাক্ষণ থেমে থেমে জোরে জোরে কি সব বিড়বিড় করে আওড়ালাম—উদ্দেশ্য নিজের কণ্ঠস্বর যেন নিজে শুনতে পাই।

কিন্তু ভগবান, এ কি উন্মাদের লক্ষণ নয়! তবু কিন্তু আমার এই উন্মত্ত আচরণ সমভাবেই চলল। অনেকক্ষণ বাদে—ঘণ্টা-কয়েক হবে—নিজে দস্তুর মত প্রকৃতিস্থ হয়ে ওঠলাম, ঠোঁট কামড়িয়ে নিজেকে সচেতন করে তুললাম। এই উন্মত্ততার শেষ করতেই হবে! হাতের গোড়ায় একখানা কাঠের কুচো পেলাম এবং তাই চিবোতে চিবোতে লেখায় মন দিলাম।

অনেক কষ্টে প্রাণপণ চেষ্টায় গোটা কয়েক অপদার্থ শব্দ-যোজনা করে কয়েকটি ছোট ছোট বাক্য রচনা করলাম। লেখাটাকে যেমন করেই হোক, শেষ করতেই হবে যে! কলম আর এগুলো না, মাথাটা যেন একেবারে ফতুর হয়ে গেছে, কিছুই যেন আর বাকী নেই। চেষ্টা করবার শক্তিও আর কিছুমাত্র ছিল না। আর যখন লিখতেই পারব না, এমন অবস্থা, তখন অসমাপ্ত লেখাটার শেষ পৃষ্ঠাটার দিকে খোলা চোখে তাকিয়ে রইলাম। সেই অদ্ভুত আঁকাবাঁকা অক্ষরগুলি যেন শিং উঁচিয়ে আসছিল। চেয়ে চেয়ে দেখলাম কিন্তু তার মাথা-মুণ্ডু কিছুই ঠিক হদিস পেলাম না। আর কিছু ভাবতেও পারলাম না।

সময় বয়ে চলল; রাস্তায় লোকচলাচল শুরু হয়ে গেছে,

গাড়ীঘোড়ার শব্দ পেলাম। আস্তাবলের সেই ছোকরাটি ঘোড়াগুলোকে গালাগালি দিচ্চে শুনতে পেলাম। আমি একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। বসে বসে ঠোঁট দুটোকে থুথু দিয়ে ভিজাতে শুরু করে দিলাম। এ ছাড়া আর কিছু করবার কোন চেষ্টাই করলাম না। বুকের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। সন্ধ্যা হয়ে আসচে, ক্রমেই অবসন্ন হয়ে পড়ছিলাম। ক্লান্তিতে বিছানার উপর একেবারে নেতিয়ে পড়লাম। হাতের আঙুলগুলিকে গরম করবার উদ্দেশ্যে চুলের মধ্যে যদৃচ্ছা চালাতে আরম্ভ করে দিলাম। আঙুল বুলানোর ফলে অনেকগুলি চুল আপনা থেকেই উঠে আসছিল, সঙ্গে সঙ্গে রুখিও ঝরে পড়ে বালিশময় ছড়িয়ে পড়ছিল। তখন কিছুই মনে হল না, যেন এর সঙ্গে আমার কোনই সম্পর্ক নেই। মাথায় ত এখনো ঢের চুল রয়েচে, ভাবনা আসবার কথা ত নয়। কুয়াশার মত আমার মনটাকে যে জড়তা এসে আচ্ছন্ন করে ফেলেচে তাকে নিঃশেষে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা পেলাম। বসে বসে হাতের তালু দিয়ে হাঁটু চাপড়াতে আরম্ভ করে দিলাম। শক্তিতে যতটা কুলোয় অট্টহাসি হেসে উঠলাম—তার পরই একেবারে চুপচাপ।

বৃথা, সব বৃথা! অসহায়ের মত মরতে বসেচি, অথচ চোখ চেয়ে সবকিছুই দেখতে পাচ্চি—কোন উপায় নেই! বুড়ো আঙুলটা মুখের মধ্যে পূরে দিলাম কিন্তু তা চুষতে পারলাম না। মগজের

মধ্যে কি একটা অদ্ভুত খেয়াল এসে উত্যক্ত করে তুললে—একেবারে অসম্বদ্ধ চিন্তা।

আচ্ছা, আঙুলটা যদি কামড়াই? মনে হতেই মুহূর্তের জন্যে কিছু না ভেবেচিন্তে চোখ বুজলাম এবং দাঁত দিয়ে খুব জোরে আঙুলটা চেপে ধরলাম।

লাগতেই লাফ দিয়ে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। তখন পুরো জ্ঞান এসেচে। আঙুল দিয়ে সামান্য রক্ত ঝরে পড়তেই জিভ দিয়ে তা চেটে নিলাম। বেশী খানিকটা কাটে নি, ব্যথাও বড় একটা তেমন পাই নি, মাঝের থেকে সহজেই আমি জ্ঞান ফিরে পেলাম। মাথা নেড়ে জানলার সামনে গেলাম, সেখানে এক টুকরো ছেঁড়া ন্যাকড়া পড়ে ছিল, তাই দিয়ে আহত স্থানটা মুছে বেঁধে নিলাম। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যখন এই কাজে ব্যস্ত, তখন চোখ দুটি অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে এল। আপনার মনে খানিকক্ষণ নিঃশব্দে কাঁদলাম। বেচারী সরু আঙুলটির শোচনীয় অবস্থা দেখে সত্যি দুঃখ হল। এ তোমার কি লীলা, ভগবান! বুঝতে পারচি না ত! ক্রমে আঁধার হয়ে এল। অন্ধকার হয়ে আসবার আগেই যদি লেখাটি শেষ করতে না পারি তা হলে যে একটি মোমবাতির দরকার হবে, কিন্তু কোথায় পাব তা? মাথাটা তখন আবার দিব্য পরিষ্কার, চিন্তাগুলি যথারীতি এল-গেল, তাতে কোন গোল হল না। এমন কি, ঘণ্টা কয়েক আগে যেমন ক্ষুধা অনুভব

করছিলাম, এখন তেমন প্রচণ্ড ভাবে তা বোধ হল না। পরের দিন পর্য্যন্ত অনায়াসেই না খেলেও চলতে পারব। যদি নিজের অবস্থা জানিয়ে সমবায় সমিতির দোকানে একটা মোমবাতি চাই তাহলে হয় ত নিশ্চয়ই পেতে পারি ; বিশেষত আমি সেখানকার সকলেরই বিশেষ পরিচিত। অবস্থা যখন ভাল ছিল তখন সেখান থেকে কত রুটিই না কিনেচি। সেখানে আমার যে সুনাম আছে তার জোরে যে অনায়াসেই একটি মোমবাতি জোগাড় হতে পারে তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। এই মনে করে দীর্ঘকাল পরে এই প্রথম জামাকাপড়টা একটু ভাল করে ঝেড়ে ফুঁকে যতটা সম্ভব ভব্যতা বাঁচিয়ে উপরের সিঁড়ি ধরে উঠে চললাম।

যেতে যেতে মনে হল, মোমবাতি না চেয়ে একখানা রুটি চাইলে কেমন হয় ? অস্থিরতা বেড়ে গেল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম। অবশেষে নিজেই নিজেকে বললাম, 'না, কিছুতেই না।' আমার শরীরের অবস্থা এমন দাঁড়িয়েচে যে, কোন রকম খাবারই হজম করবার শক্তি আমার নেই। যদি খাই ত আবার সেই একই অবস্থা—স্বপ্ন, পূর্ব্বাববোধ, উন্মত্ততা। প্রবন্ধটাও আর তাহলে কখনো শেষ হবে না, সম্পাদকমশাইও তাহলে হয় ত ইতিমধ্যে আমার কথা একদম ভুলে যাবেন। না, কোন মতেই তা হতে পারে না। মোমবাতিই চাইব, তাই ঠিক করলাম। এবং এই আশা নিয়েই দোকানে ঢুকলাম।

বুভুক্ষা

একটি মহিলা কি সব জিনিষপত্র কিনছিলেন, তাঁর সামনে অনেকগুলি ছোটখাটো পুলিন্দা জড় হয়ে পড়ে রয়েচে ; দোকানী আমায় চিনত, তাই আমায় দেখতে পেয়ে মহিলার সামনে থেকে সরে এসে আমায় কিছু না জিজ্ঞাসা করে স্বভাবত যে জিনিষ সব সময় কিনে থাকি সেই একখানা রুটি কাগজে মুড়ে হাত বাড়িয়ে আমায় দিলে।

তাকে বললাম, 'রুটি চাই নে, একটা মোমবাতি এখন একান্ত দরকার।' ধীরস্থির ভাবে কথাটি বললাম, পাছে দোকানী না অসন্তুষ্ট হয়, কেননা তাহলে আমার যা দরকার তা নাও পেতে পারি।

আমার কথায় দোকানী একটু লজ্জিত হল। অপ্রত্যাশিত ভাবে এ জবাবে সে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। জীবনে এই হয় ত সব প্রথম রুটি ছাড়া আর কিছু তার কাছে চাইলাম।

দোকানী জবাব দিল, 'তাহলে একটু অপেক্ষা করতে হবে।' এই বলেই মহিলাটির জিনিষপত্রের দিকে একান্ত মনোযোগ দিল।

মহিলাটি জিনিষপত্র বুঝে নিয়ে দাম চুকিয়ে দিলেন। তিনি একখানা দশটাকার নোট দিলেন, দোকানী তার জিনিষের দাম কেটে রেখে বাকী পয়সাটা তাঁকে ফেরত দিয়ে দিল। তখন সেখানে দোকানের ছোক্‌রা আর আমি ছাড়া আর কেউ ছিল না। সে বল্লে, 'কি চাই, মোমবাতি ?'

এই বলে মোমবাতির একটা বাণ্ডিল খুলে তার থেকে আমায় একটা মোমবাতি দিল। তার মুখের দিকে চাইলাম, সেও আমার দিকে তাকাল; যে কথা বলে মোমবাতি চাইতে এসেছিলাম, তা কিন্তু কিছুতেই মুখ দিয়ে বার হল না।

হঠাৎ সে বলে উঠল, 'তা বেশ। দাম ত পেয়েছিই।' আমি দাম দিয়েচি ও তাই জানাল। ওর সব ক'টা কথাই আমার কানে এল। ও তখন বাক্স থেকে টাকা তুলে গুণতে লাগল। টাকাগুলি যেন জ্বল্ জ্বল্ করছিল। নিজের প্রাপ্যটা রেখে দশটাকার বাকীটা আমায় ফেরত দিতে গিয়ে বললে, 'এই নিন। নমস্কার!'

মুহূর্ত্তকাল দাঁড়িয়ে টাকা ও ভাঙানিগুলির দিকে তাকালাম কোথাও যে একটা কিছু ভুল হয়েচে সে বিষয়ে বেশ সচেতন ছিলাম। আমি আর এতটুকু ভাবতেও পারলাম না; ভাল-মন্দ কোন কথাই মনে এল না—হাতের মুঠোতে এই যে আপনা থেকেই ঐশ্চর্য্য এসে পড়ল তাতেই হতভম্ব হয়ে গেলাম। যন্ত্রের মত হাত বাড়িয়ে টাকাগুলি তুলে নিলাম।

খানিকক্ষণ বোকার মত বিস্ময়ে অবাক হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম, যেন অসাড় অবশ হয়ে গেছি আমি। দরজার দিকে এক পা এগিয়ে গেলাম, আবার তক্ষুণি থেমে গেলাম। দেয়ালের দিকে একবার ফিরে তাকালাম। সেখানে চামড়ার

বথ্‌লশে একটি ছোট্ট ঘণ্টা ঝুলান রয়েচে। তার নীচেই দড়ির একটা পুটুলি—এই সব জিনিষের দিকেই আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হল।

দোকানী-ছেলেটার কেন মনে হল যে, আমি যখন যাই-যাচ্চি করেও নড়চি না তখন হয় ত একটু আলাপসালাপ করাই আমার উদ্দেশ্য, তাই সে কাউণ্টারের উপর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পুলিন্দা বাঁধা কাগজগুলি গুছিয়ে রাখতে রাখতে বললে, 'বেশ শীত পড়ে আসচে, কেমন নয়?'

জবাব দিলাম, 'তা হবে। সত্যি একটু একটু শীত পড়ে আসচে।' এবং একটু পরেই আবার বললাম, 'কিছুই অসময়ে আসে না, সময় হলেই আসে।'

সবগুলি কথাই স্পষ্ট কানে গেল এবং তক্ষুণি মনে হল যে, কথাগুলি যেন আমার নয়, আর কেউ বলচে। কথাগুলি যেন নিছক অনিচ্ছায় না-জেনে সম্পূর্ণ অচেতন অবস্থায় আউড়ে যাচ্চি।

ছেলেটি বললে, 'আপনি কি তাই মনে করেন নাকি?'

টাকা ও ভাঙানিগুলো তখন ডান হাতের মুঠোশুদ্ধ পকেটে ঢুকিয়ে দিলাম। এবং দরজা খুলে বার হয়ে এলাম। তাকে যে 'নমস্কার' জানিয়েছিলাম তাও কানে এল, এবং সেও যে জবাবে প্রতি-নমস্কার জানিয়েছিল তাও কান এড়াল না।

দোকান থেকে বার হয়ে কয়েক পা এগিয়ে যেতেই ছেলেটি বাইরে বেরিয়ে এসে আমায় ডাকল। বিস্মিত বা কিছুমাত্র

কুণ্ঠিত বা ভীত না হয়ে তার কাছে ফিরে গেলাম। এবং সঙ্গে সঙ্গেই টাকা ও ভাঙানিগুলি হাতে নিয়ে তাকে ফেরত দিতে প্রস্তুত হলাম।

ছেলেটি কিন্তু বললে, 'আপনি যে মোমবাতিটা ভুলে ফেলে গেছেন!'

গম্ভীর সংযত কণ্ঠে জবাব দিলাম, 'তাই নাকি। ধন্যবাদ! বাঁচালে ভাই, নইলে আবার ঘুরে আসতে হত।' মোমবাতিটি হাতে নিয়ে অলস মন্থর গতিতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম।

আমার যখন চেতনা ফিরে এল তখন সর্ব্বাগ্রে টাকার কথাটাই আমার মনে হল। একটা ল্যাম্প-পোস্টের সামনে গিয়ে টাকাগুলি একবার গুণে দেখলাম এবং হাতে ওজন করে দেখতেও ছাড়লাম না, এবং সঙ্গে সঙ্গে হাসি সংবরণও অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল, কেননা, এ টাকাটা অস্বাভাবিক উপায়ে মিলে যাওয়ায় আমার যে অসীম উপকার হয়েচে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। কী সুবিধাই না হবে! বেশ দিন কয়েক এ দিয়ে চলে যাবে। পকেটে টাকাগুলি রেখে হাত দিয়ে সেগুলি ছুঁয়ে হেঁটে চললাম।

গ্রাণ্ড ষ্ট্রীটে এক খাবারের দোকানের সামনে গিয়ে থম্‌কে দাঁড়ালাম। মনে হল যে, সামান্য কিছু জলযোগ করে নিলে মন্দ হয় না। বাইরে থেকে কাঁটা-চাম্‌চে ও ডিসের ঝন্ ঝনানি

শুনতে পেলাম। লোভ সামলান মুশ্‌কিল হয়ে দাঁড়াল, তাই দোকানে ঢুকে বলে উঠলাম, 'এক প্লেট মাংস দাও ত।' মেয়ে-খানসামাটি বলে উঠল, 'কতটুকু মাংস আন্‌ব ?'

দরজার পাশের একখানা ছোট্ট টেবিলে বসে পড়ে খাবারের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। যেখানটায় বসে ছিলাম সেখানটায় বেশ অন্ধকার। কাজেই আমাকে বড় কেউ একটা লক্ষ্য করতে পারবে না জেনে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম এবং গভীর ভাবে ভাবতে শুরু করে দিলাম। মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসুর দৃষ্টিতে মেয়েটি আমার দিকে চাইছিল। জীবনে আজ প্রথম অসাধু হলাম—চুরি করলাম! এর তুলনায় বাল্যকালের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি কিছুই নয়—এ আমার জীবনের প্রথম স্খলন।... তা বেশ! এখন ভেবে আর কি হবে, যা হবার তা ত হয়েই গেছে। ব্যাপারটা দোকানের মালিকের সঙ্গে মিটিয়ে ফেললেই চলবে 'খন, সুযোগ সুবিধার প্রতীক্ষায় থাকাই ঠিক। এখন আর এ নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার দেখছি নে। আমার চাইতে সাধু উপায়ে জীবন যাপন করতে ত আর একটা কাউকে দেখি নি ; আমার সঙ্গে ত কোন চুক্তি নেই যে ...

'কই, মাংস দিতে এত দেরী হচ্ছে কেন ?'

বালিকা বললে, 'এই যে, এখুনি নিয়ে আসচি।' বলেই সে দরজা খুলে রান্নাঘরের দিকে একবার তাকিয়ে দেখল।

কিন্তু ধর, ব্যাপারটা একদিন হয় ত জানাজানি হয়ে যেতে পারে। দোকানী-ছেলেটির মনে যদি কোনরূপ সন্দেহ আসে তা হলে সেই খদ্দের স্ত্রীলোকটির দেওয়া-নোটের ভাঙানি সম্পর্কে আমার কথাটা তার মনে পড়ে যেতে পারে। একদিন না-একদিন যে সে এটা জানতে পারবেই সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। হয় ত এবার যে দিন সেই দোকানে যাব সেই দিনই সে আমায় ধরে ফেলবে। তখন কি উপায় হবে ?—হা ভগবান ! ... আপনার মনেই একবার মাথাটা নাড়লাম।

খানসামা-মেয়েটি টেবিলে মাংসের প্লেটখানা দিতে গিয়ে বললে, 'এখানটায় বেজায় আঁধার, আর একটা কামরায় গিয়ে ইচ্ছে করলে বসতে পারেন।'

জবাব দিলাম, 'না, ধন্যবাদ ! এখানেই বেশ আছি।'

মেয়েটির সহৃদয়তা তৎক্ষণাৎ আমার অন্তর স্পর্শ করল। মাংসের দাম তখুনি দিয়ে দিলাম এবং সবগুলি ভাঙানি পয়সা তার হাতে গুঁজে দিয়ে তার আঙুলগুলি নিজেই মুঠো করে দিলাম। মেয়েটি হাসল। কৌতুক করে তাকে বললাম, 'মাংসের দাম দিয়ে বাকী পয়সাটায় তুমি জমিদারী কিনো ... সত্যি বাকী পয়সাটা তুমিই নিয়ো, খুশী হয়েই দিচ্ছি !

খেতে শুরু করে দিলাম। লোভীর মতই খাচ্ছিলাম, না চিবিয়েই সবখানি মাংস একে একে গিলে ফেললাম। এক

একবার গালপুরে মাংস নিয়ে না-চিবিয়েই ক্ষুধার্ত্ত পশুর মত তৃপ্তির সঙ্গে খেতে লাগলাম।

মেয়েটি ফের্ আমার সামনে এসে উপস্থিত হল।

'পান করবার জন্যে কিছু চাই কি আপনার?' মেয়েটি আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করল। আমি তার দিকে তাকালাম। ও ভারি লাজুক, খুব নীচু গলায় কথা বলল, একবার চোখও বুজলো। বলল, 'আমি বলছিলাম কি একপাত্র 'এল্' পান করুন, না হয় যা আপনার খুশী তাই নিতে পারেন ... আমি দিতে পারি ... পয়সা লাগবে না ... অবশ্য আপনার যদি কোন অপত্তি ...

জবাব দিলাম, 'না, ধন্যবাদ। আজ নয়, আর এক সময় হবে।'

পিছন ফটে ও গিয়ে ওর টুলখানায় বসে পড়ল। ওর মাথাটা তখন কেবল নজরে এল। কী আশ্চর্য্য মানুষ!

খাওয়া শেষ হতেই দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। গা বমি বমি করছিল। আমায় দেখে ও উঠে দাঁড়াল। আমার কিন্তু আলোর সামনে যেতে কুণ্ঠাই হচ্ছিল, কারণ আমার জামা-কাপড় মোটেই ভদ্রগোছের নয়, এ অবস্থায় মেয়েটির সামনে যাওয়া ঠিক নয়। কি যে দারুণ অভাবের তাড়নায় তিল তিল করে মরণের পথ ধরে চলেচি, ও ত তা আন্দাজও করতে

পারে নি। তাই ওকে সম্ভাষণ জানিয়ে তাড়াতাড়ি বার হয়ে এলাম।

পেটে খাবার পড়তেই অত্যন্ত ক্লেশ অনুভব করতে লাগলাম। ভারী কষ্ট হতে লাগল। খাবারটা কিছুতেই পেটে ধরে রাখতে পারলাম না। একটু আঁধার কোণ পেয়েই খানিকটা বমি করলাম। এমন ক'রে ক'রে পথ চললাম। বমির ভাবটাকে দূর করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা চলল। মনে হল, এ যেন আমায় একদম খোলস করে ছাড়বে, ফুটপাথে পা ঠুকে ঠুকে, লাফ দিয়ে দিয়ে বমির ভাবটাকে দূর করতে চেষ্টা পেলাম; কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। অবশেষে ছুটে একটা গলি-পথে ঢুকে পড়ে আর একবার বমি করলাম। চোখের জলে কিছুই দেখতে পারছিলাম না। ভারী দুঃখ হল, কেঁদে কেঁদে পথ চলতে লাগলাম ... যে নিষ্ঠুর নিয়তি আমায় ক্রমাগত নির্য্যাতন করছে, সে যেই হোক, তাকে প্রাণপণে অভিশাপ দিলাম, তার যেন নরকেও না স্থান হয়—নরকের চাইতে ভীষণতর কোন জায়গায় যেন অনন্তকাল তাকে এ রকম নির্যাতন সইতে হয়। বাস্তবিক, পুরুষকারের কোনই হাত নেই;—নিয়তি—নিয়তিই মানুষকে খেলিয়ে নিয়ে বেড়ায়। মানুষের কোন শক্তি নেই, কিছু করতে পারে না সে।

একটা লোক একটা দোকানের জানালার দিকে চেয়ে কি

দেখছিল। চট করে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করে বললাম, 'মশাই, বলতে পারেন দীর্ঘকাল অনাহারের পর একটা লোক কি খেতে পারে? তার অবস্থা বড় খারাপ, কিছুই তার পেটে থাকচে না, সবই বমি হয়ে বেরিয়ে আসচে।

লোকটি একটু বিস্মিত হয়ে জবাব দিল, 'শুনেচি এ অবস্থায় লোকে গরম দুধের ব্যবস্থাই দিয়ে থাকে। কার এমন হয়েচে জিজ্ঞেস করতে পারি কি?'

বললাম, 'বহু ধন্যবাদ! গরম দুধের ব্যবস্থাটা মন্দ হবে না হয় ত।' এই বলে চলে এলাম।

পথে যে কাফিখানাটা সব প্রথম নজরে পড়ল সেখানেই ঢুকে পড়ে খানিকটা গরম দুধ চেয়ে নিয়ে চোঁ করে সবটা গিলে ফেললাম। এবং দাম দিয়ে চলে এলাম। এবারে ঘরের দিকের রাস্তা ধরে চলতে লাগলাম।

বাড়ীর কাছে আসতেই এক ভারী মজার ব্যাপার হল। আমার দরজার সুমুখে যে ল্যাম্প-পোস্‌টটা ছিল তারই নীচে যেখানটায় ছায়াটা পড়েচে ঠিক সেই দিকে পোস্‌টটা হেলান দিয়ে কে একজন দাঁড়িয়ে রয়েচে দেখতে পেলাম। দূর থেকেই তাকে চিনতে পেলাম—সেই কালো পোষাক-পরা মেয়েটি। আরো কয়দিন সন্ধ্যাবেলায় ওকে এমনি পোষাকে ওইখানটায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেচি ভুল হবার ত কথা

নয়, ঠিক সেই স্ত্রীলোকটিই বটে। আজ নিয়ে ওকে ওই জায়গাটিতে চারদিন দেখলাম। নিশ্চল অবস্থায় দাঁড়িয়েছিল। ব্যাপারটা আমার কাছে এত অদ্ভুত ঠেকল যে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমার গতি শ্লথ হল। মাথাটা তখন দিব্য পরিষ্কার, ভাবতে কোনই গোল হচ্ছিল না, কিন্তু এবারে খাওয়ার ফলে উত্তেজনাটা ভারী বেড়ে গেছল, স্নায়ুগুলি যেন একেবারে ক্ষেপে গেছে। যথারীতি তার সামনে দিয়ে চলে এসে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকতে যাব ঠিক সেই মুহূর্তে সহসা কেন যেন দাঁড়ালাম। হঠাৎ কি একটা খেয়াল আমায় পেয়ে বসল। না ভেবেচিন্তে সটান্ স্ত্রীলোকটির সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তার মুখের দিকে তাকিয়ে মাথা নীচু করে তাকে অভিবাদন করলাম, 'নমস্কার!'

ও প্রত্যভিবাদন করে 'প্রতি-নমস্কার' জানাল।

ও কি চায়? আরো কয়বার ওকে লক্ষ্য করেচি। ওর কি কোনরকম সাহায্য দরকার? এরূপ অসঙ্গত প্রশ্নের জন্যে ওর কাছে মাপও চাইলাম।

হ্যাঁ, সে ঠিক জানে না ...

এ বাড়ীতে আমি, আর তিনচারটি ঘোড়া ছাড়া আর কেউ থাকে না। এ একটা আস্তাবল, একপাশে এককালে কাঁসাপিতলের বাসন মেরামতের দোকান ছিল, সেইখানটাতেই

আমি থাকি। ... এখানে যদি ও কারুর সন্ধানে এসে থাকে ত ভুল করেচে নিশ্চয়।

ও মাথা নেড়ে বললে, 'আমি কাউকে চাই নে। খামকা দাঁড়িয়ে আছি মাত্র—আমার এ একটা খেয়াল। আমি ...' বলতে বলতে সে থেমে গেল।

তাই কি! একমাত্র খেয়ালের বশে দিনের পর দিন ও এখানে দাঁড়িয়ে থাকে! আশ্চর্য্য!

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা তলিয়ে দেখলাম। যতই ভাবলাম ততই জটিলতা বেড়ে গেল। ওকে নিয়ে একটু খেলব মনে করলাম। পকেটের টাকাগুলি একবার বাজালাম। এবং আর কিছু না ভেবেই ওকে বলে বসলাম, 'এসো না কোথাও গিয়ে এক পাত্তর পান করা যাক।' ... খুব ঠাণ্ডাটাই পড়েচে, কেমন, না? হাঃ হাঃ! ... বেশীক্ষণ লাগবে না ... হয় ত ও ....

ও কিছু পান করবে না বললে। ধন্যবাদও জানাল। না! আমার সাথে একপাত্র পান করতেও পারে না ও; আচ্ছা ওকে যদি একটু এগিয়ে দিয়ে আসতে চাই ত ও কি দয়া করে তাতে রাজী হবে না? ও ... খুব অন্ধকার হয়ে আসচে, কাল জোহান পল্লী দিয়ে এত রাত্রিতে ওর পক্ষে একা যাওয়া ঠিক হবে না।

উভয়ে এগিয়ে চললাম; ও আমার ডান পাশে।

*

ব্যাপারটা অদ্ভুত হলেও ভারী ভাল লাগছিল। একটি নারীর নিকটতম সান্নিধ্য পাওয়ায় মনটা উৎফুল্ল হয়ে উঠল। সারাটা পথ কেবল ওর দিকেই চেয়ে ছিলাম। ওর চুলের গন্ধ, দেহের থেকে যে একটা তাপ বার হয়ে আসছিল তা, বেশভূষার সুগন্ধ, এবং প্রতি বারে আমার দিকে চেয়ে ও যে মিষ্টি নিঃশ্বাসটুকু ছাড়ছিল—সবঁশুদ্ধ মিলে আমার সকল ইন্দ্রিয়কে একেবারে অবশ করে তুলল। অবগুণ্ঠনের ভিতর দিয়েও ওর পাণ্ডুর মুখখানা ও সমুন্নত বক্ষঃস্থল নজরে এল। ঢিলা জামাটির অন্তরালেই ওর সকল সৌন্দর্য্য ঢাকা রয়ে গেছে। তাই অবগুণ্ঠন আমাকে একেবারে দিশেহারা করে ফেলল এবং অকারণে নির্ব্বোধের মত আমার সকল অন্তর তৃপ্তিতে ভরে উঠল। আর যেন তা সইতে পারছিলাম না। হাতখানা আস্তে আস্তে ওর কাঁধে তুলে দিয়ে জড়ের মত হেসে ওঠলাম।

বললাম, 'কি অদ্ভুত তুমি!'

'সত্যিই নাকি? কিসে?'

প্রথমত, দিনের পর দিন সন্ধ্যাবেলা একটা আস্তাবলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবার অভ্যাস ওর আছে, আর তাও বিনা উদ্দেশ্যে, নিছক খেয়ালের খুশীতে।...

ওর হয় ত অমনি ভাবে দাঁড়িয়ে থাকার সুসঙ্গত কারণ আছে; তা ছাড়া, ও হয় ত বেশী রাত্রি পর্য্যন্ত বাইরে কাটাতে

ভালবাসে; এতে কিন্তু ওর উৎসাহের কিছুমাত্র কমতি দেখা যায় নি। আমি কি রাত বারোটার আগে শোবার নামটি করে থাকি?

আমি? দুনিয়ায় যদি কোন জিনিষ কায়মনোবাক্যে ঘৃণা করে থাকি ত সে হচ্চে রাত বারোটার আগে শোয়া।

এদিকে ওর অবস্থাও দেখচি আমারই মত। ও প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় একটু বেড়াতে বার হয়, তখন কোনরকম কাজ থাকে না কি না। ও সন্ত্ ওলেভ্স্ প্লেস-এ থাকে।

আমি বলে উঠলাম, 'ল্যাজালি!'

'তার মানে?'

মানে—'আমি কেবল বললাম—'ল্যাজালি' ... মন্দ কি। তার পর ...'

ওর মায়ের সঙ্গে ও সন্ত্ ওলেভ্স্ প্লেস-এ থাকে। তাই ও বড় নিঃসঙ্গ। মায়ের সঙ্গে কোন রকম কথাবার্ত্তা চলে না, কারণ সে কালা। কাজেই এই সময়টা একটু বাইরে বেড়িয়ে আসাটায় কি তেমন কোন খারাপ কাজ করা হয়?

জবাব দিলাম, 'মোটেই না।'

'না। বেশ, তারপর?'

ওর কণ্ঠস্বর শুনে বুঝলাম যে, ও হাসচে।

ওর একটি বোন আছে না?

৫

হাঁ ; বড় বোন। কিন্তু আমি তা জানলাম কেমন করে? সে হ্যাম্‌বার্গ গিয়েচে।

'সম্প্রতি গেছে ?'

'হাঁ, পাঁচ সপ্তাহ আগে।' কার কাছ থেকে জানলাম এ সব কথা ?

আমি জানতাম না, জিজ্ঞেসা করলাম মাত্র।

এর পর কিছুক্ষণ আমরা কথাবার্ত্তা বন্ধ রাখলাম। একটা লোক আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেল, তার হাতে এক জোড়া জুতো। বলতে গেলে রাস্তায় তখন লোক চলাচল বড় একটা ছিল না। টিভলীতে সারি সারি অনেকগুলি রঙিন আলো জ্বলছিল। বরফও পড়ছিল না, আকাশ দিব্য পরিষ্কার!

সহসা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে মেয়েটি আমার দিকে চেয়ে বলে উঠল, 'আচ্ছা, তুমি ত দেখচি ওভার-কোট গায়ে দাও নি, তোমার ঠাণ্ডা লাগে না ?'

ওভার-কোট কেন গায়ে নেই সে কথা ওকে বলব ? তাহলে যে আমার দুর্দ্দশার কাহিনী শুনে ও ভয়ে এখুনি পালিয়ে যাবে। আজই ত প্রথম, আর আজই শেষ! তা হোক, তবু ওর পাশে হেঁটে বেড়াতে কি আরাম! যতক্ষণ পারি আমার অবস্থটার কথা ওকে না জানানই ভাল। তাই মুখ দিয়ে মিথ্যাই বার হয়ে এল। বললাম, 'কই, না ; তেমন ত ঠাণ্ডা লাগচে না।'

বলেই প্রসঙ্গটাকে চাপা দিবার মতলবে ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা, টিভলীর নতুন চিড়িয়াখানাটা দেখেচ ?'

ও জবাব দিল, 'না। দেখবার মত কিছু সেখানে আছে কি ?'

আচ্ছা, ও যদি সেখানে যেতে চেয়ে বসে ? সেখানে আলোরও অভাব নেই, লোকজনও প্রচুর। ও তার মাঝে আমার সঙ্গে গেলে লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠবে আর তখনই ত আমায় আবার ওকে নিয়ে এই কদর্য্য চেহারা ও নোংরা জামাকাপড় পরেই ফিরে আসতে হবে। ও হয় ত দেখে ফেলেচে যে, আমার ওয়েস্‌ট্‌-কোটটা পর্য্যন্ত নেই! ...

তাই তাড়াতাড়ি বলে বসলাম, 'না, তেমন বিশেষ কিছু দেখবার নেই!'

সঙ্গে সঙ্গেই মাথায় অনেকগুলি মজার মতলব এসে গেল এবং একে একে সেগুলিকে ব্যবহারে আনলাম। সেগুলি আমার রিক্ত নিস্ব ফতুর মস্তিষ্কের অসংলগ্ন মনোভাব ছাড়া আর কিছুই নয়, অর্থ-হীন বাক্য মাত্র। বললাম, অতটুকু চিড়িয়াখানায় আর এর চাইতে বেশী কি আশা করা যেতে পারে ? মোটের উপর খাঁচায় আবদ্ধ জীব-জন্তুদের দেখতে আমার কোন রকম উৎসাহই নেই। পশুরা জানে যে, বাইরে দাঁড়িয়ে কারা সব তাদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে; তাদের দিকে শত শত কৌতূহলী দৃষ্টির নিক্ষেপ তারা অনুভব

করতে পারে ; তারা এ সব বিষয়ে বেশ সচেতন, সব বোঝে সব জানে। না ; এমন পশুপক্ষী দেখতে আমার ভাল লাগে যারা তাদের যে কেউ দেখচে তা জানে না ; যে সব ভীরু প্রাণী তাদের নীড়ে আরামে থেকে ছোট ছোট সবুজ চোখে মিট্‌মিট্‌ করে তাকায় আর হাত-পা চাটে, আপনার মনে সুখে সচ্ছন্দে বাস করে, তাদেরই দেখতে আমার খুব ভাল লাগে, অথচ তাদের যে দেখ্‌চি তা তারা জানবে না।

হাঁ ; ঠিকই বলেচি আমি।

আমার ভাল লাগে বন্যপশুদের—যখন তারা বনানীর মুক্ত-প্রান্তরে তাদের জন্মভূমিতে ঘুরে বেড়ায়। রাত্রির অন্ধকারের মসীছায়ায় শব্দহীন সঙ্কুচিত পদচারণ শব্দ—অন্ধকারে বনানীর দৈত্যের মত তারা চলে ফিরে ; উড়ে-যাওয়া পাখীর হঠাৎ-জাগা আর্ত্তস্বর ; রক্তের গন্ধ বাতাসের সাথে, তারি সাথে হাওয়ার হাহাকার ; শূন্যের মহাশায়রে শব্দের নিত্য আবর্ত্ত ; বন্যতার বিলাসভূমিতে হিংস্রতার অধিষ্ঠাতা দেবতার এমনই সব আত্মবিকাশ বড় ভাল আগে আমার ... ভাল লাগে অজানা ভাষায় অজানার সঙ্গীত ! ... কিন্তু ভয় হল পাছে ও বিরক্ত হয়।

আমার সে সুবিপুল দারিদ্র্যের কথা এতক্ষণ ভুলেই ছিলাম, আবার তা নূতন করে জেগে উঠে আমায় যেন একেবারে গিলে ফেলতে লাগল। আজ যদি আমার ভদ্রোচিত পোষাক পরা থাকত তাহলে

ত একে নিয়ে টিভলীতে বেড়াতে যাওয়ার . সৌভাগ্য হত। একে বুঝতে পারচি নে এর কেমন রুচি,—এক অর্দ্ধ-উলঙ্গ ভিক্ষুকের সঙ্গে কার্ল জোহান ষ্ট্রীট ঘুড়ে বেড়াল! ও কি ভাবচে? আর আমিই বা কেন নির্ব্বোধের মত খামকা ঘুরে মরচি? এই সুবেশা নারীর ফাঁদে নিজেকে ধরে দেবার কি কোন সুসঙ্গত কারণ আছে? হতে পারে এতে আমার কিছুমাত্র চেষ্টাও করতে হয় নি কিন্তু তা বলেও ত বরফের মত কন্‌কনে বাতাস আমায় রেহাই দিচ্চে না। মাসের পর মাস অনাহারে আজ আমার মাথার কিছুমাত্র ঠিক নেই, মাথা একদম গুলিয়ে গেছে। অথচ ঘরে গিয়ে যে খানিকটা গরম দুধ খাব তারও জো নেই— ও সঙ্গে রয়েচে যে! এই অবস্থায় একমাত্র গরম দুধই আমার সইবে। ও কেন আমায় ছেড়ে দিয়ে যেখানে খুশী চলে যায় না? ...

বুদ্ধি ঘুলিয়ে গেল; হতাশা আমার অবস্থা একেবারে চরম করে ছাড়ল। মেয়েটিকে বললাম, 'ওগো শুনচ, ভেবে দেখলাম যে, আমার সঙ্গে তোমার বেড়ান উচিত নয়। আমি আসলে যা-ই হই না কেন, এ জীর্ণ পোষাক-পরিচ্ছদে আজ যে দুনিয়ার সকলকার চোখেই আমি একটা পুরাদস্তুর কলঙ্ক। হাঁ, এ একেবারে খাঁটি সত্য। কাজেই আমার সঙ্গ যত না হয় ততই তোমার পক্ষে মঙ্গল।'

ও আতকে উঠে তাড়াতাড়ি আমার দিকে তাকাল কিন্তু একটি কথাও কইল না। খানিক বাদে হঠাৎ ও বলে উঠল, 'তাই নাকি! তা হোক না, তাতে কি!'

আর কিছু বলল না।

ওকে শুধোলাম, 'তার মানে?'

'ওঃ, না, তুমি আমায় ভারী লজ্জা দিলে।... এখনো বেশী দূরে আসি নি।' বলে ও আরো একটু জোর পায়ে হেঁটে চলল।

আমরা ইউনিভার্সিটি ষ্ট্রীটের দিকে এগিয়ে চললাম। এবং দূর থেকে সন্ত-ওলেভ প্লেশ-এর আলোগুলি নজরে এল। তখন আবার ওর গতি শ্লথ হয়ে গেল।

বললাম, 'ছাড়াছাড়ি হবার আগে তোমার নামটি কি বলবে না? মুহূর্ত্তের জন্যে কি তোমার মুখের অবগুণ্ঠন সরিয়ে তোমার মুখখানা দেখার সৌভাগ্য আমার হবে না? বড় খুশী হব কিন্তু।'

একটু থামলাম। তারপর আশা নিয়ে আবার হাঁটতে আরম্ভ করে দিলাম।

ও বললে, 'এর আগেও আমায় দেখেচ।'

আমি বলে ওঠলাম, 'ল্যাজালি!'

'কি বললে? আর একবারও তুমি আমার পিছু নিয়ে ছিলে। সে দিন বাড়ীর দোর পর্য্যন্ত এসেছিলে। আচ্ছা, সে দিন কি তুমি নেশা করে ছিলে?'

ও হাসল, তাও শুনতে পেলাম।

বললাম, 'হাঁ। একটু বেসামালই ছিলাম বটে সে দিন।'

'কি ভয়ানক লোক তুমি!'

অনুতপ্ত হয়ে স্বীকার করলাম, আমার অন্যায় হয়েছিল।

ফোয়ারাটার কাছে গিয়ে পৌছুলাম। উপরের দিকে চেয়ে দেখি ড্ নম্বর বাড়ীর জানালাগুলি দিয়ে আলো দেখা যাচ্চে।

ও বললে, 'তোমায় আর এগুতে হবে না, এখান থেকেই বিদায় হচ্চি। এতটা পথ যে আমায় এগিয়ে দিলে তার জন্যে ধন্যবাদ।'

মাথা নোয়ালাম। আর কিছু বলতে সাহস হল না, মাথা থেকে টুপিটা খুলে নাঙ্গা মাথায় ওর সামনে দাঁড়ালাম। ভয়, হল, করমর্দ্দন করবে কিনা।

ও ওর জুতার গোড়ালির দিকে তাকিয়ে নীচু গলায় বললে, 'চল তোমায় একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।'

'সে ত আমার পরম সৌভাগ্য! যাবে, সত্যি?'

'যাব বটে, কিন্তু বেশী দূর নয়।'

একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়লাম। আমার তখন জ্ঞান ছিল কি না তাও ঠিক বুঝতে পারলাম না। ও আমার জ্ঞানবুদ্ধি সবই একদম ওলট-পালট করে দিল। ও যেন আমায় যাদু করেচে। আমি খুব খুশী। আবার মনে হল, যেন সর্ব্বনাশ করবার

জন্যেই ও আমায় টেনে নিয়ে চলেচে। ও নিজেই ফিরতে চেয়েচে, আমার ইচ্ছায় নয়, নিছক ওরই খেয়াল। হেঁটে চলেচি এবং চলতে চলতে ওর দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম, সঙ্গে সঙ্গে আমার সাহস বেড়ে গেল। প্রত্যেকটি কথায় ভঙ্গীতে ও আমায় ওর দিকে আকৃষ্ট করছিল। মুহূর্ত্তের জন্যে আমার দারিদ্র্য, আমার সমস্ত শোচনীয় অবস্থার কথা একদম ভুলে গেলাম। ধমনীতে রক্তস্রোত তীব্র হয়ে বয়ে যাচ্ছিল। আপনার অবস্থাটা কৌশলে বুঝে নিব ঠিক করলাম।

বললাম, 'ভাল কথা, সেবারে ত আমি তোমার অনুসরণ করি নি, সে ত তোমার বোন।'

পরমবিস্ময়ে ও জবাব দিল, 'তাই নাকি, সে আমার বোন!'

হঠাৎ দাঁড়িয়ে ও আমার দিকে তাকাল এবং কি জবাব দিই, শোনবার জন্যে উৎসুক হল। ও খুব ধীর স্থির ভাবেই কথাটা বললে।

জবাব দিলাম, 'হাঁ, দুজনার মধ্যে যে আমার আগে আগে যাচ্ছিল সে-ই ত ছোট।'

ও আমার কথা শুনেই চেঁচিয়ে হেসে উঠল, 'ছোট? বাঃ বেশ ত!'

ও ওর সরল শিশুর মত দিলখোলা হাসি হেসে বললে, 'কী দুষ্টু তুমি, ঘোমটা তোলাবার জন্যেই ত এ কথা বললে, কেমন

কি না? আমার ত তাই মনে হয়; সে যাই হোক, তোমায় আরো একটু ভুগতে হবে ... এই তোমার শাস্তি।'

আমরা উভয়েই হাসতে হাসতে ঠাট্টাবিদ্রূপ করতে করতে চললাম। সারাক্ষণ আমাদের কথার আর বিরাম ছিল না। আমি আনন্দে খুশীতে এতটা তৃপ্ত ছিলাম যে, কি বলেচি তা জানি নে। ও বললে অনেক দিন আগে নাকি ও আমায় থিয়েটারে দেখেচে। আমার সঙ্গে একজন সঙ্গী ছিল, আমার অবস্থা তখন পাগলের মত। লজ্জার বিষয় সে দিনও আমি মাতাল হয়ে পড়েছিলাম।

ও কেন তা ভেবেছিল?

ওঃ, আমিও সেদিনে হাসতাম।

'বাস্তবিক; সত্যিই তখন আমিও প্রাণ খুলে হেসেচি।'

'কেন, আজকাল আর হাস না?'

'হাঁ হাসি বটে, তবে হাসতে গেলে কান্না আসে; যতদিন বেঁচে থাকা যায়, মন্দ কি!'

বলতে বলতে আমরা কার্ল জোহান-এ পৌঁছুলাম। ও বললে, 'আর এগুবো না।'

আমরা ইউনিভার্সিটি ষ্ট্রীট দিয়ে চলতে লাগলাম। যখন আবার সেই ফোয়ারাটার কাছে এসে উপস্থিত হলাম তখন চলার গতি একটু শিথিল করে দিলাম। কেননা, জানতাম যে, ওর সাথে আর বেশী দূর যেতে পারব না।

ও হেসে দাঁড়িয়ে বললে, 'এখান থেকেই তোমায় ফিরতে হবে।'

'বেশ। আমিও তাই মনন করেচি।'

মুহূর্ত্ত পরেই কিন্তু ও ভাবলে যে, আমি সদর দরজা পর্য্যন্ত ওর সঙ্গে ত অনায়াসেই যেতে পারি। তাতে ত আর দোষ থাকতে পারে না, পারে কি?

বললাম, 'না পারে না।'

আমরা যখন সদর দরজায় এসে দাঁড়ালাম, তখন আমার শোচনীয় অবস্থা আমায় যেন আর তিষ্টিতে দিচ্ছিল না। দুঃখে কষ্টে যখন কেউ একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়ে তখন তার পক্ষে সাহসে বুক বাঁধাটা কেমন করে সম্ভব? আমি এখানে ছেঁড়া ময়লা পোষাকে অনাহারে বিকৃত চেহারা নিয়ে এক তরুণীর সামনে দাঁড়িয়ে আছি, স্নান আহারও হয় নি আমার; বলতে গেলে একেবারে আধা-উলঙ্গ আমি, মাটীর সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দেবার পক্ষে আর কি আপত্তি হতে পারে? আপনা থেকেই নিজের অবস্থাটা বেশ বুঝতে পারলাম, মাথা নীচু করে বলে উঠলাম, 'তাহলে কি তোমার সঙ্গে আর সাক্ষাতের কোন সম্ভাবনাই নেই?'

ও যে রাজী হবে এ ভরসা আমার ছিল না। আমার ধারণা ছিল ও জোরের সঙ্গে 'না' বলবে এবং তা হলেই আমার চৈতন্য ফিরে এসে এ দিককার ঝোঁকটা কমিয়ে দেবে।

ও শুদ্ধ নীচু গলায় বললে, 'হাঁ।'

ওর কণ্ঠস্বর প্রায় অস্পষ্ট।

'কবে?'

'জানি নে।'

চুপচাপ। ...

বললাম, 'একবার একটি মিনিটের জন্যে কি দয়া করে তোমার অবগুণ্ঠনটি সরাবে না? এতক্ষণ কার সঙ্গে কথাবার্তা কইলাম তা জানতে চাওয়া নেহাৎ অসঙ্গতও হবে না আশা করি। বেশীক্ষণের জন্য নয়, মুহূর্তের জন্য মাত্র।'

আবার চুপচাপ। ...

ও বললে, 'আগামী মঙ্গলবার সন্ধ্যেবেলা এখানেই আমার সঙ্গে দেখা হতে পারে। আসবে?'

'নিশ্চয়, হুকুম যখন পেলাম তখন আর না আসব কেন?'

'এই সন্ধ্যা আটটায় এলেই হবে।'

'বেশ, তাই হবে।'

ওকে স্পর্শ করার খাতিরে একবার ওর বোরখাটায় হাত দিয়ে চাপ দিলাম। ও আমার এত কাছে, মনটা খুশীতে ভরে উঠল।

ও হাসতে হাসতে বললে, 'তুমি যেন আমার সম্বন্ধে সব কিছুই খারাপ ধারণা করে বসো না!'

'না।'

হঠাৎ চেষ্টা করে যেন ওর অবগুণ্ঠন কপাল অবধি তুলল। উভয়েই উভয়ের দিকে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে রইলাম।

'ল্যাজালি!' চেঁচিয়ে উঠলাম। ও দুই বাহু প্রসারিত করে আমার কণ্ঠ বেষ্টন করল এবং চট্ করে ডান গালে—ঠিক ডান গালে—একটি মাত্র চুম্বন এঁকে দিল।—ওর বক্ষঃস্থল কেমন দুলে দুলে উঠছিল আমি তা অনুভব করতে পারি—দপ্ দপ্ করে ওর শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছিল। হঠাৎ নিজকে আলিঙ্গনমুক্ত করে ও বেদম হয়ে অস্পষ্ট ভাবে 'নমস্কার' জানাল এবং ফিরে তথ্খুনি আর একটি কথাও না ক'য়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে চলে গেল।...

হল-ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

*　　　　*　　　　*

বরফ পড়ছিল। পরদিন আরো বেশী, বরফের সঙ্গে বৃষ্টির ধারাও মিশে গেছল। বড় বড় এক একটা বরফের থাণ্ডা মাটিতে পড়ে কাদার সঙ্গে মিশে কাদা হয়ে যাচ্ছিল। কেমন একটা আর্দ্র বাতাস বইছিল। একটু দেরীতেই ঘুম ভাঙল। রাত্তিরের সেই উদ্দাম চাঞ্চল্য, সে মিলন, সে

বুভুক্ষা

সাহচর্যের মাদকতা তখনো আমার ছিল, তাই মাথাটা যেন কেমন গুলিয়ে গেছল। জাগ্রত অবস্থায় শুয়ে শুয়েও কেন মনে হচ্ছিল যে, ল্যাজালি আমার পাশেই রয়েচে। আনন্দে উল্লসিত হয়ে দুই হাত বাড়িয়ে নিজেই নিজেকে আলিঙ্গনবদ্ধ করে শূন্যে চুম্বন বর্ষণ করতে লাগলাম। শেষে অনেক কষ্টে বিছানা ছেড়ে এক কাপ গরম দুধ সংগ্রহ করলাম। এবং সোজা ঘরের বার হয়ে রেস্তরাঁ থেকে খানিকটা মাংস কিনে খাওয়া গেল। ক্ষুধা নেই বটে কিন্তু দেহের স্নায়ুতন্ত্রীগুলি একরকম অসাড় হয়ে পড়েচে যেন।

বাজারে ঢুকে কাপড়ের দোকানের দিকে গেলাম। মনে হল, সস্তায় একটা পুরোনো ওয়েস্ট্-কোট কেনবার চেষ্টা দেখলে হয়। কোটের নীচে পরবার মত যে কিছুই নেই, একটা কিছু হলেই হয়।

সারি সারি জামার দোকান। তারই এক দোকানে একটা ওয়েস্ট্-কোট দেখছিলাম। এমন সময় একজন চেনা-লোক এসে সেখানে উপস্থিত হল। সে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আমার নাম ধরে ডাকল এবং নমস্কার জানাল। ওয়েস্ট্-কোটটি যথাস্থানে ঝুলিয়ে রেখে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। সে নক্সা তৈরী করে। অফিসে যাচ্ছিল।

আমায় বললে, 'এসো না, এক গ্লাস বিয়ার খাওয়া যাক। বেশী দেরী করতে পারব না, সময় হয়ে গেছে। ... কাল রাত্তিরে যে স্ত্রী-লোকটিকে নিয়ে বেড়াচ্ছিলে সে কে হে ?'

তার এ খোলামেলা প্রশ্নে একটু বিরক্ত হয়েই বললাম, 'কেন? ও যদি আমার প্রেয়সীই হয়!'

সে বিস্মিত হয়ে বলে উঠল, 'তাই নাকি হে!'

'কাল যে সব ঠিকঠাক হয়ে গেল।'

এ-কথা শুনে ও কি করবে কিছুই স্থির করতে পারলে না। ও আমার কথা অক্ষরে অক্ষরে একান্ত ভাবে বিশ্বাস করল। ওর হাত এড়াবার জন্যে একটি চমৎকার মিথ্যা অবলীলাক্রমে বলে ফেললাম। দোকানে ঢুকে বিয়ার দিতে বললাম, চোঁ করে সবটা গিলে ফেলে বেরিয়ে এলাম।

'আচ্ছা, তাহলে আসি। ভাল কথা, শোন।' ও হঠাৎ বলে উঠল, 'তুমি আমার কাছে কয়েকটা টাকা পাবে। অনেকদিন হয়ে গেল, লজ্জার বিষয় যে এতদিন দিতে পারি নি। সে যাই হোক, দিন কয়েকের মধ্যেই দিয়ে দেবো।'

জবাব দিলাম, 'বেশ, ভাল কথা!'

আমি কিন্তু জানতাম টাকা কয়টা ও আর দেবে না। বিয়ারটা সোজা আমার মাথায় গিয়ে চড়াও হল। আগের দিন সন্ধ্যাবেলাকার কথা মনে হয়ে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লাম—বুদ্ধিসুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়ে গেল। আচ্ছা, মঙ্গলবারে যদি ল্যাঞ্জালি দেখা না করে? যদি সবকিছু ভেবে চিন্তে দেখে ওর মনে সন্দেহ আসে ... কিন্তু কিসের সন্দেহ? ... চিন্তাগুলি

একবার ধাক্কা খেয়ে টাকার খাদ দিয়ে বয়ে চলল। ভারী ভয় পেয়ে গেলাম, নিজের জন্যই সাংঘাতিক ভয় পেলাম।

কেমন করে ছেলেটাকে ঠকিয়ে টাকাগুলি আত্মসাৎ করেছিলাম—সবকিছু বিস্তারিত ভাবে হুড়মুড় করে মনে পড়ে গেল। কল্পনার চোখে সেই ছোট্ট দোকানখানি, তার সেই কাউণ্টার, টাকাগুলি তুলে নেবার সময় আমার সে কম্পিত হাতখানি সবকিছু নজরে এল। গ্রেফ্‌তার করতে এসে পুলিশ যে ব্যবহার করবে কল্পনায় আমার সে রূপ দেখতে পেলাম, হাতে পায়ে হাত-কড়া, শিকল, না, কেবল হাতেই হাত-কড়া পড়াবে; হয় ত এক হাতেই শুধু কড়া লাগাবে; আদালতের সেই এজলাস, কাঠগড়া, জবানবন্দী, বিচারকের রায় লেখা, তার গুরুগম্ভীর ভীতিপ্রদ দৃষ্টি, তারপর ট্যানজেন মহাশয়ের কারাগারের সেই চির অন্ধকার কুঠরীতে অধিষ্ঠান ...

দূর হোক গে! হাতের মুঠো শক্ত করে ধরে মনে সাহস আনলাম এবং জোর পায়ে এগিয়ে গিয়ে অবশেষে বাজারে পৌঁছুলাম। সাম্‌নেকার একটা আসনে বসে পড়লাম।

ধরে নেওয়াটা ছেলেখেলা না, ধরলেই হোল কিনা! কে বলবে যে আমি চুরী করেছি, প্রমাণ কোথায়? তাছাড়া ছেলেটা কারুর কাছে এ কথা বলতে সাহসও পাবে না। একদিন না একদিন তার এ কথা মনে হতেও পারে কিন্তু তখন যে আর

কোন উপায়ই থাকবে না, কেননা এ কথা জানাজানি হয়ে গেলে তার চাকরী যাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা, চাকরী ওর কাছে ঢের দামী।

কিন্তু সে যাই হোক, এ টাকাটা পকেটে রেখে আমার মোটেই স্বস্তি ছিল না, এ যেন পাপের জগদ্দল পাথরের মত ভারী ঠেকছিল। আপনার মনে নিজের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলাম। স্পষ্ট মনে হল যে, আগে আমি ঢের বেশী সুখী ছিলাম। তখন হাজার দুঃখ কষ্টের মধ্যেও সম্মানের সঙ্গে দিন কাটাতাম। আর ল্যাজালি? যদি তাকে আমার এই পাপের হাতে স্পর্শ না করতাম। ভগবান, ভগবান, ল্যাজালি! আমি যেন তখন পাঁড় মাতাল, হঠাৎ লাফ দিয়ে ডাক্তারখানার সামনে যে এক বেটী বুড়ী কেকবিস্কুট বিক্রী করছিল তার কাছে চলে গেলাম। এখনো ত নিজেকে সকল অসম্মানের ঊর্দ্ধে তুলতে পারি, এখনো সময় আছে; বিশ্বকে দেখাব যে আমি তা পারি।

বুড়ীর কাছে যেতে যেতে পকেট থেকে টাকাটা হাতের মুঠোতে তুলে নিলাম। এবং বুড়ীর টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়লাম, যেন আমি কিছু কিনব। বিনা বাক্যব্যয়ে বুড়ীর হাতে টাকা পয়সাগুলি গুঁজে দিলাম। একটি কথা না বলেই পিছন ফিরে চলে গেলাম।

নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। সত্যি নিজেকে এখন সাধু বলেই

মনে হল। ট্যাঁক একেবারে খালি কিন্তু তা বলে মনে কোন অস্বস্তিই আর রইল না। আমি যে এখন টাকাটা দিয়ে ফেলে হাত সাফ্ করতে পেরেচি, এ কথা মনে হতেই ভারি তৃপ্তি হল। সমস্ত ব্যাপারটা আপনার মনে বিচার করে দেখে মনে হল, এই টাকাটা সত্যিই আমার মনে একটা অশান্তি এনে দিয়েছিল, অথচ সেটা আমি বুঝতে পারি নি। এই টাকাটার কথা যতই ভেবেছি ততই মনের মধ্যে একটা অস্বস্তির সঞ্চার হয়েচে। আমি ত আর নিষ্ঠুর নই, আমার স্বভাবত মানী স্বভাব এই হীনকাজে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। ভগবান তুমিই সত্যি, আবার আমার নিজের বিচারে আমি ঠিক জায়গায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেচি। বাজারে তখন লোকের ভিড় জমে গেছে, সেই দিকে তাকিয়ে নিজেই নিজেকে মনে মনে বলে উঠলাম, 'আমি যে রকমটা করলাম, তোমরাও সে রকম করো!' এক বুড়ী কেক-বিস্কুট বিক্রেতাকে এমন খুশী করে ফেলতে পেরেচি যে, সে আর কথাটিও কইতে পারল না। আজ ওর ছেলেমেয়েরা পেটভরে খেতে পাবে নিশ্চয়।... এ-কথা ভাবতেই আমার মনে এতটা আনন্দ এল যে, মনে হল আমি যা করলাম তা সকলকার আদর্শ।

ভগবান তুমিই সত্য! টাকা-পয়সা আর ট্যাঁকে একটিও নেই।

বুভুক্ষা

আধ-মাতাল ও আধ-ভীত হয়ে সারাটা রাস্তা ঘুরে বেড়ালাম এবং আত্মপ্রসাদে আমার অন্তরটা ভরে গেল। ল্যাজালির সঙ্গে নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ মন নিয়ে যে দেখা করতে পারব সে ভরসায় প্রাণে বড় আনন্দ হল। তার মুখের দিকে তাকাতে যে এখন আর আমার কোনই সঙ্কোচ নেই—এই কথাটাই বার বার ভাবছিলাম। কোন রকম ব্যথাবেদনা সম্বন্ধেই তখন আমার কোন জ্ঞান ছিল না। মাথাটা বেশ পরিষ্কার, আমার মনে হল, যেন মাথায় কোন গলদই আর নেই। উন্মাদের মত আচরণ আমার কিছুতেই ভাল লাগল না। ছেলেমানুষী করে গোটা শহরটাকে মাতিয়ে তুলতে স্বতই আমার অনিচ্ছা হল। সারাটা রাস্তা পাগলের মত চললাম। কান দিয়ে ভন্ ভন্ শব্দ হচ্ছে, দেহের সমস্ত রক্ত মাথায় চড়ে বসেচে, আমি তখন যেন একেবারে মাতাল। হঠাৎ কি খেয়াল হল, দৌড়ে গিয়ে পাহারাওলাটাকে আমার বয়সটা বলে বসলাম। সে কিন্তু একটি কথাও কইল না। সহসা তার হাত দুখানা ধরে তার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম কিন্তু পরক্ষণে তার হাত ছেড়ে দিয়ে, কিছু না বলে চলে এলাম। প্রত্যেকটি পথচলতি লোকের কণ্ঠস্বর ও হাসি ঠাট্টার সবকিছু পুঙ্খানুপুঙ্খ কানে আসছিল। রাস্তার উপর-ছোট ছোট পাখীগুলি আপনার মনে এখানে সেখানে কি সব খুঁটে খুঁটে খাচ্চে, কিছুই চোখ এড়াল না। ফুটপাথের প্রকাণ্ড

পাথরগুলি একান্ত মনোযোগের সঙ্গে দেখতে দেখতে চললাম—তাতে কত বিচিত্র দাগকাটা, এখানে-সেখানে কি যা-তা সব ছড়িয়ে রয়েচে। এমনি ক'রে ক'রে পার্লামেণ্ট প্লেশ-এ পৌঁছুলাম। সহসা কি মনে করে স্থাণুর মত নিশ্চল দাঁড়িয়ে পড়লাম। সামনে দিয়ে কত বিচিত্র রঙের ও বিভিন্ন আকারের মোটর, বাস্, ঘোড়ার গাড়ী, ট্রাম ইত্যাদি যাওয়া-আসা করচে; কোথাও বা গাড়োয়ান-কোচোয়ান, ড্রাইভার, সহিস মিলে গল্পগুজব করচে, তাদের সে দিল-খোলা উচ্চহাস্য দেখে মনে হল, তাদের যেন কারুরই কোন দুঃখ নেই, অভাব নেই। শীতে ঘোড়াগুলি ঠক্ ঠক্ করে কাঁপচে, চলতে তাদের একান্ত অনিচ্ছা, কিন্তু চাবুক তাদের চালিয়ে নিয়ে যাচ্চে। গা-ঝাড়া দিয়ে নিজেই নিজেকে বললাম, 'এগিয়ে চলো।' সামনেই যে গাড়ীখানা পেলাম তাতে উঠে পড়েই কোচোয়ানকে ৩৭ নং উল্লেভোল্ডস্‌ভেয়্যান-এ পৌঁছে দিতে বললাম। গাড়ী এগিয়ে চলল।

কোচোয়ান বার কয়েক বিস্মিত হ'য়ে আমার দিকে তাকিয়ে দেখছিল। ও কি আমায় সন্দেহ করচে নাকি? তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই; আমার এ নোংরা পোষাকই ওর দৃষ্টিকে আমার দিকে আকৃষ্ট করেচে।

আপনা থেকেই যেচে ওকে বললাম, 'একজনকার সঙ্গে আমার দেখা করতেই হবে।' আমার যে কি দরকার তাও গম্ভীরভাবে

তার কাছে বর্ণনা করলাম। সাইত্রিশ নম্বরের সামনে আসতেই গাড়ী থেকে লাফ দিয়ে নেমে তর্ তর্ করে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে তেতলায় গেলাম এবং একটা ঘরের কড়া ধরে নাড়লাম। কড়া নাড়ায় ভিতরেও একটা বিশ্রী শব্দ হল।

একটা ঝি এসে দোর খুলে দিল। তার কানে সোনার ইয়ারিং আর গায়ে ধূসর রংয়ের বডিস, তাতে সুন্দর সুন্দর চারটি কালো বোতাম। সে যেন ভয়ে ভয়েই আমার দিকে তাকাল।

তাকে বললাম যে, আমি কিয়েরুল্ফ্-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই। যোয়াচিম কিয়েরুল্ফ্—যে সে লোক নয়, তাকে ভুল হবার জো নেই।...

মেয়েটি মাথা নেড়ে জবাব দিল, 'ও নামের ত কেউ এখানে থাকে না।'

আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে সে দরজা বন্ধ করতে উদ্যত হল। লোকটিকে খুঁজে দেখবার মেহনতটুকুও সে নিতে চাইল না। সে এমন করে আমার দিকে তাকাল যে, আমি যাকে চাইচি, সে যেন তাকে সত্যই জানে, একবার সামান্য একটু ভেবে দেখলেই যেন তার পাত্তা মিলবে। পাজী কোথাকার! কুঁড়ের বাদশা যেন! ভারী বিরক্ত হলাম, তথ্খুনি পিছন ফিরে হন্ হন্ করে নীচে নেমে এলাম।

কোচোয়ানকে গিয়ে বললাম, 'সে এখানে নেই।'

'তিনি কি এখানে থাকতেন না?'

'না, টম্‌টেগ্যাদেন-এ নিয়ে চল, এগার নম্বরে।'

আমি তখন অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। কোচোয়ানটার মনেও ঠিক আমারই ভাবটা চারিয়ে দিলাম। ওর মনে হল, আমার দরকারটা হয় ত খুবই জরুরি, তাই সিধা গাড়ী হাঁকিয়ে চলল, আর কোন প্রশ্ন করলে না। ঘোড়াটা অনর্থক চাবুকের ঘায়ে জর্জ্জরিত হল।

কোচবাক্স থেকে পিছন ফিরে কোচোয়ান আমায় শুধোলে, 'ভদ্রলোকের কি নাম বললেন?'

'কিয়েরুল্‌ফ,—পশমের কারবার করে।'

কোচোয়ানেরও যেন কেন মনে হল যে, এর সম্বন্ধে কোন ভুলই কারুর হতে পারে না।

'আচ্ছা, তিনি কি সচরাচর একটা ডোরা-কাটা কোট পরে থাকেন?'

চেঁচিয়ে বলে উঠলাম, 'সে কি! ডোরা-কাটা কোট? তুমি কি পাগল হয়েচ, এ কি চায়ের বাটী যে ডোরা-কাটা হবে?'

ডোরা-কাটা কোটের প্রসঙ্গটা বড় অসময়ে উপস্থিত হল। এতে লোকটার সম্বন্ধে আমার যে ধারণা হয়েছিল তা একেবারে নষ্ট হয়ে গেল, কেননা এর পর আমার সে না-দেখা মানুষটি সম্বন্ধে আমার আর কোন উৎসাহই রইল না।

'ভদ্রলোকের নাম না কি বলেছিলেন ?—কিয়েরুল্ফ্ ?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিলাম। 'তাতে আশ্চর্য্য হবারই বা কি আছে ? নামটায় ত কারুর অসম্মান করচে বলে মনে হচ্চে না।'

'আচ্ছা, তাঁর মাথার চুল কি লাল ?'

তা—তা হতে পারে। তার লাল চুলের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোচোয়ানের ইঙ্গিতে হঠাৎ আমার মনে হলো যে, লোকটা ঠিকই বলেচে। বেচারা কোচোয়ানের প্রতি একটা কৃতজ্ঞতার ভাব জেগে উঠল। তাই তক্ষুণি তাকে বললাম যে, আমি যাকে খুঁজচি, কোচোয়ানও তাকে ঠিকই চিনেচে। এও তাকে বললাম যে, ভদ্রলোকের চুল যদি লাল রঙের নাই হয় ত সেটা যে নেহাতই অদ্ভুত ব্যাপার হবে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকতে পারে না।

'আমি যাঁর কথা বলচি, তিনিই যদি হন ত বলতে পারি, তিনি অনেকবার আমার গাড়ী ভাড়া খাটিয়েছেন। তাঁর হাতে সব সময়ই একগাছা মোটা লাঠি থাকে।'

এর থেকে লোকটি সম্বন্ধে আমার স্পষ্ট করেই ধারণা জন্মাল। 'হা, হা! ঠিক বলেচ, তিনি কখনো মোটা লাঠি ছাড়া চলেছেন, এ-কথা কেউই বলতে পারবে না। তুমি ঠিক ধরেচ, সত্যিই তাই।'

সত্যিই, তিনি এর গাড়ী ইতিপূর্ব্বে বহুবার ভাড়া নিয়েছেন

কোচোয়ান তাঁকে ঠিক চিন্‌তে পেরেচে। কেননা সে এমন তীব্র বেগে ঘোড়া ছুটিয়েচে যে ঘোড়ার খুরে আগুন ছোটে।

এই দারুণ উত্তেজনার মুখেও কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য আমি জ্ঞান হারাই নি। যেতে যেতে একটা পাহারাওয়ালা আমাদের সামনে পড়ল, তাকে পেরিয়ে যেতে যেতে তার নম্বরটা আমার নজরে পড়ল—উনসত্তর। তৎক্ষণাৎ এই 'উনসত্তর' সংখ্যাটা আমায় একেবারে পেয়ে বসল—এমন ভাবে পেয়ে বসল যে, ওটা যেন তীরের ফলার মত গিয়ে আমার মগজ ভেদ করে বসল—উনসত্তর —ঠিক উনসত্তর। এ সংখ্যাটা আমার কখনো ভুল হবে না।

সর্ব্বাঙ্গ এলিয়ে দিয়ে বসেছিলাম, এবং কত রকম উদ্ভট কল্পনাই না আমায় একান্ত পেয়ে বসল; গাড়ীর এককোণে গুড়িশুড়ি মেরে এমনি করে বসলাম যেন কেউ না আমায় দেখতে পায়। আপনার মনেই নিজের সঙ্গে বোকার মত ঠোঁট নেড়ে কথা কইতে শুরু করে দিলাম। একটা উন্মাদনা এসে অভিভূত করে ফেলল এবং তাকে ছাড়া দিলাম। ঠিক বুঝতে পারছিলাম যে, যে শক্তি আমায় একেবারে অভিভূত করে ফেলেচে তাকে সংযত করবার মত কোন শক্তিই আমার নেই। নিঃশব্দে, অনুরাগের সঙ্গে হাসতে আরম্ভ করে দিলাম। বলা বাহুল্য, সে হাসির কোন কারণ খুঁজে পেলাম না। যে কয় গ্লাশ মদ্যপান করেছিলাম তারই নেশা আমায় একটা অননুভূত পুলক এনে

দিল। একটু একটু করে উত্তেজনা কমে এল, ক্রমে শান্ত হয়ে এলাম। আহত আঙুলটা শীতে কন্‌কন্‌ করছিল, তাই সেটাকে একটু গরম করবার জন্তে কোটের কলারের মধ্যে দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দিলাম। ইতিমধ্যে টম্‌টেগ্যাদেন-এ এসে পৌঁছুলাম। কোচোয়ান গাড়ী থামাল।

তাড়াহুড়ো না করে অন্যমনস্কভাবে নিঃশব্দে মাথা নীচু করে গাড়ী থেকে নামলাম। সোজা একটা ফটকের মধ্যে দিয়ে ভিতরে ঢুকে গিয়ে একটা আঙিনায় পৌঁছুলাম। আঙিনা পাড় হয়ে সামনেই একটা ছোট্ট পথ-প্রকোষ্ঠ, তাতে ছুটো জানালা আছে। এককোণে ছুটো বাক্স, একটার উপর আর একটা সাজান, আর এক পাশে দেয়াল-ঘেষে একখানা খাটের উপর কম্বল বিছানো। ডানদিকে আর একটি ঘরে লোকজনের কথাবার্ত্তার ও একটি ছেলের কান্নার শব্দ শুনতে পেলাম এবং দোতলায় ঠিক আমার মাথার উপরে লোহার পাত পিটানোর শব্দ কানে এল। ওখানে ঢুকেই এ সব লক্ষ্য করলাম।

ঘরের মধ্যে গিয়ে অলসমন্থর গতিতে, পালাবার উদ্দেশ্য বিনাই অপর দিককার দরজা খুলে ফেললাম, দেখি আর একটা রাস্তায় এসে পড়েছি। যে বাড়ীটার মধ্যে দিয়ে চলে এলাম, একবার পিছন ফিরে সে বাড়ীর দিকে তাকালাম—লেখা আছে, 'পথিক-জনের থাকা ও খাওয়ার স্থান'।

কোচোয়ানটা তখনো আমার প্রতীক্ষা করছিল জানি কিন্তু তাকে কোনরকম ঠকাবার বা পালাবার মতলব আমার মোটেই ছিল না।

স্থিরভাবে রাস্তা বেয়ে চললাম, মনে কোন আশঙ্কা নেই, কোন রকম অন্যায় করচি তাও আমার মনে হল না। যে পশম-ওয়ালার নাম এতক্ষণ আমার মস্তিষ্কে বাসা বেঁধে ছিল—এই ব্যক্তি, যার অস্তিত্বে আমি বিশ্বাস করেছিলাম এবং যার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়াটা আমার একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করেচি—তার কথা সহসা আমার স্মৃতি থেকে আপনা থেকেই অন্তর্ধান করল। যেমন আরো কত উন্মাদ খেয়াল এসেচে, আবার চলে গিয়েচে ঠিক তেমনি। এ ঘটনা একটা দুঃস্বপ্নের স্মৃতির মতই আমার মনের মধ্যে রয়ে গেল, তার কথা আর মনেও করলাম না।

সামনের দিকে এগিয়ে চললাম। হাঁটতে হাঁটতে ক্রমে আমার মধ্যে একটা স্থিরতা এসে গেল। দারুণ অবসাদে ক্লান্তিতে পা দুটোকে যেন আর বয়ে নিতে পারছিলাম না। তখনো চারদিক কুয়াশায় ঢাকা—বরফ ঝরচে। এমনি করে গ্রোনল্যাণ্ড-এ এসে পৌঁছুলাম, গীর্জ্জার অদূরে রাস্তার একপাশে এক বেঞ্চিতে হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়লাম। পথ-চলতি লোকেরা বিস্ময়ের সঙ্গে আমার দিকে তাকাচ্ছিল। আমি তখন গভীর চিন্তায় তলিয়ে গেছি।

ভগবান, আর কত দুঃখ দিবে? কি নির্ম্মম ভাবেই না আমি

ক্লান্ত হয়ে পড়েচি। এ দুঃখ কষ্টের বোঝা যে আর সইতে পারচি নে দয়াময়! চরম শোচনীয় অবস্থায় এসে পৌঁছেচি—আর যে সইতে পারি নে ঠাকুর! অনাহারে অনিদ্রায় অত্যধিক মানসিক দুশ্চিন্তায় শরীর-মন একেবারে ভেঙে পড়েচে। কি ছিলাম, আর কি হয়েচি, এ যে কঙ্কালসার দেহ! চোখ কোটরে ঢুকেচে, গাল ভেঙেচে, বুকে লাগে এ জন্য খাড়া হয়ে হাঁটতে পারি নে। একদিন সাড়া দুপুর কুটুরীতে বসে সর্ব্বাঙ্গ পরীক্ষা করে কেবলি কেঁদেচি। কয় সপ্তাহ আগে যে এই শার্টটি পরেচি বলতে পারি নে। ঘামে ধূলায় কি বিশ্রীই না হয়েচে। আহত স্থানটা থেকে সামান্য একটু রক্ত জলের সঙ্গে মিশে বার হয়ে এসেচে। ঘা খুব বেশী নয় কিন্তু পেটের মত দেহের কোমল অংশে সামান্য ঘা থাকলেও ভারী যন্ত্রণা দেয়। ওষুধ-পত্রের ব্যবস্থা করতে পারি নি, আপনা থেকেই যে এটা সেরে যাবে তারও কোন লক্ষণ দেখচি নে। একান্ত সাবধানতার সঙ্গে আহত জায়গাটা ধুয়ে মুছে শার্টটা আবার গায়ে দিলাম। এ ছাড়া আর যে কোন উপায়ই নেই, কেননা এটা ...

এই সব নানা বিষয়, আরো কত কি সব বসে বসে ভাবলাম। মনটা ভারী বিষণ্ণ। নিজের প্রতি একটা অশ্রদ্ধা এল। হাত দুটোও যে আমার কাছে ভারী ফাল্‌তু বলে মনে হচ্ছিল। কাঠির মত হাতের সরু সরু কদাকার আঙুলগুলি, হাতের শিরা ফুলে

যেন ঝুলে পড়েচে—দেখে দুঃখও হল, আবার বিতৃষ্ণায়ও মনটা ভরে উঠল। আমার সে দুর্ব্বল বিশীর্ণ কাহিল দেহটার প্রতি একটা বিজাতীয় ঘৃণা এসে আমায় আচ্ছন্ন করে দিল, এ দেহের ভার যেন আর বইতে পারছিলাম না। ভগবান, যদি এই মুহূর্ত্তেই এই দুঃখ কষ্টের অবসান হয়, তাহলে সানন্দে সাগ্রহে আমি মরতে পারি।

নিজের বিচারে নিজেকে একটা পরম অপদার্থ, হেয়, জীবন-সংগ্রামে পরাজিত বলে মনে হল এবং সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রচালিতের মত উঠে বাড়ীমুখো হাঁটতে শুরু করে দিলাম। পথ চলতে চলতে একটা দরজার গায়ে পাথরে লেখা আছে দেখতে পেলাম, —'ডান দিকে মিস্ য়্যাণ্ডার্‌শনের কাছে জামাকাপড় তৈরী হয়।'

হ্যামার্‌স্‌বর্গ-এর আমার সেই পুরানো ঘরখানার কথা মনে হল, মনে হতেই আপনার মনে বিড়্ বিড়্ করে বলে উঠলাম, 'পুরোনো স্মৃতি!' আমার সেই চিলছাদের সেই কুঠুরী, সেই দোলা চ্যায়ারখানা, সেই পুরোনো খবরের কাগজে মোড়া দেয়াল —যাতে বাতিঘরের ও রুটিওয়ালার বিজ্ঞাপন শুয়ে শুয়েও পড়তে পেয়েচি—সব একে একে মনে পড়ল। সত্যি বলচি, আমার তখনকার অবস্থা এখনকার চাইতে ঢের ভাল ছিল। তখন এক রাত্রিরে একটা গল্প শেষ করে দশটা টাকা পেয়ে-

ছিলাম, আর আজ কিছুই লিখতে পারি নে। লিখতে গেলেই মাথা যেন একেবারে ফাঁকা বলে মনে হয়। এ আর সইতে পারচি নে, এখনই এর শেষ করে ফেলব। বলতে বলতে আপনার মনে হেঁটে চললাম।

খাবারের দোকানের যতই কাছাকাছি হলাম, ততই একটা ভাবী বিপদের আশঙ্কায় বুক্ দুরুদুরু করতে লাগল, কিন্তু তা সত্বেও আমার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অটল রইলাম। একেবারে খোলসা হতে চাই। ত্বরিতপদে সিঁড়ি বেয়ে উপরে গেলাম। এক বালিকা চায়ের বাটী নিয়ে যাচ্ছিল, দরজার সামনে তার সঙ্গে দেখা হল। তাকে ধাক্কা মেরে দরজা খুলে ভিতরে গিয়ে ঢুকলাম। দোকানী-ছেলেটা আর আমি আর-একবার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালাম।

ছেলেটা বলে উঠল, 'নমস্কার! ভাল ত! দিনটা কি বিশ্রী হয়েচে, তাই না?'

ওর এ কথার অর্থ কি? ও কেন দেখতে পেয়েই আমায় পাকড়ালে না? ভারী রাগ হল, চীৎকার করে বলে উঠলাম, 'আমি তোমার সঙ্গে আবহাওয়া নিয়ে আলোচনা করতে আসি নি, বুঝলে!'

শুরুতেই ও কেমন একটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। আমার এ রকম মেজাজ, দেখাবার কি কারণ ও তা বুঝ্‌তে পারলে

না। আমি যে ওকে পাঁচ শিলিং ঠকিয়েছি এটা ওর মনে কিছুতেই এল না।

অধীরভাবে হাঁপাতে হাঁপাতে ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি কি তবে জান না যে, আমি তোমায় ঠকিয়ে টাকা পাপ্ করেছি?' উত্তেজনায় রাগে আমি থর্থর্ করে কাঁপছিলাম। ও যদি না বুঝতে চায় ত গায়ের জোরে ওঁকে তা মানাতে প্রস্তুত হলাম।

কিন্তু ছোক্‌রার ত্রুটি যে কোন্‌খানটায় তা সে ধরতেই পারলে না।

কী দুর্ভাগ্য! দুনিয়ায় থাকতে হলে মানুষকে কত রকমের নির্বোধের সঙ্গেই না চলতে হয়! ছেলেটাকে গালাগালি দিলাম, কেমন করে ব্যাপারটা ঘটেছিল ওকে সব খুলে বললাম, কেমন করে কোথায় কখন নোট দেওয়া হয়, আমি কেমন ক'রে মাঝখান্ থেকে টাকাটা পেয়েছিলাম—সব। ছেলেটা নীরবে সব কথা শুনে গেল। তার মনে ভারী অস্বস্তি এল, পাশের ঘরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। আমায় চুপ করবার জন্যে ইঙ্গিত করল, বলল, 'একটু আস্তে আস্তে কথা বলুন।' তারপর বলল, 'এমনি করে টাকাটা নেওয়া কি আপনার সঙ্গত হয়েছে?—এ যে দস্তুর মত ঠকানো!'

তাকে বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, 'না, শোন বলচি। আমায়

যতটা নীচ মনে করচ, আসলে আমি ততটা নীচ নই, বুঝলে মুখ্যু কোথাকার! আমি ত আর সে টাকাটা নিজের জন্যে রাখি নি; অন্যের টাকা গাপ্ করার মতলব আমার কখনো আসতেই পারে না। এমনি করে টাকা জোগাড় করতে আমি অত্যন্ত ঘৃণা বোধ করি, কেননা তা আমার স্বাভাবিক সাধু চরিত্রের বিরোধী।

'তাহলে সে টাকা কি হল?'

'এক বুড়ী ভিখিরীকে দিয়েচি—সবটা।' ও বুঝুক, আমি ওই রকমেরই লোক; গরীবকে কখনো ভুলে যাই নে।...

ছেলেটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ ভাবল যে, আমি সত্যি সাউকার কিনা। তারপর ও বলল, 'টাকাটা কি ফেরত দেওয়া আপনার উচিত ছিল না?'

বললাম, 'শোন কথা। তোমায় কোন রকমে বিপদে ফেলার ইচ্ছা আমার নেই কিনা, তাই দেখচি মানুষের ভাল করতে গেলে এ রকম ধন্যবাদই মিলে! নিজে এসে সব ব্যাপার তোমায় খুলে বললাম, কোথায় তুমি নিজের কাজের জন্যে লজ্জিত হবে, তা নয়, উল্টো আবার আমায় অভিযোগ করচ! তা যাক, আমি ত বলে খালাস, তারপর তুমি গোল্লায় যাও, বা যেখানে খুশী যাও, তা দেখবার আমার দরকার নেই। চললাম আমি।'

ঘরের বার হয়ে দরজা টেনে দিলাম। কিন্তু যখন আমার সে আনন্দহীন কুঠুরীতে ঢুকলাম—তখন অল্প অল্প বরফ পড়ে সর্ব্বাঙ্গ আমার ভিজে গিয়েচে, সারাদিনের হাঁটা-হাঁটিতে হাঁটু দুটো দস্তুর মত কাঁপচে। সোয়ার থেকে নেমে একদম বিছানায় নেতিয়ে পড়লাম।

বেচারা ছেলেটার উপর যে অনর্থক চড়াও হয়েছিলাম তার জন্যে ভারী অনুতাপ হল, একেবারে কেঁদে ফেললাম। তাতেও কিন্তু মন শান্ত হল না। ছেলেটার প্রতি ও রকম দুর্ব্যবহার করায় নিজেকে শাস্তি দিবার জন্যে নিজের গলা টিপে ধরলাম। আমি যেন তখন একেবারে বদ্ধ পাগল। বেচারা ভয়ে কিছু বলতেও পারলে না, পাছে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে তার চাকরটি যায়! এতগুলি টাকা যে ক্ষতি হল তা নিয়েও ভয়ে কোন রকম গোলমাল করতে সাহস পেলে না। আর তাই ওর সেই ভয়ের সুযোগ নিয়ে দুর্ব্যবহারের চূড়ান্ত করে ছাড়লাম। দারুণ উত্তেজিত হয়ে যে কথাগুলি চেঁচিয়ে ওকে বলেচি তা সুতীক্ষ্ণ ছুরিকার মত ওর মর্ম্ম বিদ্ধ করেচে। সম্ভবত তখন দোকানী ভিতরে তার ঘরে উপস্থিত ছিল। আর একটু হলেই হয় ত সে বাইরে বেরিয়ে এসে গোলমালের কারণ জিজ্ঞাসা করত। না, এমন করে ত আর চলচে না, এতটা অধঃপতন আমার হয়েচে যে, যে-কোন নীচ কাজ করতে এখন আর আমার এতটুকু বাধে না!

আচ্ছা, আমায় উন্মাদ বলে শিকল দিয়ে বাঁধে না কেন? তা হলে ত সকল অশান্তির সমাপ্তি ঘটে। বন্ধনের জন্যে হাত বাড়িয়েও ত প্রায় দিয়েছিলাম। তখন বাঁধলে ত এতটুকু বাধাও আমি দিতাম না; বরং তাদের সাহায্যই করতাম। ভগবান, জীবনে আর একদিন আর একবার একটি শুভমুহূর্ত আমায় দাও! এই শেষ প্রার্থনা আমার পূরণ কর দয়াময়! ...

গায়ের জামা-কাপড় সবই ভিজা আর সেই অবস্থাতেই বিছানার উপর পড়ে রইলাম। মনের মধ্যে একটা অনিশ্চিত ধারণা এসে গেল যে, রাত্তিরেই হয় ত আমার এ ব্যর্থ জীবনের শেষ হয়ে যাবে। তাই বিছানাটা ঝেড়ে ঝুড়ে নেবার জন্যে একবার চেষ্টা করলাম। সকাল বেলা যেন লোকেরা সব কিছুতে একটা শৃঙ্খলা দেখতে পায়। হাত মুঠো করে অবস্থাটা বুঝে নিতে চেষ্টা পেলাম।

সঙ্গে সঙ্গেই ল্যাজালির কথা মনে পড়ে গেল। গোটা সন্ধ্যাটা ত তার কথা ভুলে যেতেও পারতাম! সঙ্গে সঙ্গেই মনের কোণে ক্ষীণ আলো যেন দেখা গেল—সামান্য একটু সূর্য্যালোক যেন আমার ধন্য করল; একটা সূক্ষ্ম স্নিগ্ধ আলোক-রেখা আমায় একান্ত প্রীতির সঙ্গে আদর করে আমার মনের সকল ব্যথা বেদনা দূর করে দিল। ক্রমে সূর্য্যালোক তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হল, কপাল যেন পুড়ে যাচ্চে, দুর্ব্বল মগজ যেন সেই উগ্রতার তাপে সিদ্ধ হচ্ছিল।

আর শেষটায় একটা পাগল-করা আলোক-শিখা লেলিহান হয়ে আমার চোখের সামনে জলে উঠল। স্বর্গে-মর্ত্ত্যে এক সঙ্গে যেন দাউ দাউ করে আগুন জলে উঠল, নর-নারী, পশু-পাখী, পাহাড়-পর্ব্বত, দৈত্য-দানব—সব যেন এক বিরাট অগ্নি, চারদিকে অসীম অনন্ত অগ্নিশিখা, সর্ব্বত্র এক প্রচণ্ড আগুনের ঝড় বয়ে যাচ্ছে, বিশ্ব যেন পুড়ে ছাই হল—চারিদিক ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন—বিশ্বের যেন আজই শেষ হয়ে যাবে!

তারপর আর কিছুই জানি নে।...

* * *

পরদিন ঘুম থেকে যখন জেগে উঠলাম, দেখি ঘামে একেবারে ভিজে গেছি, চারদিক স্যাঁৎসেতে, যেন এই মাত্র স্নান করে উঠেচি। ভীষণ জ্বর হয়েছিল। প্রথমটায় আমার যে কি হয়েছিল কিছুই পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম না। বিস্ময়ে অবাক হয়ে নিজের দিকে তাকালাম, মনে হল, আমি যেন একদম বদলে গেছি, নিজেকে আর কিছুতেই চিনে উঠতে পারছিলাম না। তবে হাত-পা'র অস্তিত্ব অনুভব করছিলাম বটে। সব চাইতে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, জানালাটা যেখানটায় ছিল ঠিক সেখানটাতেই রয়েচে, জায়গা বদল হয় নি; আর নীচে আস্তাবলে

ঘোড়ার খুড়ের শব্দও কানে আসছিল, প্রথমটা মনে হচ্ছিল যেন শব্দটা দূর থেকে আসচে। নিজেকে ভারী পীড়িত মনে হচ্চে—গা বমি বমি করচে। মাথার চুল ভিজে গেছে, সেই ভিজে চুল কপাল অবধি এসে পড়েছিল, তাতে কপালে ভারী ঠাণ্ডা লাগচে। কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে বালিসের দিকে তাকালাম, মাথার চুল এখানে সেখানে ছড়িয়ে রয়েচে। জুতো পরেই শুয়েছিলাম, পা ফুলে গেছে কিন্তু তার জন্য ব্যথা বেদনা অবশ্য কিছুই নেই, তবে পায়ের গোড়ালি দুটো আড়ষ্ট হয়ে গেছে, নাড়া চাড়া করতে পারছি নে।

বিকেল হয়ে আসবার, সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে আঁধার হয়ে আসছিল। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম এবং ঘরের মধ্যেই একটু পাইচারী আরম্ভ করে দিলাম। পাইচারী করবার পক্ষে ঘরের মেজেটা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, কাজেই খুব সাবধান হয়েই পা চালাতে হচ্ছিল, কেননা নইলে দেয়ালে হোচট্ লাগার সম্ভাবনা ছিল পদে পদে। ব্যথা বেদনা তখন তেমন একটা ছিল না, সুতরাং কান্নাকাটি করবারও দরকার হয় নি। সমস্ত অবস্থাটা মিলিয়ে দেখ্‌তে গেলে বিষণ্ণ হবার মত কোন হেতুই ছিল না। বরং একটা পরম তৃপ্তিই পাচ্ছিলাম। খুশী না থাকা ছাড়া যে আর কিছু হতে পারা যায় এটা ঠিক তখন আমার মনে হয় নি।

তারপর বাইরে বেরিয়ে পড়লাম।

তবে একটা জিনিষ আমার মনে একটু অস্বস্তি এনে ছিল, সে হচ্ছে ক্ষুধা। যদিচ খাবারের কথা ভাবতেই গা বমি বমি করছিল। আবার সেই নির্লজ্জ ক্ষুধার জ্বালা সম্বন্ধে তীব্র ভাবেই সচেতন হতে লাগলাম। জ্বালা ক্রমেই তীব্র থেকে তীব্রতর হতে লাগল ; তার সে নিষ্ঠুরতা আমায় একেবারে যেন শেষ করে দিচ্ছিল, আমার বাইরেটা দেখে কিছুই জানবার বা বুঝবার জো ছিল না, ভিতরে ভিতরে আমায় নিকাশ করে ফেলছিল। মনে হল যেন কতকগুলি অতি ক্ষুদ্র পোকা দৈত্যের মত আমার দেহে প্রবেশ করে দেহটা খুঁড়তে লেগে গেছে, তাদের সে অবিরাম দংশনে ক্ষ্যান্ত দিয়ে আবার তারা খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিল এবং তারপর আবার নতুন উদ্যমে খোঁড়ার কাজ শুরু করে দিল— নীরবে, যেন কোন তাড়াহুড়ো নেই, যেন পথ চলতে চলতে তারা জিরিয়ে নিচ্ছে। ...

অসুস্থ নই বটে কিন্তু নিস্তেজ হয়ে পড়েছি। ঘাম হচ্ছিল। খানিকটা জিরিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে বাজারের দিকে যাব ঠিক করলাম। কিন্তু সে যে অনেকটা পথ আর অতটা পথ চলবার মত উৎসাহও তখন আমার ছিল না, তাই অনেক কষ্টে শেষটায় গিয়ে প্রায় সেখানে পৌছুলাম। বাজারের যে কোণটা মার্কেট ষ্ট্রীটের দিকে সেখানটায় গিয়ে দাঁড়ালাম। কপালের ঘাম ঝর্ ঝর্ করে ঝরে মুখ বেয়ে ছড়িয়ে দৃষ্টি ঝাপসা করে দিলে। ঘাম মুছে

ফেলবার জন্যে একটু দাঁড়ালাম। আগে লক্ষ্য করি নি; সত্যি বলতে কি, লক্ষ্য করবার কথা একবার মনেও হয় নি; আমার চারপাশেই দেখি ভীষণ এক হট্টগোল চলেচে।

সহসা একটা ঘণ্টা বেজে উঠল—নীরস খন্‌খনে, যেন সাবধান করে দিল। ঘণ্টার শব্দ বেশ স্পষ্ট করেই শুনতে পেলাম, প্রথমটা হকৃচকিয়ে গেলাম, তারপর আমার শ্রান্ত পা দুখানি যত তাড়াতাড়ি পারল, একপাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। একটা রুটি-বয়ে-নেওয়া গাড়ী আমায় জবর এক ধাক্কা দিল, আর একটু তাড়াতাড়ি যদি সরবার চেষ্টা করতাম তাহলে আর কোন গোলমালই হত না। যাক, কি করব, উপায় নেই ত কিছু। একটা পায়ে ভারী ব্যথা হল—মনে হল পা-টা যেন মড়মড় করে ভেঙে গেল।

কোচোয়ান প্রাণপণে ঘোড়ার বল্‌গা টেনে ধরল। এবং আমার দিকে চেয়ে শুধোল, 'তেমন লাগে নিত?' আর একটু হলেই যে কি সর্ব্বনাশই না আমার হত! ... যাক তেমন কিছু হয় নি হয় ত। ... হাড় ভেঙেচে বলে মনে হল না।

যতটা পারলাম ছুটে গিয়ে একটা আসনে বসে পড়লাম; পথ-চলতি লোকগুলা চলতে চলতে কৌতূহলী হয়ে থেমে গেল, তাদের সে দৃষ্টি আমায় লজ্জায় অভিভূত করে ফেলল। পরম ভাগ্য যে, আঘাত তেমন গুরুতর হয় নি; বলতে গেলে বিপদটা

যেমন তেড়ে এসেছিল, নেহাৎ ভাগ্যের জোর বলেই তেমন কিছু হয় নি। দুঃখের বিষয়, জুতোটা একদম ছিঁড়ে গেছ, গোড়ালি কোথায় গেছে তার সন্ধান পেলাম না। তলিটা লড়বড় করচে। পা-টা তুলে ধরে দেখলাম, আঘাতটা থেকে তখনো রক্ত বেয়ে পড়চে। যাই হোক, এ দুর্ঘটনার জন্যে কাউকেই দোষ দেওয়া যায় না। লোকটা যে ইচ্ছে করেই গাড়ীশুদ্ধ ঘোড়টা এনে হুড়মুড় করে আমার উপর ফেলেচে এ কেউ বলবে না, অবশ্য তাকে কিন্তু ভারী উৎকণ্ঠিতই দেখা গেল। আমি যদি তখন তার কাছে একখানা রুটি চাইতাম তাহলে সে যে গাড়ী থেকে একখানা রুটি নিয়ে আমায় নিশ্চয়ই দিত সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। আনন্দের সঙ্গেই সে দিত। ভগবান তাকে সকল আপদ বিপদ থেকে বাঁচিয়ে রাখুন। ...

আমি তখন সাংঘাতিক ক্ষুধার্ত্ত, এবং আপনাকে ও নির্লজ্জ ক্ষুধাকে নিয়ে যে কি করব ভেবে পাচ্ছিলাল না। বসে বসেই গা মোড়ামুড়ি দিলাম এবং হাঁটু পর্য্যন্ত বুকটা নামালাম। একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। অন্ধকার হতেই মন্থর গতিতে টাউন হলের দিকে এগিয়ে চললাম। ভগবান জানেন কেমন করে সেখানে গিয়ে পৌঁছুলাম। সিঁড়ির একপাশে গিয়ে বসে পড়লাম। কোটের একটা পকেট ছিঁড়ে ফেলে সেই ছিন্ন কাপড়ের

টুক্‌রাটাই আপনার মনে চিবোতে শুরু করে দিলাম। এবং তা যে কোন একটা স্পষ্ট উদ্দেশ্যে থেকেই করলাম তা অবশ্য বলা চলে না, এমনি—নিছক খাম্‌কা। তার পরই সামনেকার খালি জায়গার দিকে অর্থহীন অন্ধের দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। অদূরে একপাল ছেলেমেয়ে খেলা করছিল, পথ দিয়ে যে লোকজন যাওয়া-আসা করচে তাও বুঝতে পারছিলাম, কিন্তু কোন দিকেই আমার লক্ষ্য মাত্রও ছিল না।

হঠাৎ আমার খেয়াল গেল, বাজারের একধারে যে সারি সারি মাংসের দোকান রয়েচে তারই একটা দোকানে গিয়ে এক টুকরো কাঁচা মাংস চাইব। তৎক্ষণাৎ নীচে নেমে গিয়ে সামনে যে কশাইটা পড়ল তাকেই বলে বসলাম, 'ভাই, আমার কুকুরটার জন্যে একখানা পাঁঠার হাড় দিতে পার? সামান্য একখানা হাড় দিলেই হবে। মাংস না থাকলেও কিছু এসে যাবে না, কুকুরটাকে একটা কিছু চিবোতে দিতে চাই মাত্র।'

লোকটি তৎক্ষণাৎ এক টুক্‌রো হাড় দিল। তাতে একটু-আধটু মাংস তখনো ছিল। মূল্যবান বস্তুজ্ঞানে হাড়ের টুক্‌রোটা পরম যত্নে কোটের পকেটে রেখে দিলাম। এমন প্রাণখুলে লোকটাকে ধন্যবাদ জানালাম যে, সে বিস্ময়ে অবাক হয়ে আমার মুখের পানে তাকিয়ে রইল। তারপর বললে, 'না, না, এর জন্যে আর ধন্যবাদ জানাতে হবে না।'

অস্পষ্ট স্বরে জবাব দিলাম, 'নিশ্চয়ই জানাতে হবে। এ তোমার একান্ত অনুগ্রহ।' বলে চলে এলাম।

আমার হৃৎপিণ্ডটা প্রচণ্ডভাবে স্পন্দিত হতে লাগল। গুড়ি মেরে এক সরু গলি-পথে ঢুকে পড়লাম। সামনে একখানা জীর্ণ শীর্ণ ঘর—বেজায় অন্ধকার। সেই খানটায় দাঁড়িয়ে হাড়ের টুক্‌রোখানা চিবোতে শুরু করে দিলাম।

হাড়ে কোন রকম স্বাদ নেই বরং একটা উৎকট গুমসা গন্ধ। ফলে তৎক্ষণাৎ বমি হয়ে গেল। আর একবারও চেষ্টা করলাম। যদি কোন রকমে একবার খানিকটাও পেটে ধরে রাখতে পারতাম তাহলে তাতেই খানিকটা ফল হত। এ একরকম জোর করে পেটে ধরে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র; কিন্তু আবারও বমি হয়ে গেল। একদম ক্ষেপে গেলাম এবং রেগে হাড়ের টুক্‌রোটাকে দ্বিগুণ জোরে কামড়াতে শুরু করে দিলাম এবং নিছক ইচ্ছাশক্তির জোরে সেটাকে ভেঙে ফেললাম, কিন্তু তবু কোন কাজে এল না। হাড় থেকে যে সামান্য মাংস পেটে পড়েছিল তা গরম হতে না হতেই আবার হড়্‌ হড়্‌ করে বেরিয়ে এল। কি করব, দুর্ভাগ্য! পাগলের মত হাত দুটো মুঠো করে কেঁদে ফেললাম, যেন আমায় ভূতে পেয়েচে। চোখের জলে হাড়ের টুক্‌রোটা ভিজে একটু লবণাক্ত হবে এ ধারণা আমার ছিল। আবারও বমি হল। নিজের অদৃষ্টকে অভিশাপ দিলাম

এবং রাগে গজ্‌ গজ্‌ করতে লাগলাম। কাঁদতে কাঁদতে আর একবার বমি করলাম।

চারদিক নীরব নিস্তব্ধ—কেউ কোথাও নেই, আলো নেই, গোলমাল নেই। তখন আমি সাংঘাতিক ভাবে উত্তেজিত। শ্বাস-প্রশ্বাস খুব কমই পড়ছিল, যা-ও পড়ছিল তা-ও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল। দাঁতে দাঁত চেপে কেঁদে উঠলাম। উপকার হবে মনে করে হাড় থেকে যে মাংস খুঁটে খেয়েছিলাম, তা কয়বারে বমি হতেই বেরিয়ে এল। অনেক চেষ্টা করেও যখন দেখলাম যে, মাংস কিছুতেই উদরে থাকচে না তখন নিরুপায় হয়ে হাড়খানা ছুঁড়ে দরজার সামনে ফেলে দিলাম। দুর্ব্বলের সম্বল ঘৃণা এসে আমায় অধিকার করে বসল। হাত মুঠো করে ক্রোধভরে আকাশের দিকে তাকিয়ে ভগবানকে গালাগালি দিয়ে উঠলাম।

'ঈশ্বর, তুমি নেই, তোমার অস্তিত্ব নেই। যদি থাকত তাহলে এমন অভিশাপ দিতাম যে, নরকের অগ্নিশিখা তোমায় পুড়িয়ে ছাই করে দিত। তোমার সেবা করতে চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি—তুমিই তা হতে দিলে না। তাই আজ পিছু ফিরেচি—আর তোমার দিকে ফিরব না কোন দিন। তুমি যখন আমায় নিলে না, তখন আমিই বা তোমায় নিই কেন! আজ মরতে বসেচি, তবু তোমায় ব্যঙ্গ করচি! মরণ-দেবতা আমার দিকে সাগ্রহ-দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে—তাই তোমায় জানিয়ে দিচ্ছি যে, আমি

নরকের দাসত্ব করতেও রাজী, তবু তোমার রাজ্যের স্বাধীনতা আমার কাম্য নয়। তোমার এ স্বর্গীয় নীচতার প্রতি আমার চিত্তে একটা দারুণ বিতৃষ্ণা। তাই নরকই আজ আমার একান্ত কাম্য। কেননা আর যাই হোক, সেখানে ভণ্ডামি নেই!

'মর্ত্ত্যের যত নির্ব্বোধের দল, তারাই তোমার রাজ্যের বাসিন্দা —যারা পৌরুষের দিক দিয়ে একেবারে নিঃস্ব রিক্ত ফতুর, যারা মৃত্যুকালে একবার তোমায় ডেকেচে তারা—সেই নির্ব্বোধেরাই তোমার রাজ্যে আশ্রয় পায়। আমার বিরুদ্ধে তুমি দাঁড়িয়েচ, তোমায় আমি জানি নে চিনি নে। তুমি সর্ব্বজ্ঞ বটে কিন্তু তোমার কোন সত্তাই নেই। তাই তোমার বিরুদ্ধাচরণের কাছে কোন দিনই আমি মাথা নত করি নি। হে স্বর্গের অধিরাজ, তাই আমার দেহের প্রতি রক্তবিন্দুতে, আত্মার সকল শক্তিতে তোমায় ব্যঙ্গ করবার তীব্র অভিলাষ পোষণ করচি। যদি আমার ক্ষমতা থাকত ত আমার এ মনোভাব আমি বিশ্বের সকল নর-নারী, প্রতিটি ফুল, প্রতিটি পাতা, প্রত্যেকটি শিশির-কণায় চারিয়ে দিতাম। মহাবিচারের দিন তোমায় উপহাস করতাম, তোমার অসীম করুণার জন্যে তোমায় প্রাণপণে অভিশাপ দিতাম। আজ থেকে সকল রকমে তোমায় অস্বীকার করতে চললাম। যদি কখনো ভুল করে চিত্ত তোমার দিকে ঝুঁকে পড়ে তা হলে তাকে চরম অভিশাপ দিব এবং যদি কখনো জিহ্বা

তোমার নাম উচ্চারণ করে ত তাকে টেনে ছিঁড়ে ফেলব। তোমায় বলচি, সত্যিই যদি তুমি থেকে থাক, তাহলে এই আমার শেষ কথা—তোমায় সর্ব্বান্তঃকরণে আমার নমস্কার জ্ঞাপন করে বিদায় নিচ্চি। আর কখনো তোমার দিকে ফিরেও তাকাব না ... ।'

চুপ করে গেলাম।

দারুণ উত্তেজনা ও ক্লান্তিতে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছিল, এক জায়গাতেই ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠোঁট নেড়ে নেড়ে অভিশাপ আউড়ে যাচ্ছিলাম। এবং তৎক্ষণাৎ আবার স্বকৃত অন্যায় আচরণের জন্যে নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করতে লাগলাম। অদূরে দুজন লোক কি কথা কইতে কইতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছিল। তৎক্ষণাৎ পাশ কেটে এসে আলোকিত রাস্তায় পৌঁছুলাম। এগিয়ে যেতে যেতে কত উদ্ভট কল্পনাই না এল। বাজারের যে অংশে নানা রকমের পুরানো জিনিষ ছড়িয়ে রাখা হয়েছিল সেখানটার কথা মনে হতেই মনটা বিষিয়ে উঠল। ও গুলো যেন বাজারের সকল শ্রী সকল সৌন্দর্য্য ঢেকে রেখেচে। এ যেন শহরটার একটা দারুণ কলঙ্ক! এ বিশ্রী রাবিসগুলো কেউ সরিয়ে দেয় না! তৎক্ষণাৎ আবার মনে হল, এই যে প্রকাণ্ড বাড়ীটা যেখানে ভৌগলিক জরিপের অফিস—এটা এখান থেকে সরাতে কত খরচ পড়ে! যতবার এখান দিয়ে গিয়েচি ততবারই এর গঠন-পারিপাট্যে চমৎকৃত

হয়েচি। তিন চার হাজার টাকায় সম্ভবত সরানো চলবে না। তিন চার হাজার টাকা,—সে ত কম নয়! তা, মন্দ কি, তিন চার হাজার টাকা দিয়েই কাজটা শুরু করে দেওয়া যেতে পারে ত। তখনই আবার মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম। হাত খরচার টাকা থেকেই এটা হতে পারে। তখনো সর্বাঙ্গ কাঁপছিল, কান্নার পর থেকে কাশিও মাঝে মাঝে আমাকে বিব্রত করে তুলছিল। মনে হচ্ছিল, জীবনীশক্তি যেন আর বেশী নেই—তাই পথে শেষ প্রার্থনাটি আবৃত্তি করলাম। মরতে বসেচি তার জন্যে কিছুমাত্র উৎকণ্ঠা বা দুঃখ আমার ছিল না। বরং শহর ছাড়িয়ে রেল ষ্টেশনের দিকে চললাম—আমার সে ঘর থেকে দূরে—বহু দূরে। রাস্তায় পড়ে মরি তাও তখন আমার কাছে কাম্য, তবু আর সে ঘরে নয়। দুঃখ-লাঞ্ছনা আমায় একান্তভাবে নির্ব্বিকার নির্দ্দয় করে তুলেচে। পায়ের টনটনানি ক্রমেই বেড়ে উঠেচে; পায়ের ব্যথাটা, মনে হচ্ছিল, যেন তিড় তিড়্ করে সারা পা-টা বেয়ে উঠচে। কিন্তু তাতেও যে তেমন অস্বস্তি বোধ করচি তাও নয়; কেননা এর চাইতেও ত ঢের বেশী বিশ্রী জ্বালা আমি ভোগ করিচি।

কোন রকমে রেল ষ্টেশনে গিয়ে পৌঁছুলাম অদূরে জাহাজ ঘাট। কাজ কর্ম্ম—তখন সব বন্ধ, লোকজন বড় একটা নেই—কেবল এখানে-সেখানে দু একজন কুলী বা খালাসী পাইচারী করচে।

হঠাৎ দেখি সামনে একটা খোঁড়া লোক। তৎক্ষণাৎ তাকে থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম যে, 'নান' নামক জাহাজখানা ছেড়েচে কিনা। এই জাহাজখানার কথা আমার মনের মধ্যে যে বাসা বেঁধেছিল এটা আমারও স্পষ্ট জানা ছিল না।

হাঁ, ছেড়েচে।

কোন্ দেশে গেল ও বলতে পারল না।

লোকটা এক-পা ঝুলিয়ে আর একপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবল। তারপর জবাব দিল, 'না। এখান থেকে কি মাল নিয়ে গেল?'

জবাব দিলাম, 'জানি নে।'

ইতিমধ্যে 'নান' জাহাজ সম্বন্ধে আমার ঐকান্তিক কৌতূহল একেবারে উপে গেল। তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, হোম্‌স্‌ট্র্যাণ্ড কয় মাইল দূর?

'হোম্‌স্‌ট্র্যাণ্ড? মনে হয়...'

'হাঁ, হোম্‌স্‌ট্র্যাণ্ড, নয় ত কি হনুলুলু?'

'কোন্ জায়গার কথা বলব?—হোম্‌স্‌ট্র্যাণ্ডের কথা, না হনুলুলুর কথা?'

'তোমায় ত হোম্‌স্‌ট্র্যাণ্ডের কথাই শুধোচ্চি।'

আবার পরক্ষণেই বললাম, 'ওহে আমায় একটু তামাক দিতে পার? আছে?'

লোকটা তৎক্ষণাৎ খানিকটা তামাক দিল। প্রাণ খুলে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে এগিয়ে চললাম। তামাকটা আমার কোন কাজেই এল না, পকেটে রেখে দিলাম মাত্র। লোকটা আমার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল, হয় ত কোন কারণে আমার প্রতি ওর সন্দেহ জেগেচে। দাঁড়িয়েই থাকি, কি চলতেই থাকি, আমার যেন মনে হতে লাগল যে, লোকটার সন্দিগ্ধ দৃষ্টি আমার অনুসরণ করচে। এ লোকটা যে আমায় এমনি ভাবে তাড়না করবে এটা আমার বাঞ্ছনীয় মনে হল না। তাই তাড়াতাড়ি তাকে পিছনে ফেলে হন্‌হন্‌ করে এগিয়ে গেলাম। যাবার মুখে কেবলমাত্র 'মুচি'—এই একটি মাত্র শব্দ ওড়ালাম। শব্দটা উচ্চারণ করতে গিয়ে দৃষ্টিনিবদ্ধ করে ওর দিকে তাকালাম, যেন শুধু দুটো চোখ দিয়েই তাকাই নি, যেন সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে ওর দিকে তাকিয়েছিলাম। আর একবার শব্দটা উচ্চারণ করেই পিছন ফিরে রেলওয়ে স্কোয়ারের দিকে এগিয়ে গেলাম। লোকটা কিন্তু একটা কথাও বললে না, কেবল চোখ দুটো পাকিয়ে আমার দিকে চেয়ে রইল।

'মুচি'!' আবার থম্‌কে দাঁড়ালাম। হাঁ, সত্যিই ত। ওর সঙ্গে দেখা হবার মুহূর্ত্তে এই শব্দটার কথাই ত আমার মনের মধ্যে ছিল; ওর সঙ্গে যেন পূর্ব্বে কোথায় সাক্ষাৎ হয়েছিল বলে মনে হল! যেদিন আমার ওয়েস্‌ট্‌-কোটটা বাঁধা দিই,

সেদিন যেন ওর সঙ্গেই দেখা হয়েছিল। সে যেন অনন্তকাল আগের কথা।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যখন এই সব ভাবছিলাম তখন রেলওয়ে স্কোয়ার ও হারবার্ স্ট্রীটের মোড়ের একখানা বাড়ীর দেওয়াল ধরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। সহসা চমকে উঠেই তৎক্ষণাৎ এগিয়ে যেতে চেষ্টা পেলাম। কিন্তু পারলাম না। সামনেই দেখি সম্পাদক মশাই! আমার তখন বেপরোয়াভাব। তাঁর দৃষ্টিতে পড়বার উদ্দেশ্যেই চেষ্টা করে এক পা এগিয়ে যেতে চাইলাম। তার মানে এর দ্বারা তাঁর সহানুভূতি উদ্রেক করাই নয়, বরং নিজেকে যথেষ্ট শাস্তি দিতেই চেয়ে ছিলাম। রাস্তার উপর চিৎ হয়ে পড়ে আমার দেহের উপর দিয়ে তাঁকে চলে যেতে অনুরোধ করতাম। কিন্তু তাঁকে সম্ভাষণ করতে হাত দুটো পর্য্যন্ত তুললাম না।

তিনি হয় ত অনুমান করলেন যে, আমার কিছু একটা হয়েচে নিশ্চয়। তাই চলার গতি একটু কমালেন। আমিই বললাম, 'লেখা এখনও শেষ করতে পারি নি, শেষ হলেই গিয়ে দেখা করব।'

তিনি সপ্রশ্ন জবাব দিলেন, 'তাই কি? এখনো লেখাটা শেষ হয় নি তবে?'

'না, এখনো পেরে উঠি নি।'

তাঁর এ সহৃদয় ব্যবহারে দু'চোখ পুরে জল এল। নিজেকে

সামলে নেবার মতলবে জোরে জোরে কেশে উঠলাম। সম্পাদক মশাই নাক ঝেড়ে আমার দিকে চাইলেন।

তারপর শুধোলেন, 'টাকা পয়সা কিছু আছে ত ?'

জবাব দিলাম, 'না। এক পয়সাও নেই। আজ কিছুই খেতে পাই নি, তবে ... '

'তোমার ত না খেয়ে মরার কোনই অধিকার নেই বাপু ?' এই বলেই তিনি পকেটে হাত দিলেন।

একটা দারুণ লজ্জা এসে আমায় সজাগ করে দিল এবং দেয়ালের দিকে মুখ করে দেয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়ালাম। টের পেলাম ব্যাগ থেকে একখানা দশ টাকার নোট বার করে আমার দিকে ধরেছেন।

একটি কথাও বললেন না, কেবলমাত্র নোটখানা হাত বাড়িয়ে আমায় দিলেন—আমায় অনাহারে মরতে দিবেন না! প্রথমটা নোটখানা নিতে আপত্তি করলাম। ...

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তিনি বলে উঠলেন, 'নাও শীগগীর। ট্রেনের প্রতীক্ষায় আছি, ট্রেন এখনি এসে পড়বে, ঐ দেখা যাচ্ছে।'

নোটখানা হাত বাড়িয়ে নিলাম। আনন্দে আমার বাক্‌রোধ হয়ে গেল। একটা কথাও কইতে পারলাম না। এমন কি নমস্কারটা পর্য্যন্ত জানালাম না।

তখন অগত্যা সম্পাদক মশাই নীরবতা ভঙ্গ করে বললেন,

'এর জন্যে অতটা 'কিন্তু' করবার কিছুই নেই। বেশ জানি লেখা দিয়ে একদিন তুমি এটা শোধ দিতে পারবে।'

এই বলে তিনি চলে গেলেন।

তিনি তখন খানিকটা এগিয়ে গেছেন; আমার তখন মনে হল যে, তিনি যে উপকার করলেন তার জন্যে তাকে ত ধন্যবাদ জানান হয় নি, নমস্কারও করা হয় নি। ছুটে গিয়ে তাঁকে ধরতে চেষ্টা করলাম কিন্তু ধরতে পারলাম না। পা যেন কিছুতেই তত তাড়াতাড়ি এগুতে পারল না, বার বার হোচট্ খেলাম। ক্রমে তিনি অনেকটা দূরে চলে গেলেন। নিরাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিলাম। ভাবলাম, চীৎকার করে তাঁকে ডাকি। কিন্তু সাহস হল না। সে যাই হোক, অনেক করে সাহস এনে দু একবার তাঁকে ডাকলামও, কিন্তু তখন তিনি অনেক দূরে, আর আমার কণ্ঠস্বর ততটা দূর পৌঁছুবার পক্ষে নেহাতই দুর্ব্বল।

যেদিকপানে তিনি চলে গেলেন সেদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। নীরবে কাঁদলাম। আপনার মনে বললাম, 'এর মত ত আর কাউকেও দেখলাম না! দশটা টাকা দিলেন, না চাই-তেই! আবার বললেন, অনাহারে আমায় মরতে দিতে পারেন না!' পিছন ফিরে যেখানটায় তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর হাবভাব অনুকরণ করলাম। নোটখানা আমার সজল চোখের উপর ধরে এপিঠ-ওপিঠ দু'পিঠই ভাল করে পরীক্ষা

করে দেখলাম। তারপর উচ্চকণ্ঠেই শপথ করে বলে ওঠলাম যে, আমার হাতে যে নোটখানা রয়েচে তা দশ টাকারই নোট, এবং এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। এক ঘণ্টা পর, হতে পরে ঘণ্টাটা একটু অসাধারণ দীর্ঘ—কেননা চারদিক তখন নীরব নিস্তব্ধ হয়ে গেছে—চেয়ে দেখলাম আমি ১১ নং টম্‌টেগ্যাস-দেন-এর সামনে দাঁড়িয়ে আছি। খেয়াল হতেই নিজের অবস্থাটা এবার সম্‌ঝে নিতে চেষ্টা পেলাম। এবং এই ত সেই 'পথিক-জনের খাওয়া ও থাকার স্থান!' সুতরাং আর একবার সেই বাড়ীতে প্রবেশ করে থাকবার জায়গা চাইলাম। তৎক্ষণাৎ একখানা বিছানা পেলাম।

* * *

মঙ্গলবার।

সূর্য্য উঠেচে, চারদিক তখনো নিস্তব্ধ—এ রকম উজ্জ্বল দিন সচরাচর বড় একটা মিলে না। বরফ সব কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। চার দিকেই স্ফূর্ত্তি ও আনন্দ, সকলকার মুখে চোখেই তৃপ্তি, হাসি, সর্ব্বত্রই একটা সজীবতার আভাস দেখা যাচ্চে; ফোয়ারা থেকে জল ঝরে পড়চে, সূর্য্যকিরণে তা ঝিকমিক করচে।...

বুভুক্ষা

দুপুর পর্য্যন্ত টম্‌টেগ্যাদেন-এর সেই বাড়ীতেই ছিলাম, বেশ আরামে, তারপর সেখান থেকে শহরের উদ্দেশে রওনা হলাম। মেজাজটা ভারী খুশী। তাই সারাটা বিকেল চেনা রাস্তা দিয়ে লোকজনের দিকে চাইতে চাইতে মন্থর গতিতে হেঁটে চললাম। সাতটা বাজবার আগেই সন্ত ওলেভস্‌ প্লেশ-এ গিয়ে উপস্থিত হয়ে দু নম্বর ঘরের জানালার দিকে একবার চোরা-কটাক্ষ হানলাম। আর ঘণ্টা খানেক পরেই ত তার সঙ্গে দেখা হবে। এই একটা ঘণ্টা যে কি উৎকট আনন্দে ও শঙ্কায় আমার কেটে গেল তা বলতে পারি নে। আচ্ছা, কি হবে? সে নীচে নেমে এলে কি বলে তাকে সম্ভাষণ করব? নমস্কার?—না একটুখানি হাসি? শেষ পর্য্যন্ত স্থির করলাম, হাসি দিয়েই তাকে সম্ভাষণ করব। অবশ্য মাথাটা যতদূর সম্ভব নোয়াতে হবে।

আবার তখুনি চুপি চুপি চলে এলাম। কেননা এত আগে এসে পড়ায় মনে মনে ভারী লজ্জিত হলাম। কার্লজোহান ষ্ট্রীটে খানিকক্ষণ পাইচারী করলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে ইউনিভার্সিটি ষ্ট্রীটের দিকে নজর রাখলাম। গীর্জ্জার ঘড়িতে আটটা বাজতেই সন্ত ওলেভস্‌ প্লেশ-এর দিকে এগুলাম। যেতে যেতে মনে হল, হয় ত দু'চার মিনিট দেরী হয়ে গেছে। তাই যতটা তাড়াতাড়ি পারি পা চালিয়ে গেলাম। পা-টা টন্‌টন্‌ করছিল, তাছাড়া আর কোন কষ্টই ছিল না।

বুভুক্ষা

ঝরণাটার সামনে দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। দু'নম্বর ঘরের জানলার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম কিন্তু সে এল না। তা, একটু অপেক্ষা করি, নিশ্চয়ই সে আসবে। হয় ত কোন কারণে তার দেরী হচ্চে। শরীরটা তেমন ভাল ছিল না, সেদিন-কার ব্যাপারটা সম্বন্ধে তেমন করে ভাবতেও পারি নি। আচ্ছা, সেদিনকার সাক্ষাৎটা আমার কল্পনার বিষয় নয় ত? এ সম্বন্ধেই ভাবতে আরম্ভ করে দিলাম কিন্তু কোন স্থির সিদ্ধান্তেই পৌছুতে পারলাম না।

'এই যে!' পিছন থেকে শুনতে পেলাম। সঙ্গে সঙ্গেই মৃদু পদশব্দও কানে এল, কিন্তু পিছন ফিরে না তাকিয়ে সামনেকার সিঁড়ির দিকে হাঁ করে চেয়ে রইলাম।

'নমস্কার!' শুনতে পেলাম। হাসতে ভুলে গেলাম। প্রথমটা মাথা থেকে টুপিটা পর্য্যন্ত নামালাম না। ওকে ওদিক থেকে আসতে দেখে এতই থতমত খেয়ে গেছলাম।

ও শুধোল, 'কতক্ষণ অপেক্ষা করে আছ?' হেঁটে আসার জন্যে ও একটু হাঁপাচ্ছিল।

বললাম, 'না, এই এইমাত্র ত এসে দাঁড়িয়েচি। আর তাই যদি হত—যদি একটু বেশীক্ষণই অপেক্ষা করতাম, তাহলেই বা কি অন্যায় হত? আমার ধারণা ছিল, তুমি ওদিক থেকে না এসে এদিক থেকেই আসবে।'

'মাকে নিয়ে ও-পাড়ায় এক বাড়ী গেছলাম, তিনি সেখানেই এখন খানিকক্ষণ থাকবেন।'

'ও, তাই নাকি!'

আমরা আপনা থেকেই সামনের দিকে এগিয়ে চললাম। মোড়ে একটা পাহারাওয়ালা দাঁড়িয়েছিল, আমাদের দিকে চেয়ে রইল।

ও চলা থামিয়ে বললে, 'সে যাই হোক, এখন কোথায় চলেচি?'

'যেখানে তোমার খুশী।'

'তাই নাকি! বেশ! তবে একা একা ঠিক করতে কিন্তু ভারী বিশ্রী লাগে।'

নীরব।

তারপর আমি বললাম, কিছু একটা বলার খাতিরেই, 'তোমার ঘরও ত দেখি অন্ধকার।'

'হাঁ, অন্ধকার,' ও সানন্দে জবাব দিল; 'চাকরাণীটাকেও সন্ধ্যার মত ছুটী দিয়েচি, তাই আমি এখন বাড়ীতে একা।'

আমরা উভয়েই দু'নম্বর বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে জানলাগুলির দিকে তাকালাম, যেন এগুলিকে এর আগে আর আমরা কেউ কখনো দেখি নি।

আমি বললাম, 'তাহলে ত তোমার ঘরে গিয়েও বসতে

পারি। যতক্ষণ তুমি চাও, তোমার দোরগোড়ায় বসে থাকব খালি।'

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আমি কেঁপে উঠলাম, মনে হল যেন বড় বেশী এগিয়ে গেছি। হয় ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে এখনই আমায় ত্যাগ করে চলে যাবে। হয় ত আর কখনো ওর সঙ্গে দেখাও হবে না। হায়, আমার সে কুঠুরীটা কি বিশ্রী! তাই ওর জবাবের প্রতীক্ষায় রইলাম।

ও বললে, 'কেন, দোরগোড়ায় বসবে কেন?' ওর বলার সুরে সদয় ভাবটাই প্রকাশ পেল। ও স্পষ্টই বলল, 'নিশ্চয়ই দোরগোড়ায় তোমায় বসতে হবে না।'

আমরা উপরে উঠে গেলাম।

ভিতরে অন্ধকার, তাই দরদালান পার হবার সময় ও আমার হাত ধরে আগে আগে চলল। ও বললে, 'এতটা চুপচাপ থাকার কোনই দরকার নেই। কথাবার্ত্তা অনায়াসেই চলতে পারে।'

ঘরে ঢুকলাম। ও বাতি জ্বালাল। বাতি জ্বালতে জ্বালতে ও মৃদু হেসে বলল, 'এখন তুমি আমার দিকে তাকাতে পারবে না কিন্তু, ভারী লজ্জা হচ্ছে। যাক আর করব না।'

'কি আর করবে না?'

'আমি আর কখনো ... ও ... না ... কখনো তোমায় চুমো খাব না!'

'চুমো খাবে না?'

উভয়েই হেসে ওঠলাম। তারপর আমি দু'হাত বাড়িয়ে দিলাম, ও সরে দাঁড়াল, আমাদের মাঝখানে টেবিল। উভয়ে উভয়ের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম, টেবিলের উপর বাতিটা জ্বলচে।

ও বললে, "'আমায় ধর ত দেখি!'

হেসে ওকে ধরবার জন্য এগিয়ে গেলাম। দৌড়ুতে গিয়ে ওর ঘোমটা খসে গেল, টুপিটা খুলে ফেলল; ওর উজ্জ্বল চোখ দুটো আমার দিকে নিবদ্ধ, ও আমার হাব ভাব লক্ষ্য করচে। আর একবার ওকে ধরবার জন্য লাফ দিয়ে এগিয়ে গেলাম। পায়ে বেদনা ছিল, তাই ধরতে পারলাম না। গালিচার উপর চিপ করে পড়ে গেলাম। অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়ালাম।

ও বললে, 'কি আশ্চর্য্য! তুমি এত লাল হয়ে গেছ! কী বোকা তুমি!'

ওর সঙ্গে এক মত হয়ে বললাম, 'হাঁ, তাই বটে।' তারপর অবার নতুন করে ধরা-ধরি খেলা শুরু করলাম।

'মনে হচ্চে তুমি যেন খুঁড়িয়ে চলচ।'

'হাঁ খুঁড়িয়ে চলচি হয় ত একটুকু, তেমন বিশেষ কিছু নয়।'

'সেবারে ছিল, তোমার আঙুলে ব্যথা আর এবারে দেখচি পায়ে ব্যথা ; তোমার ত দেখচি অসুখ লেগেই আছে।'

'হাঁ, তাই বটে। দিন কয়েক আগে পায়ে একটা সামান্য চোট্ লেগেছিল।'

'চোট্ লেগেচে? কিসে, কেমন করে লাগল? আবার মাতাল হয়ে ছিলে? কী উচ্ছৃঙ্খল জীবনই না যাপন করচ তুমি!' এই বলে তর্জ্জনী দেখিয়ে আমায় ভয় দেখাল এবং আবার তখুনি গম্ভীর হয়ে গেল। 'যাক, এখন একটু বসা যাক ; না না, দোর-গোড়ায় বসতে হবে না বলচি ; দেখচি আজ তুমি ভারী লাজুক হয়ে পড়েচ! এখানে এসে বস—তুমি এখানটায় বস, আর আমি ওখানে—বেশ, সেই ভাল।... এই যারা কথাবার্ত্তা কয় না তাহাদের নিয়ে ভারী বিরক্ত লাগে! যাক এখন আমার ওই চ্যায়ারখানায় হেলান দিয়ে অনায়াসেই বসতে পার, আর এইটুকুন বুদ্ধি খরচ করতে তুমি অনায়াসেই পারতে। কিন্তু আবার যেই সে কথা বলতে যাচ্চি, অমনি চোখ দুটো পাকিয়ে এমনি করে তাকাচ্চ যেন আমি যা বলচি তা তোমার বিশ্বাসই হচ্চে না, কেমন নয় কি? হাঁ, সত্যি তাই। অনেকবার আমি এটা লক্ষ্য করেচি, আজও আবার করলাম। যাক, তুমি স্বভাবতই এতটা শান্ত শিষ্ট, এটা আমায় বিশ্বাস করাবার চেষ্টা না করলেই ভাল করতে। তুমি তখনি শিষ্ট হও যখন সুবোধ শান্ত না হবার

মত সাহস তোমার থাকে না। নেশা করলেই তোমার সাহসটা একটু বেড়ে যায় আর তখন বাড়ী পর্য্যন্ত লোকের অনুসরণও করতে পার আর তখন ব্যঙ্গও বেশ সস্তা হয়ে পড়ে, দেখুন, আপনি আপনার বইখানা ত ফেলে যাচ্ছেন! হা হা, কী নির্লজ্জ বেহায়া তুমি!'

ভগ্নোৎসাহ হয়ে বসে ওর দিকে চেয়ে রইলাম। বুকটা দপ্ দপ্ করে স্পন্দিত হচ্ছিল। শিরায় শিরায় রক্তস্রোত তীব্র ভাবে বয়ে গেল। তবু এতে যেন একটা বিশেষ তৃপ্তি অনুভব করলাম।

'কথা কইচ না যে?'

বলে উঠলাম, 'কী যে ভাল লাগচে তোমায়, বলতে পারি নে। বসে বসে কেবল তোমায় দেখচি—আর কী ভাল লাগচে!... ভাল না লেগে উপায় কি!... তুমি এমন অসাধারণ যে... সময় সময় তোমার চোখ দুটো এমন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে যার জুড়ি আর কোথাও দেখি নি! চোখ দুটো যেন ফুলের মত... কেমন! না না, ফুলের মত হয় ত নয়, কিন্তু... এমন প্রচণ্ড ভাবে তোমায় ভালবেসে ফেলেচি অথচ আমাদের মিলন এত অসম্ভব যে, কোন দিক দিয়েই তার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই।... তোমার নাম কি? না, এখন তোমার নাম আমায় বলতেই হবে।'

'না। আগে তোমার নাম বল। সে কথা জিজ্ঞাসা করতে

আমি একদম ভুলেই গেছলাম! কাল সারাদিন এই কথাটাই কেবল মনে মনে চিন্তা করেচি যে, তোমার নামটা সর্ব্বাগ্রে জানতে হবে। হাঁ, বলতে গেলে সারা দিনটা কেবল ওই একটি কথাই মনে ভাবি নি, তবে—'

'জান আমি তোমার কি নাম রেখেচি? আমি নাম রেখেচি ল্যাজালি। এ নামটা তোমার কেমন লাগচে? নামটার সঙ্গে যেন কেমন একটা সচ্ছন্দ গতির ভাব মনে জেগে ওঠে।...'

'ল্যাজালি?'

'হাঁ।'

'শব্দটা কি কোন বিদেশী ভাষা থেকে নেওয়া?'

'না, বিদেশী ত নয়।'

'মোটের উপর তেমন বিশ্রী নয় বলতে পারি।'

অনেক আলোচনার পর আমরা পরস্পরের নাম বললাম। ও আমার পাশেই একটা সোফায় বসে চ্যায়ারখানা পা দিয়ে ধাক্কা দিতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গল্প চলল।

ও বললে 'আজ বিকেলে তুমি কামিয়েচ দেখচি। সেবারের থেকে এবাঁরে তোমায় মোটের মাথায় একটু ভালই দেখাচ্চে—এই সামান্য ভাল আর কি। না বাজে কথা ভেবো না ... না না, তা হবে না। সেবারে সত্যিই ভারী অপরিষ্কার ছিলে, তার উপর হাতে ছিল একটা জীর্ণ মলিন কম্বল, আর সেই অবস্থায় তুমি আমায় এক

জায়গায় নিয়ে যেতে চাইছিলে, তোমার সঙ্গে গিয়ে মদ খেতেও অনুরোধ করেছিল। রক্ষা কর, ও-কাজ আমার দ্বারা হয় না।'

বললাম, 'তাহলে বল যে, আমার জীর্ণ মলিন জামা-কাপড় দেখেই সেদিন তুমি আমার সঙ্গে যেতে চাও নি, কেমন ?

ও চোখ নামিয়ে জবাব দিল, 'না, তা নয়। ভগবান জানেন, আমি তা মনে করি নি। সত্যি সেদিন সে কথা আমার মনেও হয় নি।'

বললাম, 'তুমি নিশ্চয় ধারণা করে বসে আছ যে, যেমন খুশী পোষাক পরা আমার ইচ্ছাধীন, কেমন নয় কি না ?—মোটেই তা নয়। আমি নেহাৎ গরীব।'

ও আমার দিকে তাকাল। তার পর শুধোল, 'সত্যি ?'

'হাঁ সত্যি। কি করব, —অদৃষ্ট।'

খানিকক্ষণ কেটে গেল।

ও বললে, 'তা আমিও বড় গরীব।' বলেই হৃষ্টচিত্তে ও মাথা নাড়ল।

ওর প্রত্যেকটি কথা প্রতিটি ভঙ্গী আমায় মাতাল করে তুলল, যেন তা এক এক বিন্দু সুরা। আমি যখন কিছু বলি ও এমন কায়দায় ঘাড় বাঁকিয়ে বসে শোনে যে, সে ভঙ্গীটুকু আমায় মুগ্ধ করে। ওর নিঃশ্বাস আমার মুখে হাওয়া বুলিয়ে দেয়, এটা অনুভব করি।

বলাম, 'জান যে ... কিন্তু এখন রাগ করতে পারবে না—কাল যখন শুতে যাই যেন এ বাহু তোমারি জন্যে নির্দ্দেশ করে রেখেচি ... কাজেই ... যেন এ-বাহুকে উপাধান করেই ... তুমি শুয়েচ ... মনে করেই ঘুমিয়ে পড়লাম।'

'তাই নাকি? বা, ভারী মজা ত!'

চুপচাপ।

'দূর থেকেই সেটা করেচ বেশ করেচ, নতুবা ...'

'আমি যে সাম্‌নাসাম্‌নিও তা করতে পারতাম এটা কি তুমি বিশ্বাস কর না?'

'না, তা সত্যিই বিশ্বাস করি নে ত।'

'আমার দ্বারা সবকিছু সম্ভব,' বললাম। এই বলে এক হাতে ওর কোমর জড়িয়ে ধরলাম।

'আমি পারি কি?' ও আর কিছু বলল না।

ওর এ কথায় বিরক্ত হলাম, বলতে গেলে ভারী আঘাতই পেলাম যে, ও যেন সত্যিই গোবেচারী ভালমানুষ এ ভাবটাই ও দেখাচ্ছিল। মনটাকে শক্ত করে নিজেই নিজেকে আলিঙ্গন করলাম, এবং হাত বাড়িয়ে ওর হাতখানা ধরলাম, কিন্তু ও আস্তে হাতখানা সরিয়ে নিয়ে আমার কাছ থেকে একটু সরে গিয়ে বসল। ফলে আমার সব সাহস উবে গেল। ভারী লজ্জিত হয়ে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম, অবস্থা তখন চরম; আমি যে একটা মানুষ এ

কথাও তখন ভাবতে পারছিলাম না। যখন আমার ভদ্র লোকের মত চেহারা ছিল তখন যদি ওর সঙ্গে দেখা হত ত বেশ হত। কেননা সেদিন আমার অবস্থা ঢের ভাল ছিল, পোষাক-পরিচ্ছদও ভদ্রগোছেরই পরতাম, চেহারাটাও উপুসে উপুসে এতটা ক্যাকলাসের মত দেখায় নি। আর আজ কতদূর অবনতি হয়েচে!

ও বললে, 'এঁখন দেখচি সামান্য চোখ রাঙানিতেই তোমায় যে-কেউ দাবিয়ে দিতে পারে—সামান্য কারণেই তোমায় অপ্রস্তুত করে দেওয়া অত্যন্ত সহজ। ...' এই বলেই ও অর্দ্ধনিমিলিত চোখে হেসে উঠল—ওর চোখে মুখে একটা ধূর্ত্তামি প্রকট হয়ে উঠল; কিন্তু বাইরে এমন ভাব দেখাল যেন ও চোখ চাইতেই পারচে না।

মেজাজ আমার কেমন হয়ে গেল, ফট্ করে বলে ফেললাম, 'আচ্ছা, দেখ পারি কিনা!' এই বলেই প্রবল জোরে দুহাত দিয়ে ওর গলা জড়িয়ে ধরলাম। ও মনে করেচে আমি আনাড়ি, ওর এ ধারণায় প্রথমত ভারী দমে গেলাম। ও কি সত্যিই জ্ঞান্ হারিয়েচে? ও কি সত্যি মনে করে যে আমি নেহাতই আনাড়ি! আচ্ছা, বেশ, ও দেখুক যে, আমি মরি নি ... এ বিষয়ে যে আমি আনাড়ি এ কথা কেউই বলতে পারবে না। আচ্ছা, দেখা যাক কতদূর কি ...

ওঁ নীরবে চুপ করে বসে ছিল, তখনো ওর চোখ দুটো বোজা;

আমরা কেউ কোন কথা বলছিলাম না। ওকে জোর করে আমার দিকে আকর্ষণ করলাম, সাগ্রহে ওকে বুকে চেপে ধরলাম—ও কিন্তু একটা কথাও কইল না। ওর বুকের স্পন্দন বেশ টের পাচ্ছিলাম—আমারটাও শুনছিলাম। মনে হচ্ছিল যেন দূরে কে ঘোড়ায় চড়ে আসচে।

ওকে চুমো খেলাম।

তখন আর আমি আমাতে ছিলাম না। মনে পড়ে, কতকগুলি অর্থহীন কথা আউরে ছিলাম, শুনে নিজেই আবার হেসেছি। আদুরে নামে ডেকে ওর ঘাড়ের দিকটায় চুলকিয়ে, চুমো খেয়ে খেয়ে ওকে অতিষ্ঠ করে তুললাম। ওর বডিসের গোটা দুই বোতাম খুলে ফেলে বুকের দিকে তাকালাম—শাদা সুডোল বক্ষস্থল আর সেখানেই রয়েচে মানুষের চিরন্তন-কৌতূহল ও চিরন্তন-রহস্যের প্রতীক।

বললাম, 'দেখব?' এই বলে আরো গোটাকয়েক বোতাম খুলে ফেলতে চেষ্টা পেলাম কিন্তু আমার চালচলনটা নেহাত অসভ্যের মত, তাছাড়া বডিসের সব শেষ বোতাম কয়টা খুলতে পারলাম না, কেননা সেইখানেই বডিসটা আঁটা ছিল।

'একটু দেখব ... সামান্য একটু?'

ও ওর হাত দিয়ে আমার ঘাড়ে আস্তে আস্তে চাপ দিল—ওর নিঃশ্বাস আমার ডান গালে বয়ে গেল। এক হাতে ও

নিজেই ওর বোতামগুলি একটা একটা করে খুলতে লাগল।" কেমন যেন এক রকম বিব্রত হাসি হাসল এবং বার বার আমার দিকে তাকিয়ে দেখল যে, ওর ভীতি আমার নজরে পড়েচে কিনা। তারপর কোমরে আঁটা রজ্জু খুলে দিল—বুকের ঠেসটাও আলগা করে দিল। আমার নোংরা হাতখানা দিয়ে বোতামগুলি ও রজ্জুটাকে স্পর্শ করলাম।...

ওর দিক থেকে আমার মনটাকে বিষয়ান্তরে টেনে নেবার জন্যে ওর বাঁ হাত দিয়ে আমার কাঁধে চাপড় মেরে বললে, 'এ কি, তোমার মাথায় এত চুল উঠচে!'

জবাব দিলাম, 'হাঁ।' এবং বডিসের ভিতরে ওর বুকে আমার মুখখানাকে ঢুকিয়ে দিতে চাইলাম। ইতিমধ্যে ও শুয়ে পড়েছিল, ওর জামা-কাপড় তখন একদম খোলা। হঠাৎ যেন ও ওর মত বদলে ফেলেচে, যেন মনে করেচে যে, অনেকদূর এগিয়ে গেছে, আর উচিত নয়, এই মনে করে সহসা ও ওর গায়ের জামা-কাপড় আবার ঢাকা দিয়ে একটু উঠে জামা কাপড় সামলাতে সামলাতে আমার মাথার চুল ওঠার প্রসঙ্গটাকে নতুন করে ফেঁদে বসল।

'আচ্ছা, তোমার মাথায় এত চুল উঠচে কেন বলতে পার?

'জানি নে ত।'

'আমার কিন্তু মনে হয় যে, তুমি অতিমাত্রায় মদ খাও বলেই

তোমার চুল ওঠে এবং সম্ভবত ... দূর হোগ গে, আর বলব না। তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত। না, তোমার কোন কথাই আমি বিশ্বাস করি নে! আচ্ছা, একবার ভেব দেখ না, তোমার বয়স ত আর বেশী নয়, এই সবে যৌবন শুরু হয়েচে, এখনই এত চুল ওঠে! যাক সে কথা, কেমন করে তুমি জীবনযাত্রা চালাও তারই কথা সব আমায় বলতে হবে—আমার বিশ্বাস প্রচণ্ড অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে দিয়ে তুমি জীবনটা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছ! আজ আমায় সত্যি কথা সব বলতে হবে, ফাঁকি চলবে না। সত্য বলচ, কি বাদ দিয়ে বলচ, আমি অবশ্য বুঝতে পারব—যাক, এবার বলতে শুরু কর!'

'আচ্ছা, সব কথা বলব 'খন, কিন্তু তার আগে তোমার বুকে আমায় একটি চুমো খেতে দাও।'

'তুমি কি পাগল হয়েচে? যাক, এখন বলতে আরম্ভ কর।'

'না, মণি, আগে আমায় চুমো খেতে দাও।'

'চুপ, না তা হবে না।... আগে বল সব, তারপর তোমার দাবী মিটতেও পারে ... আগে আমি শুনতে চাই তুমি কেমন মানুষ। ... আমার বিশ্বাস—ভীষণ সাংঘাতিক।'

আমার ভারী দুঃখ হল যে, ও আমার সম্বন্ধে জঘন্যতম ধারণা করে বসে আছে। ভয় হল, পাছে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়, কেননা আমার সম্বন্ধে যে, কেউ কোন রকম ভুল বিশ্বাস পোষণ করবে এটা

আমি কিছুতেই সইতে পারব না। ওর চোখে নিজেকে পরিষ্কার করে তুলে ধরতে হবে, নিজেকে ওর যোগ্য প্রমাণ করতে হবে—ওকে বুঝতে দিতে হবে যে, ও যার সামনে বসে আছে সে দেবচরিত্রের লোক। জীবনে স্খলনের সংখ্যা অঙ্গুলিপর্ব্বে গুণতে পারে। সব ইতিহাস তখন একে একে ওর কাছে বলে গেলাম—কিছুইং বাদ দিলাম না—সব সত্যি কথা বললাম। আমার প্রতি ওর অনুকম্পা বাড়ে এ অবশ্য আমার উদ্দেশ্য ছিল না, আমার সত্যিকারের পরিচয়ই ওকে দিলাম। এ কথাও ওকে জানালাম যে, একদিন সন্ধ্যায় আমি কয়টা টাকা চুরী করেছিলাম।

বসে বসে সব কথা ও হাঁ করে শুনল। ওর উজ্জ্বল মুখেচোখে একটা বিষাদ ও ভীতি ফুটে উঠল। দুঃখের কাহিনী বলে মনের মধ্যে যে একটা বিক্ষোভ এসেছিল, তা দূর করে দেবার জন্যে বলে উঠলাম, 'কেমন, এবার ত সব বলা হল! এ সব আর নয়। এবারে আমি বেঁচেচি। ...'

ওর মেজাজ কিন্তু কিছুতেই চাঙ্গা হল না। 'ভগবান রক্ষা করুন!' এ ছাড়া আর একটি কথাও ওর মুখ দিয়ে বার হল না, ও একদম চুপ মেরে গেল। একটু পর পরই আবার সেই একটি কথা—'ভগবান রক্ষা করুন'—বলে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছিল।

বুভুক্ষা

হাসি-ঠাট্টা করে, ওকে আমার বুকে টেনে এনে ওর মনের নেতিয়ে যাওয়া ভাবটা দূর করতে চাইলাম। ইতিমধ্যেই ও ওর জামার বোতাম এঁটে দিয়েছিল। এ দেখে সত্যি সত্যি ভারী দুঃখ হল। ফের্ কেন ও জামার বোতাম এঁটে দিল? স্বকৃত অন্যায়ের জন্যে মাথার চুল ওঠার চাইতে এখন কি আমি ওর চোখে কম অযোগ্য? ... যাক, ওসব বাজে কথা। ... ওকে বুঝাতে চাই যে, আমি পারি এবং এইটে বোঝাবার জন্যেই প্রাণপণ চেষ্টায় ওকে সোফার উপর শুইয়ে দিলাম। ক্ষীণ দুর্ব্বল ভাবে যেন ও বাধা দিল এবং বিস্মিত হয়ে আমার দিকে তাকাল।

বলল, 'না; ... কি চাও তুমি?'

'আমি কি চাই?'

হায়! ও শুধোচ্চে আমি কি চাই! আমি শুদ্ধ দেখাতে চাই যে, আমি পারি, ঠিক পারি। কেবল দূর থেকে নয়, সামনা-সামনিও পারি। সে রকমের লোক আমি নই। এইটেই প্রমাণ করতে চাই যে, আমায় তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা চলবে না, আর চোখ রাঙিয়েও আমায় দাবিয়ে রাখা সম্ভব নয়। না, না, বাস্তবিকই তাই; এ রকম ব্যাপারে আজ পর্য্যন্ত আমার মতলব হাসিল না করে আমি কখনো বিরত হই নি ... এবং মতলব হাসিল করতে চাইলাম।

'না! ... না, তবে ... ?'

'হাঁ, আমি চাই-ই ; এই আমার মতলব।'

'না, শোন আগে!' ও চেঁচিয়ে উঠল। পরে আমায় আঘাত দিবার জন্যে বললে, 'তুমি যে উন্মাদ নও, এ বিষয়ে আমি নিশ্চত নই!'

আপনা থেকেই নিজেকে সামলে নিলাম এবং বললাম, 'তুমি সত্যই কি তাই মনে কর?'

'নিশ্চয়, ভগবান জানেন, নিশ্চয় তাই বিশ্বাস করি। কি অদ্ভুত তোমায় দেখাচ্চে। আর সেই সেদিন বিকালে তুমি যখন আমার অনুসরণ কর তখন কি তুমি মাতাল অবস্থায় ছিলে না?'

'না। তবে একান্ত ক্ষুধার্ত্তও ছিলাম না ; তখন সবেমাত্র খেয়েছিলাম।...'

'হাঁ, তা হবে ; তাইতেই তোমার শরীর আরো খারাপ ছিল।'

'মাতাল থাকাটাই কি বাঞ্ছনীয় ছিল?'

'হাঁ ... উঃ ... তোমায় ভারী ভয় করচে! ভগবান, আমায় বাঁচাও!'

'মুহূর্ত্তকাল ভাবলাম। না, ওকে ছাড়তে পারি নে। সোফায় বসে সন্ধ্যেবেলা বাজে কথা মনে করবার দরকার নেই। 'পেটি-কোটটা খুলে ফেল—এক্ষুণি!' এমন সময়ে কি সব বাজে অজুহাতও লোকের মনে আসে, এ যেন ওর বাজে লজ্জা,

কৃত্রিম সতীপনা, আমি যেন বুঝতে পারি নি! একটু কঠিনই আমায় হতে হচ্চে! 'চুপ! গোল করতে হবে না!'

প্রাণপণ চেষ্টায় ও আত্মরক্ষা করতে লাগল—এ চেষ্টার মধ্যে লজ্জাশীলতার কোনই লক্ষণ নেই। আমার হাত লেগে বাতিটা নিভে গেল, এ যেন নেহাতই হঠাৎ হয়ে গেছে। ও হতাশ হয়ে হাত-পা ছুঁড়তে লাগল।—তারপর চুপিচুপি বললে, 'না, ও 'নয়—ওগো তোমার পায়ে পড়ি, ও নয়! তুমি বরং যত ইচ্ছা চুমো খাও, কিন্তু ও নয়! ওগো দয়া কর, দয়া কর আমায় ...'

তৎক্ষণাৎ থামলাম। ওর কণ্ঠস্বর এমন ভীতু, অসহায় করুণ যে, আমার মর্ম্মে গিয়ে তা বিঁধল। চুম্বন করবার সুযোগ দিয়ে ও গুণাগারি দিতে চায়! কি সুন্দর, কি সুন্দর সরলতা! হাঁটু গেড়ে ওর সামনে আমার বসা উচিত।

সম্পূর্ণ উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বললাম, 'কিন্তু সুন্দরী, বুঝতে পারচি নে ... সত্যি আমি ধারণাও করতে পারচি নে যে, এ তোমার কি খেলা!...'

ও উঠে বাতিটা আবার জ্বালল, ওর হাত কাঁপছিল। সোফায় হেলান দিয়ে বসলাম মাত্র, আর কিছুই করলাম না। এখন কি হবে? সত্যি বলতে কি মেজাজটা আমার একদম বিগড়ে গেল।

দেয়ালে একটা ঘড়ি ছিল, ও তার দিকে তাকিয়ে চমকে

উঠে বললে, 'ওঃ, এত রাত হয়েচে! পাশের ঘরের মেয়েটি হয় ত এখনই ফিরবে।' এই কথাটাই মাত্র ও প্রথম বলল। ইঙ্গিতটা বুঝে তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালাম। ও ওর জ্যাকেটটা কুড়িয়ে নিয়ে গায়ে দিবার জন্যে হাতে তুলে নিল, তারপর কি ভেবে আবার সেটাকে ফেলে রেখে চুল্লীর পাশে গেল। ও যেন আমায় চলে যেতেই ইঙ্গিত করচে। আমি বললাম, 'তোমার বাবা কি সৈন্য-বিভাগে কাজ করতেন?' জিজ্ঞাসা করেই চলে আসবার জন্যে প্রস্তুত হলাম।

'হাঁ; তিনি সামরিক কর্ম্মচারী ছিলেন। কিন্তু তুমি কেমন করে তা জানলে?'

'আমি জানতাম না, তবে আমার যেন কেন তা মনে হল।'

'ভারী অদ্ভুত ত!'

'হাঁ অদ্ভুতই বটে। জীবনে এমন অনেক জায়গায় এসেচি যেখানে এসেই আমার পূর্ব্ব-সংস্কার এমনি ধারা মিলে গেছে। এ আমার উন্মত্ততার একটা লক্ষণ নয় ত!'

তৎক্ষণাৎ ও আমার দিকে তাকাল কিন্তু কিছু বলল না। মনে হল, আমার উপস্থিতি ওকে ভারী উত্যক্ত করে তুলেচে। কাজেই অগোণে চলে আসব স্থির করলাম। দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। ও কি আর আমার চুমো খাবে না?— করমর্দ্দনও কি করবে না? দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

ও বললে, 'তাহলে তুমি কি এখনই চলে যাচ্ছ?' তবু ও চুল্লীর সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

জবাব দিলাম না। দারুণ অপ্রতিভ অবস্থায় দাঁড়িয়ে কিছু না বলে ওর দিকে চেয়ে রইলাম। চলেই ত যাচ্চি, যাওয়ার সময় ও কেন আমায় একটু সম্ভাষণও করচে না? ওকে ত আর বিরক্ত করচি নে। ও যেন এরই মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আমার এলাকার বাইরে। বিদায় নিতে গিয়ে এমন কিছু বলা দরকার মনে করলাম যা ওর মনে স্থায়ী হয়ে থাকবে। ওর ব্যবহারে একেই ত মনটা বিরূপ হয়ে ছিল, তাই ও কথা মনে হতেই সব প্রথম গর্ব্বিত বা উদাসীন, উদ্বিগ্ন বা ক্ষুণ্ণ কিছুই না হয়ে তৎক্ষণাৎ যা-তা বাজে বকতে শুরু করে দিলাম। কিন্তু সে রকম হৃদয়-গ্রাহী কোন কথাই মুখ দিয়ে বার হল না। আমার সমস্ত বলা-কওয়ার মধ্যে কোথাও কিছুমাত্র লক্ষ্য ছিল না। আচ্ছা, ও কেন আমায় সোজা পথ দেখিয়ে দিচ্চে না? নিজেকে প্রশ্ন করলাম। হাঁ, সত্যিই ত কেন দিবে না? এর জন্যে এতটুকু 'কিন্তু' করবার দরকার নেই। মেয়েরা এখনি ফিরবে এ কথা মনে করিয়ে না দিয়ে ও ত অনায়াসেই স্পষ্ট বলতে পারত, 'এখনই তোমায় যেতে হবে, মাকে আনতে যাব আমি। এবং আমার সঙ্গে তোমায় যেতে হবে না।' তাহলে এই কথাই কি বুঝতে হবে যে, ওর ব্যবহারের সঙ্গে ওর মনের কিছুমাত্র সামঞ্জস্য নেই। হাঁ, সত্যি; ও

এ কথাও মনে করেচে নিশ্চয়। তৎক্ষণাৎ ওর মনের ভাব বুঝতে পারলাম। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে আমায় বেশী বেগ পেতে হল না। ওর জ্যাকেটটা ও যে ভাবে গ্রহণ করল এবং পরক্ষণেই একপাশে ফেলে রাখল তার থেকেই ব্যাপারটা সহজেই বুঝতে পারলাম। আগেই বলেচি যে, এ সম্বন্ধে আমার আগে বুঝবার একটা সহজাত সংস্কার রয়েচে, তাই এর মূলে নিছক বাতুলতা আছে বলে মনে করবার কোন কারণই নেই। ...

ও চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'ঈশ্বরের দোহাই, ও কথাটার জন্তে আমায় ক্ষমা কর, মুখ ফস্‌কে কথাটা বেরিয়ে এসেচে।' এ কথা বলেও কিন্তু ও নীরবে একই জায়গায় অটল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, আমার সামনে পর্য্যন্ত একটু এল না।

রোথ্ চড়ে গেল। যা-তা বাজে বকে এবং চলে না এসে ওকে যে উত্যক্তই করচি মাত্র এটা বেশ বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু তবু সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। বেশ জানতাম যে, আমার কথায় ওর মনের কিছুমাত্র বদল হবে না, তবু থামলাম না।

জোর করেই বলতে পারি যে, লোকে বাতুল না হতে পারে কিন্তু তা বলে যে তার জ্ঞানগম্য কিছুই থাকতে নেই এ কথা অবশ্য কিছুতেই বলা চলে না। এমন প্রকৃতির লোকও আছে যারা সামান্যতেই খুশী হয়ে থাকে এবং একটা কঠিন শব্দেই একেবারে ঘায়েল হয়ে পড়ে। আমার প্রকৃতিও সেইরূপ,

বুভুক্ষা

এই হচ্ছে আমার বলবার কথা। আসল কথা, আমার দারিদ্র্য সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলাম, আর সেই কারণে এ ব্যাপারটায় আমার মনটা ভারী অপ্রীতিকর হয়ে উঠল। হাঁ, সত্যি অপ্রীতিকর ; কি করব, দুর্ভাগ্য ! কিন্তু তাহলেও এই অপ্রীতিকর ভাবেরও একটা উপযোগিতা আছে। জীবনের কোন কোন অবস্থা-বিশেষে এর থেকে অনেক সাহায্য আমি পেয়েছি। পরম বুদ্ধিমানের চাইতে সামান্য বুদ্ধিমান ঢের বেশী পর্য্যবেক্ষণের সুযোগ পেয়ে থাকে। দরিদ্র এক-পা এগুতে গেলে চারদিক বিশেষ করে দেখে নেয়, এবং কে কি বলাবলি করে তা গভীর মনো-যোগের সঙ্গে শোনে—এটা যেন তার স্বভাব, তার চিন্তা তার বোধশক্তির একটা দারুণ কর্ত্তব্য। শোনার শক্তি তার অপরসীম, সে অত্যন্ত অভিমানী ; জীবনের অভিজ্ঞতা তার প্রচুর, জীবনের দহনজ্বালা সে অন্তরের মধ্যে লুকিয়ে রাখে একান্তে গোপনে। ...

অন্তরের সে দহনজ্বালা সম্বন্ধে যতই বলি, ও ততই অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। অবশেষে হতাশ হয়ে ও বার কয়েক বলে উঠল, 'ভগবান !' 'ভগবান !' সঙ্গে সঙ্গেই হাততালি দিল। বেশ বুঝতে পারচি যে, আমি ওকে যথেষ্ট যন্ত্রণা দিয়েচি। অথচ ওকে যন্ত্রণা দেবার ইচ্ছা মোটেই আমার ছিল না কিন্তু তবু যন্ত্রণা দিলাম। ওকে আঘাত দেবার যে মতলব আমার ছিল, তা যখন এই ভাবে সার্থক হল তখন ওর সেই হতাশব্যঞ্জক কণ্ঠস্বরে

আমি অনেকটা নরম হয়ে গেলাম। এবং বলে উঠলাম, 'এই যাচ্চি, আমি এখনই যাচ্চি। দোরও খুলেচি। আসি তাহলে। চলেই ত যাচ্চি, একটা কথা অবশ্য জবাবে বলতে পার। যদি ব্যথা পাও, আর কখনো দেখাও করব না তোমার সঙ্গে। কিন্তু শেষ সময়ে কেন একটু শান্তি দিচ্চ না? আমি তোমার কি করেচি? তোমার চলার পথে আমি ত আর বাধা হয়ে দাঁড়াই নি, দাঁড়িয়েচি কি? তুমি যেন আর আমায় চিনতেই চাও না, এতশীঘ্রই আমার প্রতি বিমুখ হলে? আমায় এমন করে ছেড়চ যে, সত্যি মনে করচি, আগের চাইতে আজ আমি ঢের বেশী দুর্ভাগা;—কিন্তু সত্যি আমি পাগল নই। তুমি বেশ জান, এবং একটু ভাবলেই বুঝতে পারবে যে, আমা হতে তোমার আর ভয়ের কোন কারণই নেই। অতএব সামনে এসে বিদায় দাও—নয় বল ত আমিই তোমার সামনে গিয়ে বিদায় নিই। তোমার আর কোন ভয় নেই, কোন ক্ষতি করব না। শুধু তোমার সামনে এক মিনিটের জন্যে হাঁটু গেড়ে বসব—একটিবার মাত্র এই মেঝের ওইখানটায় হাঁটু গেড়ে বসব, সে সুযোগও কি পাব না? দেখচি তুমি ভয় পেয়ে গেছ। না, আর তোমায় স্পর্শও করব না, সত্যি বলচি, তোমায় স্পর্শও করব না, শুনচ? এত ভয় পাচ্চ কেন? চুপ করেই ত দাঁড়িয়ে আছি, নড়া-চড়াও ত করচি নে। গালিচার উপর একবার হাঁটু গেড়ে বসব

মাত্র—ওই খানটায়, ওই লাল জায়গাটায়, কিন্তু তুমি দেখচি ভারী ভীত হয়ে পড়েচ, তোমার চোখে মুখে একটা দারুণ ভীতি ফুটে উঠেচে, আর তাই অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। যখন বলেছিলাম যে আমি পারি, তখন থেকে আর এক-পাও আমি এগুই নি, এগিয়েচি কি? সেই তখন থেকে একেবারে অচল অটল হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। দেখচি তুমি আমার সামনে আসতে ভয় পাচ্চ। আমি ভাবতেও পারচি নে যে, কেমন করে তুমি আমায় উন্মাদ বলতে পারলে। মনে হয় আমার সম্বন্ধে তোমার ধারণা যে সত্য তুমিও তা বিশ্বাস কর না, কেমন কি না? সে অনেকদিন আগের কথা, একবার গরমের দিনে আমার মাথা খারাপ হয়েছিল। তখন কঠোর পরিশ্রম করতাম, যথাসময়ে খেতে ভুল হত, কত বিষয়ই না চিন্তা করতাম। দিনের পর দিন এ ভাবে কেটেচে। সময় মত খাবার কথা মনে থাকা আমার উচিত; কিন্তু সত্যি বলচি, রোজই আমার ভুল হত। মিথ্যা যদি বলে থাকি ত ভগবান আমায় তার শাস্তি দিবেন নিশ্চয়। কাজেই তুমি যদি আমার সম্বন্ধে এ ভাবই পোষণ কর ত আমার প্রতি বিশেষ অবিচার করা হবে। অভাবে পড়ে যে ও রকম করতাম তা নয়, পয়সা না থাকলে ধারও ত যথেষ্টই পেতে পারি—দু'তিনখানা দোকানে ধার আমি পেয়েও থাকি। তাছাড়া তখন পকেটে বেশ টাকাপয়সাও থাকত কিন্তু তা সত্ত্বেও

খাবার কিনতে একদম ভুলে যেতাম। শুনচ? তুমি ত কিছুই বলচ না দেখচি; জবাবেও ত কিছুই বলচ না; চুল্লীর সামনে থেকে একটুও ত নড়চ না; যেন আমার প্রতীক্ষায়ই ওখানে অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছ।...'

তৎক্ষণাৎ ও দুবাহু প্রসারিত করে চট্‌ করে আমার দিকে এগিয়ে এল। দারুণ অবিশ্বাসের সঙ্গে ওর দিকে তাকালাম। ও কি সত্যিকারের আগ্রহের সঙ্গেই এল, না আমার হাত এড়াবার জন্যেই এল? দু বাহু দিয়ে ও আমার গলা বেষ্টন করল; দেখলাম ওর চোখদুটি অশ্রুভারাক্রান্ত; নীরবে দাঁড়িয়ে ওর দিকে চাইলাম। ও ওর মুখ এগিয়ে দিল; কিন্তু আমি ওকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। আমার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যই যে এ ওর খেসারত সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

ও যেন কি বলল! আমি যেন শুনলাম ও বলচে, 'সকল দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও তোমাকে আমার বড় ভাল লাগে।' খুব নীচু গলায় অস্পষ্টস্বরে কথাটা বলল। হতে পারে আমি ভুলও শুনে থাকতে পারি। হতে পারে ঠিক এই কথাগুলিই ও বলে নি। তাহলেও ও কিন্তু আমার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং দু হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরল এবং ভাল করে আমায় জড়িয়ে ধরবার সুবিধা হবে মনে করে গোড়ালিতে ভর দিয়ে দাঁড়াল। অবশ্য

মিনিটখানেক মাত্র জড়িয়ে ধরে ছিল। আমার মনে হল, ও যেন জোর করেই এই মমতাটুকু দেখাল। তাই বললাম, 'বাঃ, এ ত বেশ ভাল!'

আর একটি কথাও বললাম না। দুহাতে ওকে জড়িয়ে ধরে তখনি আবার ছেড়ে দিয়ে পিছু হটে এলাম এবং দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে পড়লাম। ও আমার পিছনে, সেইখানটায় দাঁড়িয়ে রহিল।

8

শীত আরম্ভ হয়েচে—আর্দ্র সিক্ত শীত, বলতে গেলে বরফ পড়তে তখনো মোটেই শুরু করে নি। কুজ্ঝটিকাময়, অন্ধকার, দীর্ঘ রাত্রি যেন শেষ হতে চায় না, গোটা সপ্তাহে একবারও জোরে বাতাস বয় নি। রাজপথে দিনের বেলায়ও গ্যাসের আলো জ্বালাতে হয়, তবু কিন্তু কুয়াশায় পথ চলতে লোকের গায়ে গায়ে ধাক্কা লাগে, অতটুকু দূর থেকেও কেউ কাউকে দেখতে পায় না। প্রত্যেকটি শব্দ, গীর্জ্জার ঢং ঢং শব্দ, ঘোড়ার খুরের শব্দ, সব কিছু মিলিয়ে যেন প্রকৃতির কানে তালা ধরিয়ে দিচ্ছিল এবং সেই কিম্ভূতকিমাকার শব্দ প্রাণে একটা ভীতির সঞ্চার করছিল।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলে গেল কিন্তু আবহাওয়ার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হল না।

আমি তখন ভ্যাটারল্যাণ্ড সরাইখানায় আড্ডা গেড়েচি। যতই দিন যাচ্ছিল ততই এই সরাইখানার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছিলাম, কেননা অনাহারে থাকলেও এখানে মাথা গুজবার একটি আশ্রয় জুটেছিল। টাকাপয়সা যা সামান্য ছিল, তা অনেকদিন আগেই নিঃশেষ হয়ে গেছল, কিন্তু তবু প্রতিদিন এখানে এসে রাত্তিরে আশ্রয় নিতাম, যেন এখানে থাকবার অধিকারটা আমার

জন্মে গেছে। কেউ আমায় বাধা দিত না, আমারও কোন সঙ্কোচ ছিল না। বাড়ীউলি কিছুই বলত না বটে কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে যে ভাড়া দিতে পারছিলাম না তার জন্যে আমার মনে উদ্বেগের সীমা ছিল না। এমনি করে তিন সপ্তাহ কেটে গেল। অনেকদিন থেকে আবার রীতিমত লিখতে শুরু করে দিয়েছিলাম বটে কিন্তু এমন কিছুই লিখতে পারছিলাম না যা আমার চিত্তে আত্মপ্রসাদ এনে দিতে পারে। ভাগ্য আমার সুপ্রসন্ন ছিল না কিন্তু তা সত্ত্বেও দিন রাত্তির ভীষণ খাটুনি খাটছিলাম। কি লিখচি সে দিকে খেয়াল ছিল না, তবে লেখা শেষ হলেই দেখতে পেতাম যে তা ভাল হয় নি। পূর্ব্বেই বলেচি, ভাগ্য আমার প্রতি প্রসন্ন ছিল না, তবু বৃথা চেষ্টাই আমি করছিলাম। তেতলার একখানা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঘরে বসে আমার এ ব্যর্থ চেষ্টা ক্রমাগত চলছিল! যে পর্য্যন্ত আমার পকেটে পয়সা ছিল এবং আবশ্যক খরচ চালাতে পেরেচি ততদিন এই ঘরে কোন রকম অসুবিধাই আমার হয় নি। সব সময়ই আশার দোলায় আমার মন দুলত যে, একটা না-একটা লেখা ভাল করে লিখতে পারলে তার থেকেই ঘরভাড়া ও অন্যান্য আবশ্যক ব্যয় জোগাতে পারব। সে কারণেই ক্রমাগত ওই রকম মেহনত করছিলাম। বিশেষ করে, আগুন সম্বন্ধে একটা রূপক নিয়ে আমার সকল শক্তি সকল কল্পনার ভাণ্ডার উজাড় করে দিয়েছিলাম, আশা ছিল, এ লেখাটা দিয়ে সম্পাদক মশাইর কাছ থেকে বেশ মোটা

রকম কিছু পাবই। এবারে তিনি বুঝতে পারবেন, তাঁর দয়া অপাত্রে ন্যস্ত হয় নি। লেখাটা পেয়েই যে তিনি সাগ্রহে সেটি পড়ে দেখবেন, সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। অনুকূল প্রেরণার অপেক্ষায় আমি দিন গুণছিলাম। কিন্তু সে প্রেরণা আমার মধ্যে এখনো কেন এল না? আজ যে আমার অন্তর একেবারে ফাঁকা। বাড়ীউলি প্রতিদিনই আমায় সকালে বিকেলে খানিকটা রুটি-মাখন দিত। কাজেই উপবাসের দুর্ব্বলতা তখন বড় একটা আমার ছিল না। এখন অবশ্য লিখতে গেলে হাত জ্বালা করে না এবং তেতলার জানলা দিয়ে দূরে চাইতে গেলে মাথাও ঘোরে না। সকল রকমেই ভাল আছি কিন্তু তবু কেন যে আমার সে রূপকটা শেষ করতে পারছিলাম না তা বোঝা দুঃসাধ্য। কেন এমন হয়! ...

তারপর একদিন এল, যেদিন স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে, সত্যি সত্যি আমি কতটা দুর্ব্বলই না হয়ে পড়েচি, কী শোচনীয় অসামার্থ্য নিয়েই না আমার নিরেট মস্তিষ্ককে পরিচালনা করতে হচ্ছিল।

সেদিন সকালে বাড়ীউলি এসে একটা হিসাব দেখে দিতে বললে। হিসাবটা নাকি সে কিছুতেই মেলাতে পারচে না। কোথায় নাকি গোলমাল থেকেই যাচ্চে।

তৎক্ষণাৎ হিসাবটা নিয়ে ঠিকটা দেখতে লেগে গেলাম।

বাড়ীউলি আমার সামনে বসে আমার দিকে চেয়ে ছিল। একবার প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত ঠিকটা দেখে গেলাম, ঠিকটা ঠিকই আছে। দ্বিতীয় বারও সেই একই ফল হল। বাড়ীউলির দিকে তাকালাম, আমি কি বলি তারই প্রতীক্ষায় ও তখন সাগ্রহে বসেছিল। সঙ্গে সঙ্গে এটাও আমার দৃষ্টি এড়াল না যে, বাড়ীউলি গর্ভবতী; বলা বাহুল্য, যাকে হাঁ করে তাকান বলে এমনি ভাবে অবশ্য তার দিকে আমি তাকাই নি।

'হিসাবটা ঠিকই আছে,' বল্লাম।

'না ঠিক নেই। আর একবার প্রত্যেক দফা ধরে ধরে যোগ দিয়ে দেখ।' বাড়ীউলি বলল। 'ও অঙ্কটা কোন মতেই হতে পারে না, আমি ঠিক জানি।'

অগত্যা আমি প্রত্যেক দফা পর পর বসিয়ে দেখতে লাগলাম—

রুটি ২ খানা——৵১০	ল্যাম্পের চিমনি——৴৹
সাবান——।৹	মাখন——।৴৹ ইত্যাদি

এ রকম হিসাব ঠিক দিতে প্রচুর বিদ্যার দরকার হয় না—দু দশ আনার হিসেব ত মুখে মুখেই হতে পারে। কোথায় যে ভুল তা বার করবার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করলাম কিন্তু ভুল কোথায় ধরতে পারলাম না। হিসেবটা নিয়ে মিনিট কয়েক চেষ্টাচরিত্তির করবার পর মনে হল যে, হিসাবের সবগুলি অঙ্ক যেন আমার মগজে তাণ্ডব নৃত্য শুরু করে দিয়েচে এবং কোন্‌টা জমা আর কোন্‌টা খরচ

কিছুই হদিস পেলাম না। সব যেন গুলিয়ে গেছে, সব-কিছু একসঙ্গে পাকিয়ে ফেললাম। সবশেষে আর একটা খরচের অঙ্কে এসে আমার মননশক্তি আর এগোতে পারলে না,—পাঁচ ছটাক পনির—॥/০ আনা। এই অঙ্কটার দিকেই হা-করে চেয়ে রইলাম।

'কি বিশ্রী করেই না লেখা হয়েচে,' হতাশ হয়ে বলে উঠলাম। 'কি বিপদ, এখানে দেখচি আবার পাঁচ ছটাক পনির খরচ লেখা রয়েচে। এমন ধারা হিসেব কেউ কখনো শুনেচে? হাঁ, এই দেখ, নিজেই দেখতে পাবে।'

'হুঁ', ও বললে; 'এ জিনিষ অমনি করেই লেখা হয়। দিনেমারদের তৈরী কিনা। হাঁ, ঠিক আছে—পাঁচ ছটাক পনির—ঠিক আছে।'

ওকে বাধা দিলাম বটে কিন্তু আমিও তার বেশী আর কিছুই বুঝতে পারি নি। বললাম, 'হাঁ, সবকিছুই বুঝতে পেরেচি।'

মাসকয়েক আগে যে হিসেব মুহূর্তের মধ্যে ঠিক দিতে পারতাম, সেই সামান্য হিসেবটা নিয়ে আর একবার বসে গেলাম। ভয়ানক ভাবে ঘাম হতে লাগল। প্রাণপণে এই খুদে দুর্জ্ঞেয় হিসেবটা নিয়ে মগজ চালনা করতে আরম্ভ করে দিলাম। খুব যেন হিসেবটা নিয়ে ভাবচি এমনি ভাবখানা দেখিয়ে ঘন ঘন মিট্ মিট্ করে চাইছিলাম, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বিফল হয়ে হাল ছেড়ে দিতে হল। এই পনিরের

অঙ্কটাই আমার মাথা গুলিয়ে দিল, হিসেবটা ঠিক হচ্ছিল কিন্তু এই পনিরের অঙ্কটা যেন চলতে চলতে হঠাৎ আমার মগজে মট্ করে ভেঙ্গে গেল—হিসেবটা শেষ পর্য্যন্ত আর এগোতে পারল না।

কিন্তু তবু যেন হিসাবটা নিয়েই ভাবচি এই ভাবটা দেখাবার জন্যই বার বার ঠোঁট কামড়িয়ে জোরে জোরে অঙ্কগুলি আওড়াতে লাগলাম। এখনই যেন হয়ে যাবে। বাড়ীউলি তখনো বসে অপেক্ষা করছিল। শেষটায় বললাম, 'প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত ত বার বার দেখলাম, কোন রকম ভুল ত নজরে এল না।'

ও জবাবে বলল, 'তাই নাকি! সত্যি ভুল নেই?'

আমি কিন্তু দেখলাম যে, ও আমার কথা বিশ্বাসই করল না এবং ওর কথায় যেন বেশ একটু বিদ্রূপের সুর প্রকাশ পেল। এ সুর ওর কথায় আর কখনো পাই নি। ও বললে, 'আমি হয় ত ছটাক-কাঁচ্চার হিসেবে অভ্যস্ত নই, কাজেই বাধ্য হয়েই ও এমন লোককে দিয়ে হিসেবটা দেখিয়ে নেবে, যে ছটাক-কাঁচ্চার হিসেবে অভ্যস্ত। আমায় লজ্জা দিবার জন্যই যে ও এ কথাগুলি বল্‌লে তা নয়, আঘাত দেবার মতলব অবশ্য ওর ছিল না; অমনি গম্ভীর ভাবে ভেবে চিন্তে ও কথাগুলি বললে। দরজা পর্য্যন্ত গিয়ে আমার দিকে না তাকিয়েই আবার বলল, 'তোমার সময় নষ্ট করলাম, মাফ করো।'

বলেই ও চলে গেল।

মুহূর্ত্তের মধ্যেই আবার দরজা খুলে ঘরে ঢুকল। হয় ত সিঁড়ি পর্য্যন্ত গেল, আবার ফিরে এল।

বললে, 'আমায় ভুল বুঝো না। তোমার কাছে কিঞ্চিৎ পাওনা হয়েচে, হয় নি কি? প্রায় তিন সপ্তাহ হল এখানে এসেচ। দেখতেই ত পারচ আমার সংসারটি নেহাৎ ছোট নয়, কাজেই খরচ-পত্তরও আছে, তার উপর যদি আবার তোমাদেরও ধারে দিতে হয় ত আমার পক্ষে একটু কষ্টকর হয় না কি? বেশী কি ...'

বাধা দিয়ে বললাম, 'তোমায় ত বলেইচি যে, আমি একটা লেখা নিয়ে ব্যস্ত আছি। ওটা শেষ করতে পারলেই তার টাকা থেকেই তোমার পাওনা সব শোধ দিতে পারব। তুমি ভেবো না কিছু। ...'

'হাঁ; কিন্তু ও লেখাটা যে তোমার কখনো শেষ হবে না এ কথাও ঠিকই।'

'তুমি কি তাই মনে কর? হয় ত কালই লেখার ঝোঁক আসবে, আজ রাত্রেও আসতে পারে। কিছুই অসম্ভব নয়, আজ রাত্রেই হয় ত আসবে, আর তাহলে লেখাটা শেষ করতে বড় জোর আধঘণ্টাই লাগবে। বুঝতেই ত পারচ, অন্য লোকের মত আমার কাজ নয়, যখন খুশী লিখতে বসলেই লেখা আসে না। আমাকে অনুকূল প্রেরণার জন্যে অপেক্ষা করতে হয়, আর সেই প্রেরণা যে কখন্ কোন্ সময় আসবে তা কেউ বলতে পারে না—সে আপনা থেকেই আসে। ...'

বাড়ীউলি চলে গেল কিন্তু স্পষ্টই বুঝতে পারলাম যে, আমার প্রতি যে তার বিশ্বাস ছিল তার মূল যেন অনেকটা শিথিল হয়ে গেছে।

ও চলে যেতেই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে নিরাশায় মাথার চুল ছিঁড়তে লাগলাম। না, না, কিছুতেই আর আমার নিস্তার নেই! মস্তিষ্ক যেন একেবারে দেউলে হয়ে গেছে। সামান্য পনিরের দামের হিসেবটাও যখন কষতে পারলাম না তখন যে আমি একেবারে নিরেট অপদার্থ ব'নে গেছি সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু এখনো ত এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে কত প্রশ্নই না করচি, তবু কি বলতে হবে যে, আমি সকল জ্ঞানই হারিয়েচি? হিসেবটা দেখবার ফাঁকেই কি এটা আমার নজরে আসে নি যে, বাড়ীউলি গর্ভবতী? এটা জানবার ত আর কোন কারণই ছিল না, কেউ ত সে কথা আমায় বলে নি, আর চেষ্টা করেও তা আমায় দেখতে হয় নি। নিজের চোখেই ঘরে বসে বসে দেখলাম—ছটাক-কাঁচ্চার হিসেব মেলাতে গিয়ে যখন নিরাশ হয়ে পড়ছিলাম তখনই চোখে পড়ল এবং দেখেই বুঝতে পারলাম। এ ব্যাপারটার ব্যাখ্যা কেমন করে নিজের কাছে দিই?

জানলার সামনে গিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম। দূরে একটা গলিতে ছেলেমেয়েরা খেলাধূলো করছিল। ছেলেগুলির সকলকারই পোষাক নোংরা, ছেঁড়া। তারা একটা খালি শিশি নিয়ে ছোঁড়াছুঁড়ি

খেলছিল এবং চেঁচামিচিও কম করছিল না। সংসার করতে যে সব জিনিষ দরকার হয় তাই বোঝাই হয়ে. রাস্তায় একটা গাড়ী অপেক্ষা করচে। মনে হল কোন পরিবার হয় ত বাসা বদল করচে।* বোঝাই গাড়ী দেখেই আমার তা মনে হল। গাড়ীতে পোকায় কাটা তোষক, আসবাবপত্র, লাল রঙ্গের থান কয়েক তিনপায়া চ্যায়ার, একটা মাদুর, একটা পুরাণো ইস্ত্রি, টিনের বাসনকোসন ইত্যাদি অনেক কিছু রয়েচে।

একটা কুৎসিত ছোট্ট মেয়ে, মুখময় তার সিক্নি, ঝাকনি লেগে পড়ে না যায় তাই দুহাতে জিনিষপত্র শক্ত করে ধরে বোঝার উপর বসে আছে। মেয়েটি রং-চটা দাগ-লাগা মাদুরগুলির উপর পরম গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বসে ছেলেদের খেলা দেখছিল।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই সবই দেখছিলাম। সুমুখে যা যা সব ঘটচে তা বুঝতে আমার কিছুমাত্র অসুবিধা হচ্ছিল না। জানলার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই সব লক্ষ্য করছিলাম তখন আমার বাড়ীউলির দাসীটা রান্নাঘরে গান করছিল, ঠিক আমার পাশের ঘরে। তার গানের সুরটা আমারও জানা ছিল এবং সে ঠিক সুরে গাইতে পারে কি না জানবার জন্য আগাগোড়া গানটা শোনলাম। সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল যে, মগজ দেউলে হলে সত্যি কেউ কখনই তা পারে না।

*নরওয়েতে বাসা বদল করতে হলে বছরে দুইবার—মার্চ্চ ও অক্টোবর মাসের ১৪ই তারিখ করতে হয়।

অন্য আর দশ জনের মতই আমার জ্ঞানও তখন বেশ টন্‌টনেই আছে তাহলে।

হঠাৎ দেখলাম রাস্তায় যে ছেলেগুলি খেলা করছিল তাদের দুজন লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে পরস্পরকে গালাগালি দিতে আরম্ভ করল। দুটো বাচ্চা ছেলে; তাদের একটিকে চিনলাম, বাড়ীউলির ছেলে। তারা পরস্পরকে কি বলাবলি করচে শুনবার জন্য জানলার কপাট দুখানা ভাল করে মেললাম এবং তৎক্ষণাৎ ছেলেগুলি আমার জানলার নীচে এসে জমায়েত হল এবং ঔৎসুক্যের সঙ্গে উপরের দিকে তাকাল। তারা কি কিছু চাইচে? সে কিছু কি আমায় নীচে ছুঁড়ে দিতে হবে? শুক্‌ন ফুল, চুরুটের টুকরো বা অমনি আর কিছু—যা নিয়ে তারা খেলা করতে পারে? তারা তাদের তুষার-পীড়িত মুখে সাগ্রহ দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। এদিকে সেই খুদে শত্রু দুটি পরস্পরকে বেশ গালাগালি দিচ্ছিল।

দুটি বালকের মুখ থেকে দুষ্ট কীটের ভীষণ ভ্যান্ ভ্যানানির মত ঝাঁকে ঝাঁকে গালাগাল বেরুতে লাগল; ভীষণ গালাগালি—চোর-ডাকাতের ইতর ভাষা, খালাসীদের ব্যঙ্গবিদ্রূপ, কিছুই বাদ গেল না; সম্ভবত এ সব তারা জেটি থেকে আয়ত্ত করে নিয়েচে। ছেলে দুটো এতটা মত্ত হয়ে গেছল যে, বাড়ীউলির আগমনটা লক্ষ্যও করতে পারে নি। গোলমাল শুনে ব্যাপার কি জানবার জন্য সে বেরিয়ে এসেছিল।

বুভুক্ষা

মাকে দেখতে পেয়েই পুত্র বলতে লাগল, 'হঁা মা, ও আমার গলা টিপে ধরেছিল, এতক্ষণ নিঃশ্বাসও আমি নিতে পারি নি।'

এদিকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী দারুণ বিদ্বেষের সঙ্গে দন্তপ্রদর্শন করে পাশেই দণ্ডায়মান ছিল, ভীষণ রেগে উঠে চেঁচিয়ে সে বলে উঠল, 'মিথ্যেবাদী পাজী কোথাকার! তোর মত হারামিকে কেউ গলাটিপে ধরতে পারে রে উল্লুকের বাচ্চা! পারব না একদিন।...'

দশ বছর বয়সের গুণধর পুত্রকে মাতা ঘাড়ে ধরে ভিতরে টানতে টানতে বললে, 'হতভাগা ছেলে, আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন। নোড়া দিয়ে তোর দাঁত না ভাঙ্গি ত আমার নামই নেই। এসব আকথা কুকথা কোথায় শিখলি? বাজারে গালাগাল তোকে কে শেখাল বল্ হতভাগা! আয়, ভিতরে আয় আগে!'

'না যাব না আমি।'

'যেতেই হবে তোকে।'

'না, আমি যাব না।'

জানলার ধারে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম মায়ের মেজাজ ক্রমে চড়ে যাচ্চে। অপ্রীতিকর দৃশ্য আমায় ভয়ানক উত্তেজিত করে তুলল। সহ্য হল না, ছেলেটাকে ডাকলাম। তাদের বিচ্ছিন্ন করে এ অপ্রীতিকর দৃশ্যটা বন্ধ করে দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য ছিল।

শেষবার খুব জোরে চেঁচিয়েই ডেকেছিলাম, আমার ডাক শুনতে পেয়ে মাতা আমার দিকে তীব্র কটাক্ষ হেনে একবার চাইল। তৎক্ষণাৎ সে শান্ত হল, বিরক্তি ও স্পষ্ট বিদ্বেষ ভাব-সূচক দৃষ্টি হেনে ছেলেকে ভৎর্সনা করতে করতে বাড়ীতে ঢুকল। সে ভৎর্সনা বাক্য এত জোরে আওড়াল যেন আমি শুনতে পাই। ছেলেকে বলছিল, 'ধিক তোকে, তোর এ অশিষ্ট ব্যবহার বাইরের লোক পর্য্যন্ত দেখতে পেল, তোর লজ্জিত হওয়া উচিত।'

সব কিছুই সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলাম—একটা সামান্য খুটিনাটিও আমার মনোযোগ এড়াতে পারে নি। প্রত্যেকটা বিষয়ই বিশেষ করে ভেবে চিন্তে তার সম্বন্ধে নিজের অভিমত দাঁড় করিয়েচি। সুতরাং আমার মস্তিষ্ক বিকৃতির কোনই লক্ষণ খুঁজে পেলাম না।

নিজেই নিজেকে তখন বললাম, 'শুনচ, নিজের মস্তিষ্ক-বিকৃতি নিয়ে নিজেকে এই সুদীর্ঘকাল ধরে কতই না উদ্বিগ্ন করে তুলেচ। তোমার এই ফাঁকি আর চলবে না। প্রত্যেকটি বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবেচনা করতে চাওয়াটা কি উন্মত্ততার লক্ষণ? নিজেই আবার জবাব দিলাম, বাধ্য হয়েই তোমার ব্যবহারকে বিদ্রূপ না করে উপায় নেই। এর বিচারের ভার যদি আমার উপর ন্যাস্ত হয় ত বলতে পারি যে, এতে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করবারও একটা দিক আছে। কেন না সামান্য বিষয়ে ঠেকতে হয়, এ ত আকছার

প্রত্যেকের জীবনেই দেখতে পাওয়া যায়। এতে আর এমন কি বিশেষত্ব আছে—এ একেবারে নিছক আকস্মিক ব্যাপার। ও সামান্য হিসেবের ব্যাপারে অবশ্য তোমায় আমি মোটেই দোষ দিচ্চি নে। ও নেহাৎ সামান্য পাঁচছটাক পনির ত সাধারণ একটা ভিখিরীও কিনে থাকে, তার মধ্যে আর বাহাদুরী কি আছে। হাঃ হাঃ!—রসুন ও মরিচ দিয়ে পনির খেতে কি আরাম! আবার সত্যি বলতে গেলে, এই পনির থেকেই কত রকম পোকা জন্মায়। ... ও সেই নগণ্য পনিরের কথা বলতে গেলে বলা যায় যে, দুনিয়ার সবচাইতে চালাক লোকের মাথাও তাতে গুলিয়ে যেতে পারে; পনিরের সে দুর্গন্ধেই প্রাণ কণ্ঠাগত হয়ে যায়; ... আর আমি সেই পনির নিয়েই সব চাইতে বড় তামাসা করেচি। ... হাঁ, হিসেবে আমার যোগ্যতা আছে কি নেই তার প্রমাণ পেতে পার সত্যিকারের খাবারযোগ্য জিনিষের হিসেব গুণতে দাও, এখনই ঠিক করে দিচ্চি। তা নয়,—পনির—ছোঃ! হ্যাঁ, মাখনের হিসাব বলতে বল, পাঁচ ছটাক কেন, পাঁচ কাঁচ্চার দামও বলতে আমার আটকাবে না। এ যে সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষ।

নিজের এই উৎকট খেয়ালে নিজেই হেসে উঠলাম এবং এ যে এক মজার আমোদ তা বুঝতে পারলাম। একটু পরেই ও-ব্যাপারটা আমার মন থেকে একেবারে নিঃশেষে চলে গেল। অবস্থা তখন আমার বেশ ভাল—বলতে কি খুব ভাল অবস্থাই; ভগবানের

অনুগ্রহে মাথা বেশ পরিষ্কার, কোন গোল নেই অভাব নেই সেখানে। মেঝেতে পাইচারী করতে করতে আমার আহ্লাদ ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল এবং আপন মনেই নিজের সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপে মত্ত হয়ে পড়লাম। জোরে জোরে হেসে উঠলাম এবং তাতে ভারী আনন্দ বোধ হল। তা ছাড়া আমার মন ও মস্তিষ্ক-টাকে কাজের উপযোগী করে তুলবার জন্য এ রকম এক-আধঘণ্টা একটু আনন্দ করা দরকার, যে সময়টা আর কোন চিন্তা-ভাবনাই থাকবে না কোন দিক থেকে।

খানিক বাদেই লেখাটা নিয়ে বসে গেলাম; তর্ তর্ করে লেখা এগুতে লাগল, এত দিন যা হয় নি, আজ তাই হল। লেখা অবশ্য খুব দ্রুত হয় নি, তবে আমার মনে হল যে, যতটুকু লিখেচি তা প্রথম শ্রেণীর রচনা। ঘণ্টাখানেক অবলীলাক্রমে লিখে গেলাম একটুও ক্লান্তি এল না।

লেখাটায় এই কথাই আমি বলতে চেয়েছিলাম যে, একটা বইয়ের দোকানে আগুন লেগেচে। অতিদ্রুত কলম চলেচে। বিষয়টা এমন গুরুতর যে, আমার মনে হল এ পর্য্যন্ত যা কিছু লিখেচি, এর তুলনায় তা কিছুই নয়। এই বিষয়টিতে আমার চিন্তাশক্তিকে গভীরভাবে নিয়োগ করলাম। দোকানের বইগুলিতেই আগুন ধরে নি, ধরেচে মগজে, মানুষের মগজ সব পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্চে। এই কথাটাই জোরের সঙ্গে আমি বলতে চেয়ে-

ছিলাম। হঠাৎ ঠাস্ করে একটা শব্দ করে আমার ঘরের দোর খুলে গেল। বাড়ীউলি হন্তদন্ত হয়ে ধা করে ঘরে ঢুকল। সোজা এল, মুহূর্তের জন্য একবার থামলও না।

ভাঙ্গাগলায় একবার একটু চেঁচিয়ে ওঠলাম। আমার তখন এমন অবস্থা যেন আমায় কেউ একটা প্রচণ্ড ঘুষি মেরেচে।

ও বললে, 'কি ? কিছু বলছিলে কি ? বলছিলাম কি—একজন লোক এখানে এসেচে এবং এই ঘরটায় তাকে থাকতে দেব ঠিক করেচি। আজ তোমায় আমাদের সঙ্গে নীচেয় শুতে হবে। হাঁ; সেখানে বিছানাও একটা পাবে।' জবাব দেবার আগেই ও আর কোন রকম শিষ্টাচার না দেখিয়েই টেবিলের উপরকার ছড়ান কাগজপত্রগুলি আপনার মনে গোছাতে লেগে গেল। বলা বাহুল্য, তাতে করে কাগজ-পত্র সবই তাদের শৃঙ্খলা হারাল।

আমার মনের সে অনুকূল অবস্থাটি একেবারে উবে গেল। একটা সুবিপুল হতাশা ও ক্রোধে অভিভূত হয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলাম। ও আপনার মনে জিনিষ-পত্র সব গুছিয়ে ফেলল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম, একটা কথাও বললাম না। গোছান কাগজ-পত্রের পুলিন্দাটা আমার হাতে ছুঁড়ে দিল।

আমার তখন আর কিছু করবার ছিল না। ঘর ছেড়ে আসতে বাধ্য হলাম। এমনি করে আমার সেই শুভ প্রেরণাটি একদম বিনষ্ট হয়ে গেল। সিঁড়ি-পথেই আগন্তুকের সঙ্গে দেখা

হয়ে গেল; যুবক, হাতে নঙ্গরের উল্কি-পরা। সঙ্গে তার জাহাজ-ঘাটের একটা কুলি, তার কাঁধে প্রকাণ্ড একটা সিন্দুক। সে যে খালাসী তা দেখলেই বোঝা যায়। রাত্রিবাসের জন্য এসেচে। কাজেই ঘরখানা সে বেশী দিনের জন্যে অধিকার করে থাকবে না হয় ত। হয় ত কালই সে চলে যাবে, তখনই আমার ঘরে যাবার সৌভাগ্য হবে এবং তখন আবার অনুকূল প্রেরণা পাওয়া অসম্ভব হবে না। আর মিনিট পাঁচেকের জন্যে লিখবার প্রেরণা পেলেই লেখাটা আমার শেষ করতে পারব। কাজেই, অদৃষ্টের আনুগত্য স্বীকার করা ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না।

ইতিপূর্ব্বে বাড়ীউলির ঘরে আর কখনো ঢুকি নি। এই একটি মাত্র ঘরেই বাড়ীউলি, তার বাপ, তার স্বামী, চারটি ছেলে-মেয়ে দিনরাত্তির বসবাস করে। দাসীটা শোয়,—রান্না ঘরে। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে দরজায় ধাক্কা দিলাম। কেউ সাড়া দিল না, তবে ভিতরে লোকের গলার স্বর শুনতে পেলাম।

বাড়ীউলির স্বামী আমায় দেখে একটি কথাও বললে না, নমস্কার করলাম, প্রতি নমস্কারও জানাল না, একবার মাত্র অবজ্ঞাভরে আমার দিকে তাকাল—দেখে মনে হল যেন আমার সঙ্গে তার কোন চেনা নেই। তা ছাড়া, সে তখন একজনের সঙ্গে বসে তাস খেলায় মত্ত ছিল, লোকটাকে জাহাজঘাটে আমি

দেখেচি, ও কুলি ; সে অঞ্চলে ওর ডাক-নাম 'কাচের টুকরো'। বিছানায় একটি শিশু আবোল-তাবোল বকছিল, এক পাশে এক বৃদ্ধ, বাড়ীউলির বাপই হয় ত, বুকে হাত চেপে ঝুঁকে পড়েছিল, দেখেই মনে হয় যে, তার বুকে যেন একটা ভয়ানক ব্যথা। মাথার চুল তার প্রায় সবই পেকে গেছে এবং এমনি ভাবে গুড়িসুড়ি মেরে বসেছিল যে, দেখলেই মনে হয় যেন একটা সাপ তার লিক্‌লিকে ফণা বাড়িয়ে শিকারের অপেক্ষা করচে।

লোকটাকে বললাম, 'রাত্তিরটার মত এখানেই আজ থাকতে হবে, উপর থেকে নেমে আসতে হল।'

'আমার স্ত্রী কি তাই নির্দ্দেশ করে দিয়েছেন?' সে বলল।

'হাঁ। আমি যে ঘরে থাকতাম সে ঘরে একজন নতুন লোক এসেচে।'

জবাবে লোকটা আর কিছুই বললে না এবং হাতের তাস ভাঁজাতে শুরু করে দিল। লোকটা দিনের পর দিন ওই একই জায়গায় বসে তাস খেলে। বাড়ীতে যখন যে উপস্থিত থাকে সে-ই তখনকার মত তার খেলার সাথী হয়। ওর এ খেলার আর কোন সার্থকতাই ছিল না—নিছক সময় নষ্ট করা মাত্র। ও নিজে সারা দিনরাত কোন কাজই করে না, কেবল তাস খেলে। স্ত্রী কিন্তু সারাদিন উপর-নীচ করে সর্ব্বক্ষণই দারুণ ব্যস্ত থাকে। সব ব্যাপারের শৃঙ্খলা করা ও খদ্দের ডাকা ইত্যাদি কাজে

সর্ব্বক্ষণই সে অতিমাত্রায় ব্যস্ত। রেল-ষ্টেশনের ও জাহাজ ঘাটার কুলিদের সঙ্গে তার বন্দোবস্ত আছে। প্রত্যেকটি নতুন লোক আনার জন্যে কুলি কেবল রাত্রি-বাসের স্থানই যে পায়, তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে কিছু দস্তুরীও পেয়ে থাকে। এবার নতুন আগন্তুক নিয়ে 'কাচের টুক্‌রো' এসে উপস্থিত হয়েচে।

দুটি ছোট মেয়ে এসে ঘরে ঢুকল, এদের উভয়ের মুখই ইতর লোকের ছেলেপেলেদের মত বিশীর্ণ, মেছেতা পড়া; জামা-কাপড় ভারী নোংরা ও ছেঁড়া। খানিক বাদে বাড়ীউলি স্বয়ং এসে ঘরে ঢুকল। রাত্রিটার মত কোথায় শুব জানতে চাইলাম। ও বললে যে, এখানেই আর সকলকার সঙ্গে শুতে পারি, নয় ত পাশের ঘরে সোফার উপরও শুতে পারি—দুজায়গার যেখানে আমার খুশী। ঘরের জিনিষ-পত্র গুছোতে গুছোতে আমার দিকে না তাকিয়েই ও জবাব দিল।

ওর জবাবে আমার উৎসাহ একেবারে দমে গেল। এক রাত্তিরের জন্যে নিজের ঘর আর একজনকে দিয়ে আমি যে অখুশী নই এ ভাবটা দেখানর জন্যে দরজার এক পাশে জড়সড় হয়ে দাঁড়ালাম, যেন অনেকখানি জায়গার আমার দরকার নেই। না চটে এই উদ্দেশ্যে প্রসন্ন দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালাম, কেননা একেই ত ও আমার উপর সন্তুষ্ট ছিল না, তার উপর সাংসারিক কাজে ভারী ব্যস্ত হয়েই পড়েচে দেখেচি।

বললাম, 'বেশ তাই হবে। আর—একটা রাত্তির ত, এক রকমে কাটিয়ে দিলেই চলবে 'খন!'—বলেই রসনা সংযত করলাম।

ও তখনো ঘরময় তাড়াহুড়ো করে বেড়াচ্ছিল। বলল, 'তা বলে বিনি পয়সায় দুনিয়াশুদ্ধ লোককে খাওয়া থাকা জোগাতে আমি পারব না, আগেও বলেচি, এখনো সোজা কথা বলে দিচ্চি। বুঝলে বাপু?'

জবাবে বললাম, 'তা ত নিশ্চয়। তবে এই কয়টা দিন সবুর কর, লেখাটা শেষ হলেই তোমার পাওনা পাই-পয়সা পর্য্যন্ত মিটিয়ে দেবো। এমন কি, খুশী হয়েই তোমায় দুটো টাকা বেশী ধরে দিব। বুঝলে?'

যতদূর বোঝা গেল, তাতে মনে হল যে, আমার লেখাটা সম্বন্ধে ওর কিছু মাত্র আস্থা নেই। তা হোক, তা বলে এ সময় অত মান অহঙ্কার দেখালে চলবে না, সামান্য এই কারণেই ত আর এ বাড়ী ছেড়ে যেতে পারি নে। চলে গেলে আমার যে কি হবে তা বেশই জানতাম।

*　　　*　　　*

দিন কয়েক কেটে গেছে। এখনো আমি বাড়ীউলির ঘরেই

থাকি, কেননা পাশের ঘরে ভারী ঠাণ্ডা এবং আগুন রাখার মত কোন ব্যবস্থাই নেই। ঘরের মেঝেতেই রাত্তিরে ঘুমাই।

সেই আগন্তুক খালাসী তখনো আমার ঘরেই বাস করছিল, এবং শীঘ্র তার যাবার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছিল না। দুপুরে বাড়ীউলি এসে জানাল যে, আগন্তুক তাকে ইতিমধ্যেই একমাসের ভাড়ার টাকা আগাম দিয়েচে। ও নাকি খালাসীর কাজের পরীক্ষা দিবার জন্য এসেচে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনলাম। বুঝতে পারলাম যে, ও-ঘরে থাকা আর আমার অদৃষ্টে নেই।

পাশের ঘরখানায় গিয়ে বসে পড়লাম। লেখবার মত যোগ্যতা ও মানসিক অবস্থা যদি থাকতই ত এই ঘরে বসেই লেখাটা শেষ করতে পারতাম, কেননা এখানে ত কোন রকম গোলমালই নেই। সেই রূপকটা শেষ করবার মত তাগিদ আর আমার নেই। কেননা তখন আর একটা ভারী চমৎকার নতুন ভাব আমার মাথায় এসেচে। একটি একাঙ্ক নাটিকা—"ক্রুশের প্রতীক' রচনা করব ঠিক করেচি। মধ্যযুগের কাহিনী থেকে বিষয়-বস্তু নেওয়া হবে। প্রধান প্রধান পাত্র-পাত্রীর সম্বন্ধে সব কিছুই ভেবেচিন্তে ঠিক করেচি। এক প্রচণ্ড স্বর্গবিদ্বেষী বারাঙ্গনা বিদ্বেষবশে মন্দিরের ভিতর পাপানুষ্ঠান করে। বেদীর পাদদেশেই দেবতার সম্মুখে সে দুষ্কার্য্য করে, তখন বেদীর পবিত্র বস্ত্র-খণ্ড তার মাথায়

ছিল। এক তীব্র মধুর বিদ্বেষ তাকে এ কার্য্যে প্ররোচিত করে। এই নতুন ভাবটি সম্বন্ধে যতই চিন্তা করতে লাগলাম ততই এই ভাবটি আমায় একেবারে পেয়ে বসল। অবশেষে সেই বারাঙ্গনা মূর্ত্তি ধরে আমার সুমুখে এসে দাঁড়াল, যেমনটি আমি চেয়েছিলাম ঠিক তেমনটি। তার আকৃতি ভারী কুৎসিত, দেখলেই ঘৃণা জন্মে, দীর্ঘ-কায়া, কৃশতনু, কৃষ্ণবর্ণা ; তার সে দীর্ঘ বাহু দুটি জামা-কাপড়ের মধ্যে দিয়েও প্রতিপাদক্ষেপে স্পষ্ট হয়ে দেখা যায়। তার চোখ দুটো অস্বাভাবিক বৃহৎ, কিন্তু তাতে বড় একটা বিশেষত্ব কিছুই নেই, তবে সে দৃষ্টি সহ্য করা কিছু কষ্টকর। তার যে বিশেষত্ব আমায় বিশেষ করে আকৃষ্ট করেচে সে হচ্চে তার অত্যদ্ভুত নির্লজ্জতা এবং তার চোখ মুখের সুবিপুল দুষ্কৃতির লক্ষণ! আমার নাটকে একে চিত্রিত করতে ব্যস্ত ছিলাম—এরূপ অত্যদ্ভুত জীবের চিত্র আঁকতে গিয়ে আমার মস্তিষ্ক একেবারে ফুলে কেঁপে উঠল—সুদীর্ঘ দু'ঘণ্টা কাল একযোগে কলম চালিয়ে গেলাম। একটুও থামি নি। প্রায় বারো-তেরো পৃষ্ঠা লিখলাম, এক এক সময়ে লিখতে ভারী কষ্ট হয়েচে, একবার একটা গোটা পৃষ্ঠাই ছিঁড়ে ফেলেচি। শীতে ও শ্রান্তিতে অবশ হয়ে গেলাম। তখন নিরুপায় হয়ে লেখা ছেড়ে উঠে বাইরে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। ঘরের মধ্যে ছেলেপেলের চীৎকারে কান্নায় শেষের আধঘণ্টা ভারী বিরক্ত হয়ে পড়লাম, তখন বাধ্য হয়েই লেখা আর

বুভুক্ষা

কিছুতেই এগুল না। কাজেই রাস্তায় রাস্তায় পাইচারী করতে করতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নাটকের বিষয়ই ভাবতে লাগলাম। সেদিন সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরবার আগে এই ঘটনাটা ঘটে :

কার্ল জোহান ষ্ট্রীট ছাড়িয়ে রেলওয়ে স্কোয়ারের কাছাকাছি একটা জুতার কারখানার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এইখানটাতেই কেন দাঁড়িয়ে ছিলাম ভগবান জানেন। সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জানলা দিয়ে ভিতরের দিকে চাইলাম, কিন্তু আমার যতদূর মনে পড়ে, জুতার কথা আমার মনেও ছিল না; আমার মন তখন দুনিয়ার আর এক প্রান্তে বিচরণ করছিল। আমার পিছন দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে লোকজন কথাবার্ত্তা কইতে কইতে যাচ্ছিল কিন্তু তাদের একটি কথাও আমার কানে পৌঁছয় নি, হঠাৎ কে একজন আমায় সম্ভাষণ করে উঠল :

'এই যে, নমস্কার!'

আরে এ যে 'মিশি'! খানিকক্ষণ তার দিকে চেয়ে তবে তাকে চিনতে পারলাম।

'ওহে, কেমন আছ, ভাল ত?' ও জানতে চাইল।

'ভালই ... আমি ত সব সময়ই ভাল থাকি।'

'ভাল কথা, তুমি এখনো ক্রাইষ্টির ওখানেই বেরুচ্চ ত?' ও শুধোলে।

'ক্রাইষ্টি? কোন্ ক্রাইষ্টি?'

'মনে পড়ে একবার যেন বলেছিলে যে তুমি ক্রাইষ্টির ওখানে হিসাব-মুহুরীর কাজ কর, কেমন নয় কি ?'

'হাঁ বলেছিলাম বটে। তবে সে কাজ ছেড়ে দিয়েচি। তার ওখানে কারুর টিঁকে থাকা একেবারে অসম্ভব। সে-ই আমায় ছাড়িয়ে দিলে।'

'কেন, কি হয়েছিল ?'

'একদিন একটা হিসেবে একটু ভুল হয়েছিল এবং তাই—'

'মিথ্যে হিসেব ?'

মিথ্যে হিসেব! মিশি আজ আমায় মুখের উপর এ কথা বলতে সাহস পেল! তার প্রশ্নে একটা উৎকট কৌতূহলের ভাব প্রকাশ পেল, যেন খবরটা শুনবার জন্যে তার আগ্রহের আর সীমা নেই। তার পানে তাকালাম, ভারী অপমান বোধ হল। তার প্রশ্নের কোন জবাব দিলাম না।

'তার জন্যে দুঃখ কি, ভুল কার না হয়!' আমাকে সান্ত্বনা দেবার ছলেই যেন ও ও-কথা বললে। ওর বিশ্বাস, ইচ্ছে করেই আমি হিসেবে ভুল করেচি।

বললাম, 'তাই ত, ভুল হয় মানুষেরই, আর আমি যখন মানুষ তখন আমার ভুল হবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি! তুমি কি সত্যিই মনে কর যে, আমি ইচ্ছে করেই ও রকম একটা হীন কাজের প্রশ্রয় দিয়েচি ? এ্যাঃ!'

'তা হবে কিন্তু তোমায় যে ও-কথা বলতে আমি স্পষ্ট শুনেচি।'

'না ; আমি তা কখনো বলি নি। আমি বলেচি যে, হিসেবে একটা অতি নগণ্য ভুল রয়ে গেছল। অপরাধের মধ্যে হয়েছিল এই যে, একদিন হিসেবে একটা ভুল তারিখ বসিয়ে ছিলাম। না, ঈশ্বরের অনুগ্রহে এখনো ভাল-মন্দ বিবেচনা-শক্তি হারাই নি। এখনো সম্মান বজায় রেখেই চলেচি, নইলে আজ আমার কি দশাই না হত। একমাত্র আত্মসম্মানজ্ঞানই আমায় এখনো রক্ষা করে আসচে, আর সেই আত্মসম্মানজ্ঞানও বেশ শক্তিমান, তার জোরেই এখনো টিঁকে আছি।'

সহসা পিছন ফিরে আমি রাস্তার দিকে তাকালাম। একটা লোকের সঙ্গে একটি স্ত্রীলোক লাল পোষাক পরে আমাদের দিকেই আসছিল, আমার দৃষ্টি সেই লাল পোষাকের উপরই নিবদ্ধ হল। মিশির সঙ্গে আমার আলাপ না হলে, তার এ হীন সন্দেহ আমায় এতটা আঘাত দিতে পারত না এবং আমিও এতটা উত্যক্ত হতাম না। আর তাহলে এই লাল পোষাক-পরা স্ত্রীলোকটি আমার নজর এড়িয়েই চলে যেত। কিন্তু, আসলে ওর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক ? এ পোষাক-পরা স্ত্রীলোকটি যদি কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েই হয় তাতেই বা আমার কি এসে যায় ? মিশি তখনো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলে তার ভুল শোধরাতে ব্যস্ত

ছিল। তখন কিন্তু তার কোন কথাই আমার কানে আসছিল না, কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের দিক-পানে-আসা-লাল পোষাকটির দিকে হা করে তাকিয়ে ছিলাম। প্রাণে একটা বিপুল পুলকের শিহরণ বয়ে গেল। ঠোঁট না নেড়ে আপনার মনে বলে উঠলাম :

'ল্যাজালি !'

ইতিমধ্যে মিশিও পিছন ফিরে সেই লাল পোষাক-পরা মহিলা ও তার সঙ্গের পুরুষটিকে দেখতে পেল এবং সম্ভ্রমের সঙ্গে টুপি উঁচিয়ে তাদের দিকে চেয়ে রইল। আমি কিন্তু টুপি উঠালাম না। হয় ত এ আমার খেয়াল। লাল পোষাকের দল কার্ল জোহান দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মিশি শুধোল, 'লোকটিকে চেন ?'

'কেন উনি ডিউক, ওঁকে কি তুমি দেখ নি কখনো ? সেই নামকাওয়াস্তে 'ডিউক'। মহিলাটিকে তুমি চেন ?'

'হাঁ, একরকম চিনি বই কি। তুমি কি ওকে চিনতে না ?'

'না।'

'আমার যেন মনে হল, গভীর সম্ভ্রমের সঙ্গে ওকে তুমি নমস্কার করলে।'

'তাই নাকি ?'

'হয় ত তুমি নমস্কার করো নি !' মিশি বললে। 'অথচ

স্ত্রীলোকটি কিন্তু সারাক্ষণ কেবল তোমার দিকেই চেয়ে ছিল। ভারী আশ্চর্য্য ত !'

বললাম, 'কতদিন থেকে ওকে চেন তুমি ?'

মিশি ওকে আগে চিনত না। বেশী দিন হয় নি, শরৎ কালের এক সন্ধ্যা বেলা ওদের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে; তারা তিনটি আমুদে প্রাণী গ্র্যাণ্ড থিয়েটার থেকে বেরিয়ে আসছিল। এই স্ত্রীলোকটির সঙ্গে ওদের তখন দেখা হয় এবং তারা ওর সঙ্গে আলাপ করে। প্রথমটা ও ভারী বিরক্ত হয়ে ওঠে, তখন ওদের দলের একজন ওকে বাড়ী পৌঁছে দিতে চায়, কেননা সেটাই নাকি সভ্যতার লক্ষণ। মিশির সেই বন্ধু দুনিয়ার কাউকে ভয় করে না, আগুনকেও না, জলকেও না। সে বললে, কেবল ওর সঙ্গে সঙ্গে দোর পর্য্যন্ত গিয়ে ওকে বাড়ী পৌঁছে দিবে, ওর কোন অনিষ্টই করবে না, ওকে পৌঁছে না দিলে রাত্তিরে তার ঘুম হবে না। হেঁটে যেতে যেতে সে ক্রমাগত বকে যেতে লাগল এবং একজন সম্ভ্রান্ত ফটোগ্রাফার বলে নিজের পরিচয় দিল। মেয়েটির বিরূপ মনোভাব সত্ত্বেও লোকটির মন কিছুতেই দমল না, তখন অগত্যা বাধ্য হয়েই মেয়েটি হেসে উঠল। শেষ পর্য্যন্ত তাকে সঙ্গে যেতে সম্মতি দিল।

আমি মিশিকে শুধোলাম, 'সত্যি ও সঙ্গে গেল? তারপর কি হল ?'

বুভুক্ষা

ও কি জবাব দেয় শুনবার জন্যে দম বন্ধ করে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

'তারপর কি হল?—থাক্, সে কথা শুনে আর কাজ নেই। ভদ্র মহিলা সম্বন্ধে অতটা কৌতূহল সঙ্গত নয়।'

মিশি আর আমি উভয়েই নীরব হলাম।

খানিক পরে ও গম্ভীর ভাবে বলে উঠল, 'দূর হোক ছাই! ওই কি সেই 'ডিউক'?—তা হবে। আচ্ছা, ও যদি এই ব্যক্তির সংস্পর্শেই এসে গিয়ে থাকে, তাহলে ওর হয়ে কোন কথাই আর বলতে চাই নে।'

আমি তবু চুপ করে রইলাম, হাঁ, 'ডিউক' ওর সাথে যাবে বৈকি, তাতে আর আশ্চর্য্য হবার কি আছে? ওর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক? ওর কাছে থেকে ত আমি চির-বিদায়ই নিয়েচি। এখন আর ওর ভাল-মন্দ, ছল-চাতুরি কিছুতেই আমায় পাবে না। ওকে জঘন্য রঙে চিত্রিত করে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে লাগলাম, ওর সম্বন্ধে হীন ধারণা পোষণ করতে যেন একটা পরম তৃপ্তি বোধ করছিলাম। এ কথা মনে হতেই মনটা বিষিয়ে উঠল যে, সত্যিই কি টুপি তুলেছিলাম? এ রকম লোককে দেখে কেন টুপি তুলতে গেলাম! ওর সম্বন্ধে ত আর আমার এতটুকু মোহও নেই, আমার চোখে ও এখন পতিত। কী মলিনই না আমি ওকে দেখেছিলাম! ও যে আমার দিকেই তাকিয়ে ছিল সে

বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমি কিন্তু এতে কিছুমাত্র আশ্চর্য্য হই নি; ওর মনে একটা অনুশোচনা এসেছিল হয় ত। তাই বলেই নির্ব্বোধের মত ওকে সালাম করে নিজেকে খাটো করবার কোনই সুসঙ্গত হেতু ছিল না, বিশেষত বর্ত্তমানে যখন ওর এতদূর জঘন্য অধঃপতন হয়েচে। ওর কাছে ডিউকের আজ খাতিরের সীমা নেই; 'ডিউক' সুখী হোক! এমন দিন নিশ্চয়ই আসবে যেদিন ওর দিকে মুখ ফিরিয়ে গর্ব্ব অনুভব করতে পারব। ঈশ্বর করুন, ও সোজা আমার দিকে সাগ্রহে তাকালেও যেন সেদিন আমি মুখ ফিরাতে পারি। ওর যেন এমনি আরো সুন্দর দামী পোষাক পরবার সুযোগ হয়। এটা সহজেই হতে পারবে। হাঃ, হাঃ! সে কী বিজয়উল্লাস! . . . নিজের শক্তির যদি ঠিক খবর জেনে থাকি, তাহলে আজ রাত্তিরের মধ্যেই নাটিকাটি শেষ করতে পারব এবং সপ্তাহ শেষ হতে না হতেই এই নারীকে পায়ের তলে এনে ফেলতে পারব। রূপসী! হাঃ, হাঃ, সেদিন ওর রূপের গুমর কোথায় থাকবে দেখব। . . .

সংক্ষেপে আওড়ালাম, 'তাহলে এখন আসি।'

মিশি কিন্তু আমার পথরোধ করে শুধোলে, 'আচ্ছা, এখন তুমি সারাদিন কি কর?'

'কি করি?—লিখি,—প্রায়ই। তা ছাড়া আর কি করব?

আর লেখা থেকেই ত এখন পেট চলে। একটা বড়দরের নাটিকা লিখতে ব্যস্ত আছি—‘ক্রুশের প্রতীক’। মধ্যযুগের কাহিনী থেকে বিষয়-নির্ব্বাচন করেছি।’

মিশি গম্ভীর হয়ে বলে উঠল, ‘তাই নাকি! বেশ বেশ, যদি লেখাটা শেষ করতে পার, তাহলে যেন . . .’

‘তার জন্যে ভাবনার কিছু নেই,’ জবাবে বললাম। ‘এক সপ্তাহের মধ্যেই তোমরা আমার সম্বন্ধে আরো অনেক কিছু শুনতে পাবে।’

এই বলে চলে এলাম।

বাড়ী পৌঁছে বাড়ীউলির কাছে একটা আলো চাইলাম। আলোটা তখন আমার সব চাইতে বেশী দরকার। আজ আর ঘুমোবও না, মাথার মধ্যে ভাব টগবগ করে ফুটচে, সুতরাং বিশ্বাস ছিল ভোর হওয়ার আগেই নাটিকার সবচাইতে ভাল অংশটা শেষ করতে পারব। বিনীত ভাবেই বাড়ীউলিকে আমার প্রার্থনা জানালাম। কেননা বসবার ঘরে পুনঃ প্রবেশের দরুণ আমার দিকে ওর বাঁকা চাউনি লক্ষ্য করেছিলাম! জানালাম, গোটাকয়েক দৃশ্য লিখতে পারলেই লেখাটা শেষ করতে পারি, এবং তাহলেই কোন নাট্য-মন্দিরে তার অভিনয়ের ব্যবস্থা করা অগোণেই হতে পারে, যদি এখন ও আমার এই মহাউপকারটি করে . . .

কিন্তু বাড়ীউলির অতিরিক্ত আলো ছিল না। খানিকক্ষণ কি

বুভুক্ষা

ভাবলে কিন্তু কোথাও যে তার একটা আলো আছে তা মনে করতে পারল না। বললে যে, বারটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করলে রান্না-ঘরের আলোটা পাওয়া যেতে পারে। তার চেয়ে আমি কেন নিজে একটা ক্যাণ্ডল কিনে আনি না?

জিহ্বা সংযত করলাম। ট্যাঁকে একটা আধলাও নেই, ক্যাণ্ডল কিনব কি দিয়ে! অথচ, আমার বিশ্বাস, এ খবর ওর বেশ জানা ছিল। শেষ পর্য্যন্ত আমায় নিরাশই হতে হল! চাকরাণীটা ঘরের ভিতর আমাদের সঙ্গেই বসে ছিল—শুধু বসেই ছিল এবং রান্না-ঘরে তখন তার কোনই কাজই ছিল না, কাজেই আলোটাও তখন নেবানোই ছিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই কথাটাই ভাবলাম কিন্তু কিছু বললাম না। সহসা চাকরাণীটা আমায় বললে, 'আমি যেন তোমায় হোটেল থেকে বেরুতে দেখলাম, নেমন্তন্ন ছিল বুঝি?' বলেই ও নিজের রসিকতায় নিজেই চেঁচিয়ে হেসে উঠল।

ইতিমধ্যে কিছু লিখবার জন্যে কাগজপত্র নিয়ে সেখানেই বসে গেলাম। হাঁটুর উপর কাগজগুলি নিয়ে একান্ত মনোযোগের সঙ্গে অবিচলিত ভাবে মেঝের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে চেয়ে রইলাম। সে অখণ্ড মনোযোগ কিন্তু এতটুকুও কাজে এল না, লেখা কিছুতেই এগুলো না। বাড়ীউলির ছোট্ট মেয়ে ছুটো ঘরে ঢুকেই লোমহীন রোগাটে কিম্ভূত একটা বিড়াল নিয়ে হৈ চৈ বাধিয়ে দিল। বেচারা অবোলা জীব পড়ে পড়ে মার খাচ্চে।

বাড়ীওলা দু'তিন জনকে নিয়ে তাস খেলচে। গৃহিনী কার্য্যান্তরে অতিব্যস্ত হয়ে এ-ঘর সে-ঘর করচে। খানিক বাদে ঘরে এসে ছেঁড়া জামা সেলাই করতে আরম্ভ করে দিল। ছেলেদের হৈচৈ-এ আমার লেখা যে একটুকুও এগুচ্চে না, ও তা বেশ বুঝতে পারছিল কিন্তু তা বলে সে সম্বন্ধে এতটুকুও বিবেচনা করাও কর্ত্তব্য মনে করল না। বরং আমি হোটেল থেকে খেয়ে এলাম কিনা চাকরাণীটা যখন ব্যঙ্গের স্বরে জিজ্ঞাসা করল, ও তখন একটু হাসল মাত্র। গোটা পরিবারটাই যেন আমার উপর বিরূপ হয়ে রয়েচে। যেন একটা নেহাৎ নগণ্য লোক, নিজের ঘর অন্যকে ছেড়ে দেওয়ার অসম্মানটুকুই যেন আমার প্রাপ্য,—এমন কি বিড়ালাক্ষি চাকরাণী ছুঁড়ীটাও আমায় ব্যঙ্গ করতে ছাড়ল না। চাকরাণীটা বল্লে যে, হোটেলেই যদি না খাব ত খাই কোথায়! কেননা ও আমায় কখনো গ্র্যাণ্ড হোটেল থেকে বেরুতে দেখে নি। স্পষ্টই বুঝতে পারলাম, ও আমার দুর্ভাগ্যের কথা সবই জানে এবং ও যে তা জানে এটা বুঝতে গিয়ে ও বেশ আমোদই বোধ করছিল।

অজ্ঞাতসারে কখন নাটকের বিষয় থেকে ওই সব ব্যাপারেই মনটা চাড়িয়ে গেল। মাথার মধ্যে একরকম অদ্ভুত শোঁ শোঁ শব্দ শুনতে পেলাম। তখন বাধ্য হয়েই লেখা ছেড়ে দিলাম। কাগজপত্র পকেটে রেখে উপরের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

বুভুক্ষা

চাকরাণীটা ঠিক আমার সুমুখেই বসেছিল। ওর দিকে তাকিয়ে দেখলাম,—ওর পিঠটা নেহাৎ সরু, কাঁধ দুটো বাঁকা, যেন এখনো পূর্ণ-পরিণতি লাভ করতে পায় নি। আমার পিছু লাগার কি কারণ থাকতে পারে ভেবে পেলাম না। যদি গ্র্যাণ্ড হোটেল থেকেই খেয়ে এসে থাকি ত তাতেই বা ওর কি? তাতে কি ওর কিছুমাত্র ক্ষতি হয়েচে? চেহারাটা একটু খারাপ দেখলে বা সিঁড়িতে হোচট্ খেতে দেখলেই ধৃষ্টতার হাসি হেসে ওঠে, হয় ত আমায় চলতে দেখে পিছন থেকে জামাটা ধরেই টানে। একদিন টানের চোটে জামাটাই খানিকটা ছিড়ে গেল। এই কালও ও আমার নাটকের গোটাকয়েক পরিত্যক্ত পৃষ্ঠা পাশের ঘর থেকে চুরী করে এনে এই ঘরে বসে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়েচে এবং এমন বিশ্রী করে পড়েচে যে, ঘরের সকলেই তাতে হেসেচে। কোন দিনই ত ওর অসম্মান করি নি! এমন কি ওকে কোন কাজ করতেও কখনো বলি নি। রোজই নিজের বিছানা নিজেই ও ঘরের মেঝেতে বিছিয়ে নিই, পাছে ও রাগ করে এই ভয়ে কখনো ওকে অনুরোধও করি নি। আমার মাথার চুল পড়ে, এ নিয়ে ব্যঙ্গ করতেও ত ও কসুর করে না। পূর্ব্বেই বলেচি, ইদানীং আমার মাথার চুল উঠে যাচ্ছিল। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে যে পাত্রটায় মাথা ধুই তাতে মাথার চুল ভাসে, চাকরাণীটার তা নিয়েও ঠাট্টাবিদ্রূপের বিরাম ছিল না। জুতা

বুভুক্ষা

জোড়াটা ভারী পুরোণো হয়েচে, তার উপর সেদিন রুটিওলার গাড়ীখানা পায়ের উপর দিয়ে অবাধে চলে গেছল, তার ফলে একপাটি একেবারে ছিঁড়েখুড়ে গেল। সেই ছেঁড়া জুতা সম্পর্কেও ওর ব্যঙ্গ অব্যাহত চলে। ও হয় ত ছেঁড়া জুতা জোড়াটার দিকে তাকিয়ে হেসে বলে ওঠে, 'ভগবান, তোমায় ও তোমার এ জুতা জোড়াকে আশীর্ব্বাদ করুন! দিন দিনই তোঁমার এ জুতা জোড়া যেমন প্রশস্ত হয়ে শ্রীযুক্ত হচ্চে তাতে এখন একটা আস্ত কুকুরও অনায়াসেই ওতে ঘুমুতে পারবে!'

ও হয় ত ঠিকই বলেচে, কিন্তু বর্ত্তমানে আমার যে অবস্থা তাতে এক জোড়া নতুন জুতা কেনা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব।

বসে বসে যখন এ সব ভাবছিলাম আর দাসীটার ধৃষ্টতায় আশ্চার্য্য হয়ে পড়ছিলাম, তখন বাচ্চা মেয়ে দুটো বাড়ীউলির বুড়ো বাপটিকে ভারী উত্যক্ত করে তুলেছিল। তার চার পাশে লাফ ঝাঁপ করে তারা বেশ আমোদ পাচ্ছিল। একটুকরো খড় এনে বুড়ার কানের মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছিল। খানিকক্ষণ মেয়ে দুটোর এই অসঙ্গত উৎপীড়ন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, কিন্তু তাদের বাধা দিলাম না। বেচারী পঙ্গু বৃদ্ধ আত্মরক্ষার জন্যে একটা আঙুলও নাড়তে পারছিল না। কেবল উগ্রদৃষ্টিতে উৎপীড়কযুগলের দিকে তাকিয়ে রইল। কানের মধ্যে খড়ের

টুকরো গুঁজে দিতেই বেচারী অসহ্য যন্ত্রণায় মাথা ঝাঁকানি দিয়ে উঠল। এ দৃশ্যে আমার মেজাজ চড়ে গেল, তাই সেদিক থেকে আর চোখ ফিরাতে পারছিলাম না। খেলায় মত্ত মেয়ে দুটোর বাপ এক একবার মাথা তুলে মেয়েদের এই দুর্ব্যবহার বেশ উপভোগ করল। শুধু তাই নয়, সঙ্গীদের দৃষ্টিও সেই দিকে আকৃষ্ট করল। বুড়ো বেচারী কেন নড়তে চড়তে পারচে না! বুড়োটা কেন মেয়ে দুটোকে ধাক্কা দিয়ে একপাশে সরিয়ে দিচ্চে না? আমার যেন অসহ্য বোধ হল, উঠে বিছানার সামনে এগিয়ে গেলাম।

বাড়ীওলা বলে উঠল, 'থাক্, থাক্, ওদের খেলতে দাও! উনি পঙ্গু।'

পাছে লোকটার বিরাগভাজন হলে রাত্তিরে আশ্রয়টুকু না দেয় তাহলে ত রাস্তায়ই থাকতে হবে, এই ভয়ে নীরবে পিছু হটে এসে নিজের জায়গায় বসে পড়লাম। ওদের পারিবারিক ব্যাপারে কথা কইতে গিয়ে আমার এ আশ্রয়টুকু ও রুটি-মাখনটুকু খোয়াই কেন? বুড়োটা ত আধ-মরা, আজ আছে ত কাল নেই, ওর জন্যে নির্ব্বোধের মত কাজ করা উচিত নয়। এই ভাবেই মনকে প্রবোধ দিয়ে চুপ করে থেকে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চেষ্টা পেলাম।

মেয়ে দুটো কিন্তু তবু বুড়োকে উৎপীড়ন করছিল; বুড়োটা কোন রকম বাধা দিতে পারচে না দেখে ওদের উৎসাহ ক্রমেই

বেড়ে যাচ্ছিল, ওরা বুড়োর নাক কান ও চোখ দুটো নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ল; বুড়ো কটমট করে ওদের দিকে এমনি ভাবে তাকাল যে, অসহায়ের নিষ্ফল ক্রোধ ছাড়া তা আর কিছুই নয়। তার সে অঙ্গভঙ্গি দেখে হাসি থামানো দায়। একটা কথাও বলতে বা হাত পর্য্যন্ত নাড়তে পারছিল না। হঠাৎ সে দেহের ঊর্দ্ধাংশ একটুখানি তুলে মেয়ে দুটোর মুখে গায়ে থুথু নিক্ষেপ করল, কিন্তু তাদের একজনের গায়েও তা লাগে নি, সে একটু দূরে ছিল। এ দেখে বাড়ীওলা হাতের তাস টেবিলে ছুঁড়ে ফেলে লাফ দিয়ে গিয়ে বিছানার সম্মুখে দাঁড়াল। রাগে তার চোখ মুখ লাল। সে চীৎকার করে বলে উঠল, 'বুড়ো শূয়ার কোথাকার, চুপ করে শুয়ে থাক্। ওদের গায়ে থুথু দিলি যে?'

আমি সেখানে বসে বসেই বলে উঠলাম, 'বেচারীকে ওরা কি বিরক্তই না করচে, ওকে তিষ্ঠিতে দিচ্চে না।'

ভয় হচ্ছিল, সোজাসুজি প্রতিবাদ করলে এক্ষুণি নিশ্চয় ও আমায় ঘর থেকে তাড়িয়ে দিবে, তাই কথাটায় তেমন জোর দিলাম না, কেবল সাধারণ ভাবে বললাম মাত্র। রাগে দুঃখে আমার সর্ব্বাঙ্গ রি-রি করে কাঁপছিল। বাড়ীওলা আমার দিকে ফিরে বললে, 'তাতে তোমার কি? এ সব ব্যাপারে তোমার কথা বলার কি দরকার? চুপ করে থাক, আর কখনো এ রকম মোড়লি করতে এসো না।'

ততক্ষণে বাড়ীউলির আওয়াজ কানে এল, চেঁচিয়ে গালাগালি দিয়ে সারা বাড়ীটা মাথায় তুলচে। ও বলছিল, 'মরুক গে, তোমরা সকলেই কি পাগল হলে নাকি!' তার পর আমায় আর সেই হতভাগ্য বুড়োকে লক্ষ্য করে বললে, 'এখানে যদি থাকতে চাও ত চুপ করেই থাকতে হবে। দুধকলা দিয়ে সাপ পুষতে পারব না আমি। চুপচাপ বসে থাক। এত নবাবী কেন? ট্যাঁকে যাদের একটা কাণাকড়ি নেই তাদের জুলুম সইব কেন? রাত দুপুরে এসে বাড়ীর লোকের সঙ্গে ঝগড়া করা! গোলমাল করতে চাও ত যাতে মুখ বন্ধ হয় তারই চেষ্টা আমায় করতে হবে। ভবিষ্যতে এ রকম অনধিকারচর্চ্চা আর কখনো সইব না বলে রাখচি, বুঝলে? পসন্দ না হয় এক্ষুণি তোমরা বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে পার। সুখের চাইতে সোয়াস্তি আমার ঢের ভাল।'

আমি টু-শব্দটি করলাম না। দরজার পাশেই বসে পড়লাম এবং ওদের হল্লা শুনতে লাগলাম। সকলে মিলে একসঙ্গে চেঁচাতে শুরু করে দিল—মেয়ে দুটো ও চাকরাণীটা গোলমালের মূল কারণ বর্ণনা করতে চেষ্টা করছিল। কেবল আমিই চুপ করে ছিলাম। বেশ জানতাম যে, চুপ করে থাকলে গোলমালটা আর বেশীদূর গড়াতে পারবে না, তা ছাড়া, আমারই বা বলবার কি ছিল? বিশেষত তখন শীতকাল, রাত্তির অনেক, এ অবস্থায় ওদের চটিয়ে রাস্তা দেখা ছাড়া আর উপায় ছিল না।

কাজেই চুপ করে থাকাই সঙ্গত মনে করলাম, মেজাজ দেখাবার সময় ত এটা নয়। বোকামী করলে চলবে না . . . কাজেই চুপ করে বসেই রইলাম, বাইরে এক পাও নড়লাম না। ওরা বলতে গেলে আমায় একরকম ঘরের বার করেই দিয়েছিল, তবু তাতে লজ্জিত বা ক্ষুণ্ণ হলাম না। হাঁ করে দেয়ালে টাঙানো যীশুর প্রতিমূর্ত্তির দিকে তাকিয়ে রইলাম। বাড়ীউলির কণ্ঠ ক্রমেই সপ্তমে চড়ছিল—কত গলগালিই না দিল, কিছুতেই আমার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙাতে পারল না।

বাড়ীওলার সঙ্গে যারা এতক্ষণ তাস খেলছিল তার একজন বলে উঠল, 'আমায় যদি চুপ করতে বল ত বলতে পারি আমার দ্বারা আর কখনো গোলমাল হবে না।' এই বলেই সে উঠে দাঁড়াল, সঙ্গে সঙ্গে আর আর সঙ্গীরাও উঠে পড়ল।

বাড়ীউলি তাদের লক্ষ্য করে বললে, 'না, না, তোমাদের কিছু বলচি নে, তোমরা বস। আমি যাকে লক্ষ্য করে বলচি, প্রয়োজন হলে এক্ষুণি তাকে রাস্তা দেখাতে জানি, এবং পারিও। কাকে লক্ষ্য করচি, এখুনিই দেখিয়ে দিচ্চি। . . .'

বলতে বলতে এক একবার থামছিল এবং কাকে বলচে তা স্পষ্ট করেই আমায় বুঝিয়ে দিল। নিজের মনেই বলে উঠলাম, 'চুপ, একটি কথাও নয়!' ও আমায় সোজা স্পষ্ট ভাষায় চলে যেতে বললে না। গালাগালের সঙ্গে যেন আমার

কোন সম্পর্ক নেই, এমনি নির্ব্বিকারভাবে সেগুলি হজম করলাম। এ অসময়ে মান অহঙ্কার দেখান সঙ্গত নয়। পরম ধৈর্য্যের সঙ্গে নীরবে সব লাঞ্ছনাই সহ্য করলাম।... দেয়ালে টাঙানো তৈলচিত্রে যীশুর মূর্ত্তির চুলগুলি অপূর্ব্ব সবুজ।... কতরকম উড়ো ভাবই না ছায়াচিত্রের মত একে একে আমার মনে দেখা দিল। সবুজ ঘাস থেকে চিন্তার সূত্র বাইবেলের একটা কথায় গিয়ে ঠেকল, তার পর এল মহা-বিচারের দিনের কথা, যে দিন সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে, তারপর একে একে লিসবন-এ ভূমিকম্প, ল্যাজালির ঘরের সেই সুন্দর কলমটি, সম্পাদকের মহানুভবতা... সব কিছুই একে একে মনে হল, আর ঠিক সেই সময়ই বাড়ীউলি আমায় ঘরের বার করে দিচ্ছিল।

বাড়ীউলি চেঁচিয়ে বলছিল, 'ইনি শুনতে পারছেন না যেন! ন্যাকামি দেখে গা জ্বালা করে। ওহে শুনচ, তোমায়ই বলচি মশায়, এ বাড়ী তোমায় ছাড়তে হবে—এখুনি। বুঝলে! যেখানে খুশী, এখনই চলে যাও—এখানে আর তোমার থাকা চলবে না।'

দরজার দিকে তাকালাম, চলে যাওয়ার মতলবে অবশ্য নয়—না, মোটেই সে মতলব আমার ছিল না। একটা দারুণ দুঃসাহসিক মতলব আমায় পেয়ে বসল,—দরজায় যদি চাবি থাকত ত তখুনই তা চাবিবন্ধ করে দিতাম,—ভিতরে থেকে

কেউ যেন না ঘর থেকে বাইরে বেরুতে পারে। সত্যি বলতে কি এই রাত্তিরে রাস্তায় বেরুতে আমার ভারী ভয় পাচ্ছিল।

কিন্তু দরজায় চাবি ছিল না।

হঠাৎ গিন্নির কণ্ঠের সঙ্গে বাড়ীওলার আওয়াজ পেলাম। যে ব্যক্তি এই কিছুক্ষণ আগে ভয় দেখাচ্ছিল, এখন সহসা তাকে আমার পক্ষ সমর্থন করতে দেখে বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। সে বলছিল, 'না, এই রাত্তির বেলা কাউকে বাইরে যেতে হবে না। জান, ওকে এখন তাড়িয়ে দিলে আমাদের বে-আইনী কাজ করা হবে, তার জন্যে শাস্তি পর্য্যন্ত হতে পারে।'

এরূপ কোন আইন ছিল কিনা আমার জানা নেই। থাকতে পারে—আমার জানা ছিল না। সে যাইহোক, বাড়ীউলি অবস্থাটা ভেবে দেখল এবং সঙ্গে সঙ্গেই শান্তভাব ধারণ করল, একটি কথাও আর বলল না।

রাত্তিরে খাবারের জন্য বাড়ীউলি দু-টুক্‌রো রুটি, একটু মাখন এনে আমার সামনে ধরে দিল কিন্তু আমি তা স্পর্শও করলাম না। বাড়ীওলার প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে উঠল। এমন ভাবটা দেখালাম যেন, শহর থেকে যৎসামান্য কিছু খেয়ে এসেচি, না খেলেও চলবে।

খানিকক্ষণ বাদে পাশের ঘরে শুতে গেলাম, বাড়ীউলিও পিছন পিছন এসে দোরে থামল, তার চেহারা অন্ধকারে স্পষ্ট নজরে

এল না। চেঁচিয়ে দম্ভভরে বলে উঠল, 'শুনে রাখ, আজই তোমার শেষরাত্রি, কাল থেকে আর এখানে থাকবার সুবিধা হবে না।'

জবাবে বললাম, 'আচ্ছা, তাই হবে।'

কাল কোথাও না কোথাও একটু আশ্রয় জুটবেই, তবে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে। জায়গা একটু নিশ্চয়ই পাব। আজ রাত্তিরেই যে যেতে হল না সেটা ঈশ্বরের পরম করুণা।

ভোর পাঁচটা ছ'টা পর্য্যন্ত ঘুমালাম—ঘুম যখন ভাঙল তখনো চারিদিক ফরসা হয় নি—তা না হোক, উঠে পড়লাম। রাত্তিরে বেশ শীত ছিল, জামা-কাপড় পরেই শুয়েছিলাম; সুতরাং পোষাক পরবার আর দরকার ছিল না। খানিকটা ঠাণ্ডা জল খেয়েই নিঃশব্দে দরজা খুলে সটান্ বাইরে বেরিয়ে পড়লাম, ভয় ছিল—বাড়ীউলি পাছে দেখতে পায়।

রাস্তায় কোথাও জনমানবের সাড়া শব্দ নেই, কেবল দুটো পাহারাওলা সারারাত জেগে তখনো পাহারা দিচ্চে। খানিক বাদেই রাস্তার আলোগুলি নেবানো শুরু হল। উদ্দেশ্যহীন ভাবে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চললাম—পথের যেন শেষও নেই, আমারও যেন কোন গন্তব্য স্থান নেই। এমনি করে কিবৃকেগ্যাদেন পৌছুলাম। এইখান থেকেই রাস্তাটা কেল্লার দিকে নেমে গেছে। তখনো আমার ঘুমের রেশ যায় নি, শীতও বেশ লাগছিল,

হাঁটাহাঁটিতে পা দুটো শ্রান্তিতে অবশ, ক্ষুধায়ও বেশ দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিলাম। রাস্তার পাশের একখানা বেঞ্চিতে বসে বসে ঝিমোতে শুরু করে দিলাম। কতকক্ষণ যে ঝিমোলাম, বলতেও পারি নে। গেল তিন সপ্তাহ সকালে বিকালে বাড়ীউলির কাছ থেকে পাওয়া সামান্য কয় টুক্‌রা রুটি, একটু একটু মাখন, খেয়েই কাটিয়েচি। চব্বিশ ঘণ্টা হয়ে গেল কিছুই খাই নি, ক্ষুধা বিপুলভাবে আমায় পেয়ে বসে ছিল; কাজেই যতশীঘ্র সম্ভব আশ্রয় একটা জুটিয়ে নিতেই হবে। এ সব ভাবতে ভাবতে সেই বেঞ্চিতেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

আমার সামনেই লোকজন কথা বার্ত্তা কইচে, গোলমালে জেগে উঠলাম। দেখলাম, সকলেই কাজে কর্ম্মে ব্যস্ত। বেলা অনেক হয়েচে। উঠে হেঁটে চললাম। সূর্য্য অগ্নিবর্ষণ করচে—আকাশ পাণ্ডুর, ম্রিয়মান। বহু কাল এমন উজ্জ্বল দিন দেখতে পাই নি, কাজেই সকল দুঃখ কষ্টের কথা একদম ভুলে গেলাম। বুক চাপড়ে আপনার মনে একটা গানের দুটো কলি গেয়ে ওঠলাম। কণ্ঠস্বরে শ্রান্তি ক্লান্তি মেশানো, ভারী বিশ্রী শোনাল। কাজেই চুপ করে গেলাম, এমন সুন্দর দিনে—ধরিত্রী আলোর ধারায় স্নান করে অপূর্ব্ব সুন্দর রূপ পরিগ্রহ করেচে দেখে এই ভাবটা আমার খিন্নক্লিষ্ট চিত্তে একটা প্রভাব বিস্তার করল, এবং আমি চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠলাম।

বুভুক্ষা

একটা লোক জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কি হয়েচে ?'

জবাব না দিয়ে তাড়াতাড়ি সড়ে পড়লাম, লোকজনের চোখের আড়ালে নিজের মুখ ঢাকবার সে কী বিপুল আগ্রহ! পুলের কাছে গিয়ে পৌঁছুলাম। একখানা কয়লা বোঝাই বৃহৎ রুশীয় জাহাজ নোঙর করা রয়েচে, তার থেকে কয়লা নামান হচ্চে। জাহাজখানার নাম লেখা রয়েচে—'কোপারগরো'। এই বিদেশী জাহাজে কি হচ্ছিল, জানবার জন্যে একটা সাময়িক কৌতূহল জেগে উঠল। হয় ত জাহাজখানা এখন একেবারে খালি। খালাসীরা এখানে সেখানে ঘোরা-ফেরা করচে।

সূর্য্যালোক, সামুদ্রিক নোনা হওয়া, এই সব কর্ম্মব্যস্ততা, চারিদিকে হাসিখুশী ভাব—সব মিলে আমার ধমনীতে রক্তস্রোত তীব্র ভাবে বয়ে গেল। অনেকটা চাঙ্গা হয়ে উঠলাম। হঠাৎ মনে হল এখানে বসেই ত নাটকটার খানিকটা লিখতে পারি; তখুনি পকেট থেকে কাগজ পেন্সিল বার করে লিখতে বসে গেলাম।

এক সন্ন্যাসীর মুখ দিয়ে একটা বক্তৃতা দেওয়াতে চেষ্টা করছিলাম—বক্তৃতাটি গর্ব্ব ও অসহিষ্ণুতায় ভরপূর হয় ইহাই ছিল আমার উদ্দেশ্য, কিন্তু কাজের বেলা তা হল না। কাজেই সন্ন্যাসীর প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে মন্দির অপবিত্রকারীর বক্তৃতা জুড়ে দিতে চাইলাম। আধ-পৃষ্ঠা লেখার পর থামলাম। বর্ণনার উপযোগী আবশ্যক

শব্দ জোয়াচ্ছিল না, চারিদিকে হৈ চৈ, মদের দোকানের হল্লা, জাহাজের ওঠা-নামার সিঁড়ির কলরব, শিকলের অবিশ্রান্ত ঝন্‌-ঝনানি—এই অবস্থায় বসে মধ্যযুগের সেই অতিপুরাতন আব-হাওয়ার সৃষ্টি—একেবারে অসম্ভব হয়ে উঠল।

কাগজ-পত্র গুছিয়ে উঠে পড়লাম। তা হোক, মেজাজটা তখন আমার ভারী খুশী। আমার বেশ বিশ্বাস হল যে, কোন রকম গোলমাল না হলে লেখাটাকে অনেকটা এগিয়ে নিতে পারব।

বসে কাজ করা যায় এমন একটা জায়গা যদি পেতাম। বার বার ভাবলাম, চলতে চলতে ডানদিকে একবার তাকালামও; কিন্তু সারা শহরে এমন একটি নিস্তব্ধ স্থানের নাম মনে পড়ল না যেখানে ঘণ্টাখানেক বসেও কাজ করতে পারি। ভ্যাটার-ল্যাণ্ডের সেই যাত্রী-গৃহেই আমাকে যেতে হবে! এ কথা ভাবতেই মাথা নীচু হয়ে এল এবং আপনার মনেই বলে উঠলাম, না তা কিছুতেই হতে পারে না। কাজেই এগিয়ে চললাম এবং ক্রমেই নিষিদ্ধ স্থানের কছাকাছি গিয়ে পৌছুলাম। অবশ্য স্বীকার করতেই হয় যে, এমন ভাবে আবার সেইখানে ফিরে যাওয়ায় যথেষ্ট হীনতা স্বীকার করতে হয় কিন্তু তা ছাড়া উপায় কি? এতে অবশ্য গর্ব্ব করবার কিছু নেই, তবে এ কথা বলবার স্পর্দ্ধা আমার আছে যে, আজ পর্য্যন্ত আমি কখনো দম্ভ প্রকাশ করি নি। সামনের দিকে এগিয়ে চললাম।

বুভুক্ষা

বাড়ীটার সম্মুখে এসে আর একবার দরজা খুলবার জন্য হাতল ধরে টানলাম। ফল কি হবে জানি নে, তবু আমায় তা করতেই হবে। অবশ্য বেশীক্ষণ থাকব না, ঘণ্টাকয়েক থেকে কাজটা সেরেই চলে যাব, এ রকম জায়গায় যেন থাকতে না হয়। আঙিনায় ঢুকে যখন আবড়ো-খাবড়ো পাথরগুলির উপর দিয়ে যাচ্ছিলাম তখনো আমার চিত্তের দৃঢ়তা ছিল না এবং দ্বারের দিকে প্রায় ফিরতে যাচ্ছিলাম। দাঁতে দাঁত চেপে রইলাম। না! মান করলে চলবে না। নেহাৎ যদি তেমন তেমন বুঝি ত এই ওজুহাত দেখাতে পারবো যে, তোমাদের কাছে বিদায় নিতে এসেচি, আর তোমরা আমার কাছে কত পাবে, যাবার আগে জানতে চাই, একদিন ত দিতে হবে।

লম্বা ঘরটার দরজা খুলে ভিতরে ঢুকেই স্থাণুর মত নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার সামনে ডান দিকেই—এই কয়েক পা দূরেই—বাড়ীওলা দাঁড়িয়ে ছিল। তার মাথায় টুপি বা গায়ে কোট ছিল না। সে অন্দরের দিকে উঁকি দিয়ে কি দেখছিল। ইঙ্গিতে শব্দ করতে মানা করে আবার উঁকি দিয়ে দেখল।

চুপি চুপি বললে, 'এখানে এস।'

আঙুলে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে তার কাছে গেলাম।

সে নিঃশব্দে উৎসুক হাসি হেসে বলল, 'ওই দেখ, তাকিয়ে

দেখ, ওরা ওখানে রয়েচে! ওই দেখ বুড়োটার অবস্থা, দেখতে পাচ্চ তাকে?'

দেখলাম—সেই দেওয়ালে টাঙানো যীশুর ছবির নীচেই বিছানার উপর দুটি লোক রয়েচে, তার একজন বাড়ীউলি নিজে, আর একজন সেই নবাগত নাবিক অতিথি। তার শাদা ধবধবে পা দুখানা কালো বিছানা-ঢাকার মধ্যে থেকে দেখা যাচ্চে। অদূরে আর একখানা বিছানায় সেই পঙ্গু স্থবির বাড়ীউলির বাপ, ঝুঁকে পড়ে ওদের দিকে চেয়ে রয়েচে, নড়বার চড়বার শক্তিটুকুও নেই তার।

পিছন ফিরে বাড়ীওলার দিকে তাকালাম। চেঁচিয়ে হাসি আসছিল, অনেক কষ্টে সে হাসি চেপে রাখলাম।

বাড়ীওলা চুপি চুপি আমায় বললে, 'বুড়োটাকে দেখলে ত? বসে বসে দেখচে?' এই বলে আবার নিজে উঁকি দিল।

জানলার দিকে গিয়ে বসে পড়লাম। এই দৃশ্য দেখে আমার সকল চিন্তা সকল ভাব নির্দ্দয়ভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল—লেখার সেই চমৎকার মতিটুকুও একেবারে নষ্ট হয়ে গেল। আচ্ছা, ও দেখে আমার মেজাজ খারাপ হল কেন? আমার কি? যখন স্বামী নিজেই স্বেচ্ছায় সম্মতি দিয়েচে, শুধু তাই নয়, তাতে বেশ আমোদ পাচ্চে, তখন তাতে আমার মনে কোন রকম দুঃখ হওয়ার ত কোনই হেতু নেই। তারপর বৃদ্ধের কথা, সে বৃদ্ধ,

তা ছাড়া ত আর কিছু নয়। হয় ত বুড়োটা দেখতেও পায় নি। হতে পারে সে বসে বসে শুদ্ধ ঝিমুচ্চে। হয় ত বা ও মরেই আছে; ও যদি এখন মরেও যায় ত আমি তাতে আশ্চর্য্য হব না। আমার বিবেক তাতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করবে না।

জোর করে মনের সব অসম্বন্ধ ধারণাগুলি দূরে সরিয়ে কাগজ পেন্সিল নিয়ে লিখতে বসে গেলাম। একটা জায়গায় এসে এই লিখলাম—'ঈশ্বরের এই আদেশ এবং তাই আমার কাছে আইন, জ্ঞানীগুণীরাও এই আদেশই দিয়ে থাকেন এবং আমি ও আমার বিবেকও এই আদেশ দিই . . .' জানলার বাইরে তাকিয়ে এই লোকটার বিবেক কি বলে তাই ভাবতে শুরু করে দিলাম। ভিতরের ঘরে কি গোলমাল হচ্চে কানে এল। যাক, ও নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই। হয় ত বুড়োটা মরে গেছে,—মরুক। গোলমাল কিসের, তা নিয়ে আমার ভাববার দরকার নেই। আমি কেন তা নিয়ে ভেবে মরচি? চুপ করে থাক মন! 'আমি ও আমার বিবেক এই বলি। . . .' কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না, সব যেন আমার পিছনে লেগেচে। লোকটা বার বার উঁকি মারচে, স্থির হয়ে একমিনিটও দাঁড়াতে পারচে না। থেকে থেকে তার চাপা হাসি আমার মনঃসংযোগ নষ্ট করছিল। বাইরে রাস্তায়ও কি যেন গোলমাল হচ্ছিল, তাতেও আমার মনোযোগ হচ্ছিল। একটা ছেলে রাস্তার ওদিককার ফুটপাথে রোদের

মধ্যে বসে ছিল। ছেলেটা দেখলাম বেশ হাসিখুশী—যেন কোনই ভয়ডর নেই—বসে বসে আপনার মনে কতকগুলি ছেঁড়া কাগজ নিয়ে খেলচে—কারুর সঙ্গে লাগেও নি। হঠাৎ ছেলেটা লাফ দিয়ে উঠে গালাগালি শুরু করে দিল এবং পিছন ফিরে রাস্তার মাঝখানে এসে একটা লোককে দেখতে পেল—লোকটা বেশ বয়স্ক, কটা ও লাল্‌চে দাড়ি, সামনের দোতলার জানলায় ঝুঁকে ছেলেটার মাথায় থুথু্ ফেলচে, রাগে দুঃখে ছেলেটা গম্‌গম্ করতে লাগল এবং ভাষায় যত গলাগালি আছে সব নিঃশেষ করতে লাগল। লোকটা কিন্তু হাসছিল। এইভাবে মিনিট পাঁচেক হয় ত কেটেচে। ছেলেটার কান্না দেখব না বলেই সেদিক থেকে নজর ফিরালাম।

'আমি ও আমার বিবেক এই বলি।..' তারপর কলম আর অগ্রসর হল না। শেষটা সবই যেন কেমন গুলিয়ে গেল; এমন কি এতক্ষণ যা-কিছু লিখেচি সবই যেন বাজে মনে হল—কোন কাজেই লাগবে না। মধ্যযুগে 'বিবেক' শব্দটা লোকে জানত কি? শব্দটা ত সব প্রথম আবিষ্কার করেন নাট্যকার শেক্সপিয়ার। তাহলে ত দেখচি এই লেখা কোন কাজেই লাগবে না। একবার সবটা লেখায় চোখ বুলিয়ে গেলাম। এবং সন্দেহের সমাধানও সঙ্গে সঙ্গেই করলাম। হঠাৎ একটা নতুন ভাব মনের মধ্যে হানা দিল এবং নূতন ভাবে নাটকখানা শেষ করবার জন্যে একটা সুবিপুল আকুলতা জন্মাল।

বাড়ীওলা আমায় নিঃশব্দে বার হয়ে যেতে ইঙ্গিত করলে, সেদিকে নজর না দিয়ে উঠে দরজার কাছে গেলাম এবং বেশ গ্রামভারী চালে দৃঢ়তার সঙ্গে হেঁটে চলে এলাম। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় আমার সে পূর্ব্বেকার ঘরখানায় গিয়ে ঢুকলাম। লোকটা ত সেখানে ছিল না, সুতরাং খানিক্ষণ সেখানে বসতে আর বাধা কি? তার কোন জিনিষই অবশ্য আমি ছুঁব না, এমন কি তার টেবিলের সামনে গিয়েও বসব না, কেবল একটিবার দরজার পাশের চ্যায়ারখানায় বসব মাত্র, তাতেই আমি খুশী হব। পকেট থেকে তাড়াতাড়ি কাগজ-পত্র সব বার করলাম। মিনিট কয়েক বেশ চমৎকার কাটল। কোন্ কথার পৃষ্ঠে কোন্ কথা লিখব—সব মাথার মধ্যে গজ্‌গজ্‌ করতে লাগল এবং অবিরাম লিখে চললাম। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা খস্‌খস্‌ করে লিখে যাচ্চি, মাথাটা বেশ পরিষ্কার, মনটাও খুশীতে ভরা এবং এমনি আপনা হারিয়ে গিয়েছিলাম যে, বাহ্যিক জ্ঞান পর্য্যন্তও আমার তখন লুপ্ত। কেবল কাগজ-কলমের খস্‌খস্‌ শব্দ আমার কানে আসছিল।

হঠাৎ মাথায় এল, নাটকের কোন একটা জায়গায় গীর্জ্জার গম্ভীর ঘণ্টাধ্বনি করাতে হবে। ভাবটা ভারী ভাল লাগল। লেখা অতি দ্রুত চলল। সিঁড়িতে পদশব্দ শুনতে পেলাম। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে কি করব ভেবে পেলাম না। ভীত-

সন্ত্রস্ত ভাবে আসনেই বসে রইলাম, একদিকে অজানা বিপদের আশঙ্কা অপর দিকে প্রচণ্ডক্ষুধার উদ্রেক—দুটোই আমায় পেয়ে বসল, আকুল হয়ে কান পেতে রইলাম, তখনো পেন্সিলটা আমার হাতে ছিল। আর একটি অক্ষরও লিখতে পারছিলাম না। নীচে থেকে যুগল মূর্ত্তি এসে দরজা খুলে ঘরে ঢুকল।

আমার কৃতকার্য্যের কৈফিয়ত দিবার পূর্ব্বেই বাড়ীউলি সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'ওখানে কে বসে?'

জবাব দিলাম, 'মাফ কর আমায়...' আর কিছু বলবার সুযোগ পেলাম না। বাড়ীউলি লাফ দিয়ে দরজার সামনে গিয়ে যতটা গলায় দেয়, চীৎকার করে উঠল, 'এক্ষুণি যদি বেরিয়ে না যাও ত আমি পুলিশ ডাকব।'

উঠে দাঁড়ালাম।

অস্পষ্ট স্বরে বললাম, 'তোমার কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্যেই প্রতীক্ষা করচি। ঘরের কিছুই আমি স্পর্শ করি নি; এইখানে চ্যায়ারে বসেছিলাম মাত্র ...'

লোকটা বললে, 'বেশ ত, তাতে অবশ্য কোন ক্ষতি নেই। তাতে আর এমন কি অপরাধ হতে পারে? যাক্, ওঁকে একটু থাকতে দাও; উনি—'

ইতিমধ্যেই আমি সিঁড়ির সামনে গিয়ে পৌঁছুলাম। এই অতি-স্থূলকায় স্ত্রীলোকটার ব্যবহারে হঠাৎ আমি রেগে গেলাম,

কেন না আমাকে তক্ষুণি তাড়াবার জন্যে ও আমার পিছন পিছন এল, মুখের মত জবাব ঠোঁট পর্য্যন্ত এসেই থেমে গেল। কিন্তু তখনই মনে হল যে, চুপ করে থাকাই ঠিক হবে, বিশেষত এই নবাগত নাবিক অথিতিটির প্রতিও ত আমার কৃতজ্ঞতা থাকা উচিত, তাই চুপ করে রইলাম। ও আমায় অবিশ্রান্ত গালাগালি করতে করতে আমার পিছনে পিছনে এল, প্রতিপাদক্ষেপেই আমার রাগ বেড়ে যাচ্ছিল।

আঙিনায় গিয়ে পৌঁছুলাম। ধীরে ধীরে পা ফেলছিলাম আর ভাবছিলাম যে, ওকে একটু শিক্ষা দিয়ে যাওয়া উচিত কি না। রাগে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। আপনার মনে প্রতিশোধের জন্যে কঠোরতম গালাগালি আওড়াচ্ছিলাম, এমন জবাব ওকে দিতে হবে যেন তা শুনেই ও আতকে ওঠে—পথ চলতে চলতে হঠাৎ কেউ পেটে লাথি খেলে মাথা-ঘুরে পড়ে মরে যায়, গাল দিয়ে তেমনি ওকে আহত করতে হবে। ফটকের সামনে দেখলাম একটা লোক বাড়ীতে ঢুকচে। লোকটা সম্মান দেখাবার জন্যে একবার টুপিটা স্পর্শ করলে। এবং সটান্ বাড়ীউলির কাছে গিয়ে আমার কথা জিজ্ঞাসা করল। শুনলাম, কিন্তু পিছন ফিরে আর চাইলাম না। কয়েক পা যেতেই লোকটা এসে আমার হাতে একখানা লেফাপা দিল। হেলা-ফেলা ভাবে নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে লেফাপাখানা ছিঁড়ে

ফেললাম—দেখলাম তাতে দশ ক্রোণার-এর একটা নোট রয়েচে কিন্তু চিঠি বা একটা অক্ষরও কোথাও লেখা নেই। লোকটার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ কোন্ দিশি মূর্খামি? কার কাছ থেকে চিঠি এনেচো?'

লোকটা জবাবে বলল, 'আমি তা বলতে পারি নে! একটি মহিলা আপনাকে দিবার জন্যে আমায় দিয়েছেন।'

আমি নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলাম। লোকটা চলে গেল।

টাকা কয়টা পুনরায় লেফাপার মধ্যে রাখলাম এবং লেফাপা-খানা মুঠোর মধ্যে ডেলা পাকিয়ে ধরলাম; অদূরে ফটকে বাড়ীউলি তখনো আমার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঠিক তার মুখ লক্ষ্য করে নোটের ডেলাটা ছুঁড়ে দিলাম। একটা কথাও বললাম না, এমন কি একটা শব্দও উচ্চারণ করলাম না,—কেবল একবার পিছন ফিরে দেখলাম, বাড়ীউলি ডেলাটা কুড়িয়ে দেখচে তাতে কি আছে।... হ্যাঁ, এমনি করেই মুখের মত জবাব দিতে হয়, তাতেই আত্মসম্মান বজায় থাকে। একটা কথা নেই, কি দিচ্চি তা বলা নেই—কাগজের মধ্যে নোট ডেলা করে অত্যাচারী পাওনাদারের মুখের উপর অবলীলাক্রমে ছুঁড়ে দেওয়া! ওর মত পশুকে এমনি করেই শিক্ষা দিতে হয়।...

যখন টুমটেগ্যাদেনে পৌঁছুলাম—রাস্তাটা যেন আমার চোখের

সামনে ভাসতে লাগল; মাথাটা যেন খালি—ভোঁ ভোঁ করছে, টলতে টলতে সামনেকার বাড়ীর দেয়ালটা ধরে টাল্ সামলালাম। এক পা-ও এগুতে পারছিলাম না, যেন সর্ব্বাঙ্গে খিল ধরে গেছে, ওই একই অবস্থায় দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে হল, যেন এখনই জ্ঞান হারাব। এতটা ক্রোধান্ধ হওয়াতেই ওরূপ দৌর্ব্বল্য দেখা দিয়েচে। জোর করে পা দুটো টেনে তুলে ফুটপাথের উপর ঠুকতে লাগলাম। দেহের জড়তা দূর করবার জন্যে আরো অনেক উপায় অবলম্বন করলাম। দাঁতে দাঁত ঘর্ষণ করা, ভ্রূ কুঞ্চিত করা এবং হতাশ ভাবে চক্ষু ঘুরান—সব কিছু সনাতন প্রক্রিয়া অবলম্বন করলাম, কিছু কাজও হল। ক্রমে মাথাটা অনেকটা স্বচ্ছ হয়ে এল। স্পষ্টই বুঝতে পারলাম যে, ধ্বংসের আর বিলম্ব নাই। হাত দুটো প্রসারিত করে দেয়াল থেকে নিজেকে সরাবার জন্যে ধাক্কা দিলাম। তখনো রাস্তাটা যেন আমার চোখের সামনে তাণ্ডব নৃত্য করছিল। রাগে দুঃখে ফোঁপাতে লাগলাম। এবং আমার এই শোচনীয় অবস্থার জন্যে কঠোর অন্তর-দ্বন্দ্ব শুরু হল। এবং প্রাণপণে নিজেকে চাঙা করবার জন্যে চেষ্টা করলাম। অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ি এটা অবশ্য আমার ইচ্ছা নয়; না, তা কিছুতেই হতে পারে না, দাঁড়িয়ে মরব, তবু হাল ছেড়ে দিব না। একটা ছোট টানা-গাড়ী আস্তে আস্তে আসছিল, দেখলাম তাতে প্রচুর আলু রয়েচে; কিন্তু

নিছক রাগের খেয়ালে ও গোঁড়ামিতে মনে করে বসলাম, ও আলু নয়,—বাঁধা কপি। কি বলচি তা আমার কানে আসছিল, এবং জেনেশুনেই যে এ রকম মিথ্যা ভাবচি তার জন্যে নিজেকে গাল দিলাম; আত্মনির্য্যাতন বেশ ভাল ভাবেই হয় এই উদ্দেশ্যে গালাগালিগুলি বার বার আবৃত্তি করলাম। আমার সুবিপুল পাপের কথা ভাবতেই আমি ক্ষেপে গেলাম। শূন্যে তিনটা আঙুল ঘুরিয়ে তুড়ি দিয়ে ঈশ্বরের নাম নিয়ে কম্পিত কণ্ঠে শপথ করে বললাম যে, ওগুলি সত্যিসত্যিই বাঁধা কপি। এবং মুখের ঘাম মুছে বার দুই দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে একরকম জোর করেই শান্ত হলাম। সূর্য্য পশ্চিমে হেলে পড়েচে, অপরাহ্ন হয়ে আসচে। আবার নিজের অবস্থার কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম। ক্ষিধাটা সত্যিই ভারী অপমানজনক, একটা বিরাট কলঙ্ক। এদিকে ঘণ্টা কয়েক বাদেই রাত্রি হবে। কাজেই সময় থাকতেই তার প্রতিকার করা উচিত। যে যাত্রীগৃহ থেকে আমি বিতাড়িত হয়েচি, কেন জানি নে, সেই বাড়ীর দিকেই আমার চিন্তা প্রধাবিত হল। সেখানে ত কোন মতেই আর আমি যেতে পারি নে; কিন্তু তবু কি সে গৃহের কথা না ভেবে পারি! সত্য বলতে কি, স্ত্রীলোকটি যে আমায় তাড়িয়ে দিয়েচে তাতে একটুও অন্যায় সে করে নি, আর সে অধিকারও পূর্ণমাত্রাতেই তার আছে। টাকা-পয়সা নিয়মিত দিতে পারব না, অথচ একজন আমার থাকা-খাওয়া জোগাবে—

এটা আশা করাই অসঙ্গত। অধিকন্তু ও আমায় খেতেও ত দিয়েচে; এমন কি, কাল রাত্তিরে ওকে বিরক্ত করা সত্ত্বেও ও আমায় খানিকটা রুটি-মাখন দিয়েছিল। আমার খাওয়া হয় নি জেনেই দয়া করে আমায় খেতে দিয়েছিল, এ ওর মহত্ত্ব; সুতরাং ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ করার আমার কিছুই নেই ওখানে সিঁড়িতে যখন বসেছিলাম, তখন মনে মনেই নিজের অসঙ্গত আচরণের জন্য ওর কাছে মার্জ্জনা চেয়েচি বার বার। বিশেষত চলে আসবার মুখে যে ব্যবহারটা করেচি তা প্রকৃতই অকৃতজ্ঞের মত হয়েচে—ওর মুখ লক্ষ্য করে টাকাগুলি ছুঁড়ে দেওয়াটা ত কিছুতেই সমর্থন করা যায় না।...

দশ শিলিং! একবার শীস্ দিলাম। যে চিঠিখানা লোকটা এনে দিল, তা কে দিয়েচে? তৎক্ষণাৎ সমস্ত ব্যাপারটা জলের মত হয়ে গেল এবং তখনি বুঝতে পারলাম এর মূল কোথায়। দারুণ দুঃখে লজ্জায় ভারী ম্রিয়মান হয়ে পড়লাম। আপনার মনে অস্পষ্ট স্বরে উচ্চারণ করলাম—'ল্যাজালি'; বার কয়েক নামটা আওড়ালাম। এবং একবার পিছন ফিরে তাকালামও। এই কালই না আমি নিজের মনে মনে সঙ্কল্প করেছিলাম যে, যদি কখনো ল্যাজালির সাথে দেখা হয় ত তাকে উপেক্ষা করব এবং যতদূর সম্ভব এড়িয়েই চলব? উপেক্ষা চুলোয় যাক, তার কৃপার উদ্রেক করিয়ে তার কাছ থেকে

হাত পেতে ভিক্ষা গ্রহণ করলাম! না, না, না; অধঃপতনের কি কিছু বাকী রইল! তার সামনেও ত যথোচিত ভব্যতা বজায় রাখতে পারি নি। আমি ডুবচি—কেবল ডুবচিই,—চারদিক থেকেই—যে দিকে ফিরি সেই দিক দিয়েই অতলের তলে তলিয়ে যাচ্ছি। দেহে মনে প্রাণে—সবদিক দিয়েই আজ আমি ফতুর—একেবারে ফতুর, এই অধঃপতন থেকে আর আমার উঠবার শক্তি নেই, আর আমার মুক্তিও নেই—না, কখনো না! এই ত চরম! অজানা অনামা লোকের দান ফিরিয়ে না দিয়ে হাত পেতে তা গ্রহণ করা, দুটো পয়সা হাতে আসার এতটুকু সম্ভাবনাতেই এই হীন ক্যাংলাপনা—সে অর্থ শুধু গ্রহণ করা নয়, তা আবার জীবিকার জন্যে ব্যয় করা—অথচ এ সবেতেই একদিন আমার আন্তরিক ঘৃণা ছিল—এর চাইতে চরম অধঃপতন আর কি হতে পারে!...

আচ্ছা, কোন উপায়ে কি এই দশ শিলিং ফিরিয়ে পাওয়া যায় না? বাড়ীউলির কাছে গিয়ে টাকাটা ফেরত চাইলে নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই সে দিবে না। ভেবে দেখতে হবে—ভেবে চিন্তে একটা কিছু উপায় বার করতেই হবে। যেমন তেমন করে চেষ্টা করলে তা হবে না—আমার সমগ্র কর্ম্মশক্তি ও সত্তা দিয়ে চেষ্টা করতে হবে—তবেই না এই দশ শিলিং অর্জ্জন করতে পারব। তাই একাগ্রতার সঙ্গে এই সমস্য-সমাধানের উপায় আবিষ্কার করতে লেগে গেলাম।

বুভুক্ষা

হয় ত চারটে বেজেচে। আর কয়ঘণ্টা বাদেই ত থিয়েটারের ম্যানেজারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হতে পারত। এখনো যদি নাটকখানা সম্পূর্ণ করতে পারতাম!

যেখানে বসে ছিলাম সেইখানেই পকেট থেকে কাগজপত্র সব বার করলাম এবং সংকল্প করলাম, বাকী দৃশ্য কয়টা যেমন করে হোক শেষ করবই। ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে আগাগোড়া বিষয়টা ভেবে নিলাম এবং যতটা লেখা হয়েচে, সবটা একবার প্রথম থেকে পড়ে নিলাম কিন্তু কোন লাভ হল না। না, ফাঁকি চলবে না! গোঁড়ামি কোন কাজের নয়, বিশেষত এ অবস্থায় গোঁয়ার্ত্তুমি মরণকে ডেকে আনবে। তাই একান্ত মনোযোগের সঙ্গে লিখতে শুরু করে দিলাম—যেমন করে হোক শেষ করতেই হবে এবং যত শীঘ্র সম্ভব, আর তাহলেই ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হবে। নিজেকে এই বলে লেখায় প্রবর্ত্তিত করলাম যে, এ সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারানো উচিত হবে না; জেনে শুনেই নিজেকে এই মিথ্যার দ্বারা প্রতারিত করলাম এবং আমার যেন ভাষার জন্য এতটুকু ভাবনা নেই, কলমের ডগায় আপনাথেকেই লেখা বার হয়ে আসছিল।

মাঝে মাঝে লিখতে লিখতে আপনার মনে মুগ্ধ হয়ে বলে উঠছিলাম, 'চমৎকার'! 'বাঃ, কি সুন্দর!' আর কলম অবিশ্রান্ত চলেচে। আচ্ছা, এখানটায় ত তেমন ভাল শোনাচ্চে না। প্রথম দৃশ্যের সঙ্গে এর সামঞ্জস্য ত পাওয়া যাচ্চে না। এ যেন বেশ একটু উগ্র, তেজাল।

সন্ন্যাসীর কথোপকথনের সঙ্গে মধ্যযুগের কোন নাম গন্ধও ত খুঁজে পাচ্চি নে। রেগে পেন্সিলটা দাঁতে কামড়ে ভেঙ্গে ফেললাম, লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম, লেখা কাগজগুলি দু'টুক্‌রা করে ছিঁড়ে ফেললাম, প্রত্যেকটি পাতা টুক্‌রা টুক্‌রা করে ছিঁড়লাম, টুপিটা রাস্তার উপর পড়ে গেল, দু'পায়ে তা পিষলাম। আপনার মনেই চুপি চুপি বলে উঠলাম, 'মরলাম! ওগো তোমরা শোন,—আমি মরলাম!' এই কয়টি শব্দ ছাড়া আর একটি শব্দও উচ্চারণ করতে পারলাম না, কেবল টুপিটাকে পায়ে মাড়িয়ে চ্যাপ্টা করে ফেললাম।

কয়েক পা দূরে দাঁড়িয়ে একটা পাহারাওলা আমায় লক্ষ্য করছিল। পাহারাওলাটা মাঝ-রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল, ওর লক্ষ্য ছিল আমারই উপর। মাথা তুলতেই আমাদের চারি চোখের মিলন হল। ও হয় ত অনেকক্ষণ থেকেই ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমায় লক্ষ্য করচে। টুপিটা মাটি থেকে তুলে মাথায় পরে ওর সামনে গেলাম।

'ক'টা বেজেচে?' ওকে শুধোলাম।

ও খানিকক্ষণ কি ভাবল, তারপর পকেট থেকে ঘড়িটা বার করল কিন্তু ওর দৃষ্টি আমারই দিকে নিবদ্ধ।

'প্রায় চারটে,' ও জবাবে বলল।

'ঠিক্,' বললাম, 'প্রায় চারটেই হবে। তুমি বেশ কাজের

লোক, তোমার কথা মনে রাখব।' বলেই তার কাছ থেকে চলে গেলাম। ও পরমবিস্ময়ে আমার দিকে হাঁ করে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল, ওর হাতে তখনো ঘড়িটা।

রয়্যাল হোটেলের সামনে পৌঁচে একবার পিছন ফিরে তাকালাম। পাহারাওলাটা তখনো একই ভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল—দৃষ্টি তার আমার দিকেই।

হাঃ, হাঃ! এমনি করেই ওদের মত জানোয়ারের সঙ্গে ব্যবহার করতে হয়! কি চরম মার্জ্জিত নির্লজ্জ দুঃসাহসিকতা! এমনি করেই এই সব জানোয়ারকে বশে আনতে হয়, ধর্ম্মের ভয়—জবর ভয়! ... একরকম অদ্ভুত তৃপ্তিতে মনটা ভরে উঠল, গুন্ গুন্ করে গান গাইতে শুরু করে দিলাম। প্রতিটি শিরা-উপশিরা দারুণ উত্তেজনায় ফুলে উঠেচে। অথচ কোন রকম ব্যথা বেদনাই অনুভূত হচ্ছিল না, এমন কি কোন রকম অসুবিধাই যে আমার আছে তাও মনে হচ্ছিল না—সারাটা বাজার ঘুরে বেড়ালাম, শরীর-মন দু-ই বেশ হাল্কা। এক একটা দোকানের সামনে এক একবার দাঁড়াই, আবার ঘুরি। শেষটায় গীর্জ্জার সামনেকার বেঞ্চিটায় বসে পড়লাম। শিলিং দশটা ফেরত দিব, কি দিব না, তা নিয়ে কোন ভাবনাই আর তখন ছিল না। একবার যখন তা হাতে এসেচে, তখন তা আমারই; কাজেই তা কার কাছ থেকে এল তা ভাববার কোনই সুসঙ্গত কারণ নেই। বিশেষত টাকাটা যখন আমাকেই

পাঠান হয়েছিল, আর যখন আমারও টাকার খুবই প্রয়োজন তখন তা আমাকে গ্রহণ করতেই হবে, যে লোকটা চিঠিটা নিয়ে এসেছিল তাকে ফেরত দিবার কোনই মানে নেই। ফেরত দিবার কোন দরকারও নেই। কাজেই তা নিয়ে আর মাথা ঘামানও বাহুল্য।

বাজারে লোকজনের যে গোলমাল শোনা যাচ্চে তা লক্ষ্য করতে চেষ্টা পেলাম এবং বাজে বিষয়ে মনঃসংযোগ করে মনটাকে চাঙা করে তুলতে চাইলাম। কাজে কিন্তু তা হল না; শিলিং দশটা তখনো আমায় উদ্‌ব্যস্ত করে রাখছিল। অবশেষে হাতমুঠো করে রেগে উঠলাম। টাকাটা ফেরত দিলে ল্যাজালি মর্ম্মাহত হবে। তাহলে, কেনই বা তা ফেরত দিব? আমার সব কাজই যে ভাল এটা মনে করবার কোন কারণ নেই। মাথা ঝেঁকে বলে উঠলাম, 'না, ধন্যবাদ!' ব্যাপারটা যে কোন্ দিকে ধাওয়া করচে বুঝতে পারলাম। আবার রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। যখন সুযোগ ছিল তখনো বাসাটা ঠিক রাখতে পারি নি। না; আরো একটু আত্মসম্মান জ্ঞান থাকা দরকার। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। মনে হল, না, সামান্য ব্যাপারও আর সইতে আমি রাজী নই, ঢের সয়েচি। নগণ্য দশটা শিলিং হবে আমার পথের বাধা! অসম্ভব!... বাসা ছেড়ে দিয়ে নিজেকে কেন হঠাৎ রাস্তায় বার করেচি তার জন্যে নিজেকে তীব্র ভাবে জবাবদিহি করলাম।

আর সব বিষয়ে যা হবার তাই হবে। শিলিং দশটা আমি

চাই নি, মুহূর্ত্তও তা আমার হাতে ছিল না—এমন লোককে দিলাম যার সঙ্গে ভবিষ্যতে আর কখনো আমার দেখাও হয় ত হবে না। আমি এ রকমেরই মানুষ; ঋণ এমনি ভাবেই পরিশোধ করে থাকি, শেষ কপর্দ্দক দিয়েও ঋণ শোধ দিই। ল্যাজালিকে যদি ঠিক ঠিক চিনে থাকি ত এ টাকাটার জন্য সে কখনো দুঃখ প্রকাশ করবে না, কাজেই রাগের মাথায় বসে বসে কেন লিখছি? আমি ত জানি, মধ্যে মধ্যে আমায় শিলিং দশেক করে সাহায্য করা ওর পক্ষে খুব সহজ নয়। বেচারী গরীব, মেয়েটি সত্যিই আমায় ভালবেসেচে; ... বসে বসে এই সবই ভাবতে লাগলাম। ও যে আমায় সত্যি সত্যিই ভালবেসেচে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বেচারী!

পাঁচটা বেজে গেছে। আবার স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে আক্রান্ত হলাম। মাথাটা যেন ফাঁপা—শোঁ শোঁ শব্দ হতে লাগল। সোজা সামনের দিকে দৃষ্টিবদ্ধ করে চেয়ে রইলাম। ক্ষিধা এইবার আমায় একেবারে তীব্র ভাবে আক্রমণ করল, এবং বলা বাহুল্য ভারী কষ্ট পেতে লাগলাম। সামনের দিকে যখন চেয়ে বসেছিলাম, তখন দূরে একটা মানুষের আকৃতি নজরে এল, ক্রমে সেই আকৃতি স্পষ্ট দেখতে পেলাম এবং তাকে চিনতেও পারলাম। সেই ডাক্তারখানার সামনে কেক্-রুটিউলি বুড়ীটা, সেই যাকে একদিন খামকা অনেকগুলি টাকা-পয়সা দিয়েছিলাম। গা মোড়ামুড়ি

দিয়ে বেঞ্চির উপর কাত হয়ে বসে ভাবচি। হ্যাঁ, সেই বুড়ীই ত, ঠিক সেইখানাটায় সেই টেবিলখানায় কেক-বিস্কুট সাজিয়ে নিয়ে বসে আছে! বার কয়েক শীস্ দিয়ে আঙুলগুলি মট্‌কালাম এবং আড়মোড়া ভেঙ্গে আসন ছেড়ে উঠে ডাক্তারখানার দিকে গেলাম। না, বোকামি আর চলবে না! পাপ হবে? কে বললে? তা বলে আমি ঠকতে পারি নে; অত বেশী যে উদারতা দেখাবে তার মরণ নিশ্চয়।...

একটু তফাৎ থেকে বুড়ীর টেবিলে কি কি আছে দেখে নিলাম, পরে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, যেন ওর সাথে আমার আলাপ পরিচয় আছে এমনি ভাবে মাথা নেড়ে মৃদু হাসলাম এবং আমি যে আসব এটাও ওর জানা আছে এই ভাবেই কথাটা পাড়লাম।

'নমস্কার! আমায় চিনতে পারচ না তুমি?'

'না, মনে ত পড়চে না তোমায়।' ও ধীরে জবাব দিয়ে আমার দিকে তাকাল।

আবার মৃদু হাসলাম, ভাবখানা এই যে, এটা যেন ওর একটা ব্যঙ্গ, আমায় চেনে না এ যেন ওর একটা ভাণ মাত্র। তাই বললাম, 'একদিন না তোমায় গোটা কয়েক টাকা ও খুচরা পয়সা কয়েক আনা দিয়েছিলাম, মনে পড়ে? কিছু না বলেই সেদিন দিয়েছিলাম, যতদূর মনে পড়ে কিছুই তোমায়

বলি নি; কাউকে কিছু দিতে গিয়ে বলাটা আমি পসন্দ করি নে; ভাল লোকের সঙ্গে যার কারবার, যে নিজে ভাললোক, তার পক্ষে কথায় কথায় সামান্য ব্যাপারে চুক্তিনামা লেখা-পড়া করার দরকার হয় না। হাঃ হাঃ! আমিই একদিন তোমায় টাকা দিয়েছিলাম। এখন মনে পড়ে?'

'না, তবে—তঁবে—সে কি তুমি?, হাঁ, হাঁ, এখন মনে পড়েচে বটে। ...'

সে দানের জন্য সেদিন বুড়ী ধন্যবাদ জানাবার সুযোগও পায় নি, আজ হয় ত এখনই তা জানাবে, তাই তাকে বাধা দিয়ে টেবিলের উপরকার খাবার থেকে কোন্‌টা খেতে পারি তাই দেখতে লাগলাম। বললাম, 'হাঁ, তার বিনিময়ে আমি এখন কিছু কেক নিব।'

কথাটায় ও ঠিক যে রাজী হল তা মনে হল না।

ফের্ ওকে বললাম, 'এখন খান কয়েক কেক আমি নেব, একবারেই সবটা নেব না, এই ধর প্রথম কিস্তি। একদিনে সবটা নিয়ে গিয়ে কি করব, অত ত আর লাগবে না।'

'তুমি সেই টাকার বদলে আজ কেক নিতে চাইচ?'

'হাঁ, নেব বই কি।'—বলে বিকট হাসি হেসে উঠলাম, যেন আমি যে কেক নিতেই এসেচি তা প্রথমেই ওর বোঝা উচিত ছিল। এই বলেই টেবিল থেকে একখানা কেক তুলে নিয়ে খেতে শুরু করে দিলাম।

বুড়ীটা দেখতে পেয়ে এমন অঙ্গভঙ্গি করলে যাতে বুঝা যায় যে, ও ওর কেক-বিস্কুট আগলাতে ব্যাকুল হয়ে পড়েচে এবং তার জিনিষ এমনি ভাবে লুন্ঠিত হয় এটা সে কখনো আশা করে নি।

'দেবে না, সত্যি দেবে না?' বললাম। আচ্ছা মেয়েমানুষ ত! ও কি বলতে চায় যে, একজন এসে ওকে খামকা কতকগুলি টাকা-পয়সা দিয়ে যাবে এবং ফিরে আর কখনো সে তা দাবী করবে না? টাকা-পয়সাগুলি অমনি ভাবে ওকে ছুঁড়ে দেওয়ায় ও কি তখন এই মনে করেছিল যে, ও-গুলো চুরীর পয়সা। না, ও তা মনে করতে পারে না কিছুতেই। ও রকম ভাবে দেওয়াটা সত্যি আমার পক্ষে অন্যায় হয় নি। আমার সে দেওয়াকে 'দান' হিসাবে গ্রহণ করাই ওর পক্ষে সঙ্গত, আর আমার বিশ্বাস ও তাই গ্রহণ করেচে। না, না, ওর সম্বন্ধে কোন রকম খারাপ ধারণা করা আমার উচিত নয়, ও সত্যি ভাল মেয়ে।

আচ্ছা, তাহলে আমিই বা কেন ওকে টাকাগুলি দিতে গেলাম? বুড়ীটা তখন ভারী রেগে গিয়ে তর্ক বিতর্ক শুরু করে দিল। অমনি ভাবে কেন ওকে টাকা দিয়েছিলাম তাই ওকে বললাম, বলায় আড়ম্বর ছিল না মোটেই, কিন্তু জোর ছিল যথেষ্ট। এ আমার স্বভাব, বিশেষত প্রত্যেক মানুষের সততায় আমার আস্থা আছে। কেউ আমার দানের প্রাপ্তিস্বীকার করতে চাইলে

তাকে এই বলে নিষেধ করে থাকি, 'না, তোমার আর রসিদ দিতে হবে না। ঈশ্বর ত জানলেন যে আমি দিলাম।'

কিন্তু তবু স্ত্রীলোকটা আমার কথার মর্ম্ম গ্রহণ করতে পারল না। তখন অগত্যা আমার অন্য উপায় অবলম্বন করতে হল। কেননা গোলমালটা বেশী পাকৃতে দেওয়া ঠিক নয়। ও কি জীবনে আর কখনো কারুর কাছ থেকে এমনি ভাবে আগাম টাকা পায় নি? ওকে শুধোলাম, যারা আগাম দিতে পারে—এই ধর যেমন বড়লোকেরা, তাদের ত পয়সার অভাব নেই, ইচ্ছে করলেই ত আগাম দিতে পারে। বেশ, ওর জীবনে সে অভিজ্ঞতার সুযোগ আসে নি বলে আমি তার জন্যে লোকসান সইব? অন্যান্য দেশে এ রকম দস্তুর হামেসা দেখতে পাওয়া যায়। ও হয় ত জীবনে কখনো নিজের জন্মভূমি ছেড়ে আর কোথাও যাবার সুযোগ পায় নি। না?—তবেই বোঝ! ওর ত এ বিষয়ে মতামত দেবার কোনই সুসঙ্গত অধিকার নেই ... টেবিল থেকে পরপর আরো খান কয়েক কেক তুলে নিলাম।

ও রাগে গজ্ গজ্ করতে করতে টেবিল থেকে আর কিছু যেন না নিই তারই ব্যবস্থা করল। অর্থাৎ আমায় বাধা দিল, এমন কি, আমার হাত থেকে একখানা কেকও ছিনিয়ে নিয়ে জায়গা মত রেখে দিল। আমিও ক্ষেপে গেলাম, টেবিলে থাপ্পর মেরে পুলিশ ডাকার ভয় দেখিয়ে বললাম যে, আমি

কোন রকম গোলমাল করতে চাই নে। যে পয়সা জমা আছে তার বিনিময়ে এখন জিনিষ নিতে হলে ওর ভাঁড়ারের সব কিছুই নিতে হয়, কেননা বেশ মোটা টাকাই ত সেদিন ওকে আমি দিয়েছিলাম। তা বলে সবটাই কিছু আমি নিতে চাইচি নে, এই অর্দ্ধেক নিলেই যথেষ্ট, আর ভবিষ্যতে কখনো ওকে বিরক্ত করতে আসব না। ঈশ্বর আমায় রক্ষা করুন, ওর মত জীবের সাথে যেন আর কখনো আমার সাক্ষাৎ না হয়।... অবশেষে ও কতকগুলি কেক—প্রায় চার পাঁচখানা হবে,—আমার দিকে ঠেলে দিয়ে সেইগুলি নিয়েই সরে পড়তে মিনতি জানাল। বলা বাহুল্য, তবু ওর লাভ ছাড়া লোকসান এতটুকুও হল না। ও আমায় ঠকাল এইটেই আমি ওকে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চাইলাম। বললাম, 'জান, এ রকম অন্যায়ের শাস্তি আছে? ঈশ্বর করুন, তোমার মত ঠক্ বদমায়েসের সারাজীবন কয়েদ হোক্!' ও আরো একখানা কেক আমার দিকে ছুঁড়ে দিল এবং দাঁত কিড়মিড় করে আমায় চলে যেতে অনুরোধ করল।

আমিও চলে এলাম।

এই বুড়ীর মত অসৎ কেকউলি আর দেখা যায় না।

বাজারের সহস্র লোকজনের সামনা দিয়ে ঘুরে বেড়িয়ে কেকগুলি একে একে খেলাম এবং আপনার মনেই আমাদের দু'জনকার কথাবার্ত্তা, আচরণ সব খতিয়ে দেখলাম, বুড়ীর নির্লজ্জতার

কথা বার বার আওড়ালাম্, শেষটায় এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছুলাম যে, আমার ব্যবহার কোথাও এতটুকু অসঙ্গত হয় নি, আমি নিষ্কলঙ্কই রয়েচি। লোকজনের সামনেই কেকগুলি খেলাম এবং খেতে খেতেই আপনার মনে ও সব বিচার-বিতর্ক করলাম।

একে একে কেকগুলি প্রায় সবই উদরস্ত হল। কিন্তু তবু আমার ক্ষুধার শান্তি হল না। কি যম ক্ষুধাই না আমার পেয়েচে, দুনিয়া শুদ্ধ সব খাবার খেলেও বুঝি আমার সে বিরাট বুভুক্ষা মেটে না। প্রথমেই একখানা ছোট্ট কেক না খেয়ে বাঁচিয়ে রাস্তার ধারের সেই গরীব ছেলেটিকে দিব ঠিক করেছিলাম,— সেই ছেলেটি যার গায়ে উপর থেকে একটা লোক থুথু দিয়েছিল। কেকগুলি সব খাওয়ার পর সেই ছোট্ট কেকখানাই তখন অবশিষ্ট ছিল। ছেলেটির কথা একবারও কিন্তু ভুলি নি, তার সেই করুণ বিমর্ষ কচি মুখখানি সারাক্ষণই আমার মনে জেগে ছিল। এখন গিয়ে কি তাকে সেখানে দেখতে পাব?

কায়ক্লেশে সেইখানটায় গিয়ে পৌঁছুলাম। নাটকের পাণ্ডুলিপি ছিঁড়ে যেখানটায় ফেলে দিয়ে গিয়েছিলাম সেখানটা দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি চলে এলাম, দেখলাম আশেপাশে তখনো দু'চার টুক্‌রো কাগজ ইতস্তত পড়ে আছে, যে পাহারাওলাটাকে স্তম্ভিত করে দিয়ে গিয়েছিলাম তার পাশ দিয়ে গিয়ে সিঁড়ির সামনে

যেখানটায় বসে ছেলেটি খেলা করছিল সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলাম।

দেখলাম ছেলেটি সেখানে নেই। রাস্তায় লোকজনও নেই—একেবারে ফাঁকা—সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল, ছেলেটিকে কোথাও দেখতে পেলাম না। হয় ত সে ঘরে চলে গেছে। কেকখানা মাটীতে রেখে বন্ধ দরজায় ঘা দিয়ে তখ্‌খুনি সেখান থেকে চলে এলাম এবং আপনার মনে বললাম, 'ছেলেটি বাইরে বেরিয়ে নিশ্চয় কেকখানা পাবে। বাইরে এলে সর্ব্বাগ্রেই কেকখানা তার নজরে পড়বে।' খুশীতে তৃপ্তিতে আমার চোখ দুটো ছল ছল করে উঠল, এই বিশ্বাস নিয়ে চলে এলাম যে, ছেলেটি নিশ্চয় কেকখানা পাবে।

আবার বন্দরে এসে পৌছুলাম।

তখন আর ক্ষুধার জ্বালা ছিল না, কেবল অতগুলি খাবার খেয়ে একটু অস্বস্তি বোধ করছিলাম। নতুন করে সব ভাবনা চিন্তা তখন আমায় পেয়ে বসল।

আচ্ছা, একটা জাহাজের নোঙরের কাছি যদি চুপি চুপি কেটে দিই? যদি হঠাৎ 'আগুন, আগুন' করে চেঁচিয়ে উঠি? বন্দরের দিকে আরো খানিকটা এগিয়ে গেলাম এবং সামনেই একটা কেরোসিন কাঠের বাক্স পড়ে আছে দেখে হাতজোড় করে তাতেই বসে পড়লাম, এবং মাথাটা যে ঘুরচে, সবকিছুই যে গুলিয়ে আসচে

তা বেশ টের পাচ্ছিলাম। নড়াচড়া না করে ঠায় বসে রইলাম, আমার যেন কিছু করবার নেই। সামনেই সেই রুশ-পতাকা-ধারী জাহাজখানা ; সেদিকে তাকিয়ে রইলাম।

রেলিং-এ ভর দিয়ে একটা লোক দাঁড়িয়ে ছিল। তার পোষাক-পরিচ্ছদ দেখে তাকে বেশ সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারী বলেই মনে হল। উঠে দাঁড়িয়ে তার কাছে গিয়ে আলাপ জুড়ে দিলাম। আলাপ করবার অবশ্য কোন বিষয়ই আমার ছিল না, এবং ভদ্রলোক যে আমার কথার জবাব দিবেন তাও অবশ্য আশা করি নি। বললাম, 'ক্যাপ্তান মহাশয়, আপনারা কি আজ রাত্তিরেই জাহাজ ছাড়বেন ?'

'হাঁ, একটু বাদেই।' ভদ্রলোক জবাব দিলেন। তিনি সুইডিস ভাষায় কথা কইলেন।

'আচ্ছা, আপনাদের কি লোকের দরকার আছে ?'

আমার তখন মনের অবস্থা এরূপ যে, ক্যাপ্তান কি জবাব দিবে তাতে যেন আমার কিছু আসে যায় না। তবু কিন্তু জবাবের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলাম।

''না, লোকের দরকার নেই,' সে জবাব দিল ; 'তবে একটি ছোক্‌রা পেলে নিতে পারি।'

'ছোকরা!' নিজেকে সামলে নিয়ে তাড়াতাড়ি চোখ থেকে চশমাটা খুলে পকেটে রাখলাম। এবং সিঁড়ি দিয়ে ডেকের উপর উঠে হাঁটতে শুরু করে দিলাম।

পরে বললাম, 'কাজ কিছুই আমি জানি নে, তবে দেখিয়ে দিলে সব কিছুই করতে পারব। আপনারা কোথায় যাবেন? . . .'

'আমরা এখন যাব লীথ্ এবং সেখান থেকে কয়লা বোঝাই করে কার্ডিফ পৌঁছাব।'

ভদ্রলোকের দিকে আকুল দৃষ্টি হেনে বিনীতস্বরে বললাম, 'বেশ, তাই হবে। যেখানেই হোক, আমার কোন অসুবিধা হবে না। আমি কাজ করতে প্রস্তুত।'

ভদ্রলোক বলল, 'এর আগে কখনো সামুদ্রিক জাহাজে গিয়েচ কোথাও?'

'না, যাই নি; তা হোক, আমায় যা করতে বলবেন, আমি তাই করব।'

ভদ্রলোক আপনার মনে খানিকক্ষণ কি ভাবলেন।

আমি কিন্তু মনে মনে স্থির করে বসলাম যে, এ যাত্রায়ই আমি ওদের সঙ্গে যাব। জাহাজ থেকে আর কিছুতেই নামব না।

শেষটায় আর চুপ করে থাকতে না পেরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি অনুমতি করেন? আমি ত আপনাকে বলেইচি যে, যা করতে বলবেন, আমি তাই করব। আমায় যা করতে বলবেন তার চাইতে কিছু বেশী যদি না করতে পারি ত আমার পরম দুর্ভাগ্য। সব কাজেই আপনার সাহায্য করব। আমায় নিয়ে চলুন।'

'বেশ তাই হোক, একবার পরীক্ষা করেই দেখা যাক না। যদি না পার, তোমায় ইংলণ্ডেই রেখে আসব।'

'বেশ, তাই হবে। পরমানন্দে জবাব দিলাম। এবং যদি না পোষায় ত ইংলণ্ডেই থেকে যাব—এই কথা পুনরায় উচ্চারণ করলাম।

ক্যাপ্তান আমার কাজে নিযুক্ত করলেন।...

চোখের সামনে ক্রিশ্চিয়ানা শহরটি, তার প্রত্যেকটি গৃহের জানলা স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোয় সুষমামণ্ডিত, শরীর আমার দুর্ব্বল, রুগ্ন, কিন্তু তবুও আমি সেই দিগন্ত বিস্তৃত নীল ফিয়র্ডের কোলে দাঁড়িয়ে একবার সোজা হয়ে নির্ণিমেষ নেত্রে চেয়ে বলে উঠলাম, বিদায় বিদায়!